মুল্‌ক্‌রাজ আনন্দ

অনুবাদ :

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

র‍্যাডিক্যাল বুক ক্লাব : কলিকাতা-১২

দাম : ৪'৫০

প্রকাশক : বিমল মিত্র, ৬, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২
মুদ্রাকর : এম. এন. দাস, মুদ্রকমণ্ডল লিঃ, ১৭।১, বিন্দুপালিত লেন, কলিকাতা-৬

মণ্টেগু শ্লেটারকে

॥ এক ॥

মানুষ, না মুসাফির?

আসাম-যাত্রী ট্রেনের এক কামরায়, ম্যাককারনন চা-বাগানের বুটা সর্দারের পাশে বসে গঙ্গু আপনার মনে ভাবে...

কামরার ভেতর থেকেই সে দেখতে পায়, জঙ্গল ভেদ ক'রে ছোট্ট রেল-লাইনের ওপর দিয়ে ধূম উদ্‌গিরণ করতে করতে পাহাড়কে বেষ্টন ক'রে এঞ্জিনটা এগিয়ে চলেছে...

দেখতে দেখতে হঠাৎ তার দৃষ্টি সেই ঘন-সবুজের পুঞ্জীভূত অন্ধকারে যেন ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসে...মনে হয় যেন লাইনটা সেই সবুজ-অন্ধকারের মধ্যে হঠাৎ শেষ হয়ে গেল...

আপনার মনে বলে ওঠে, আজ এখানে, কাল সেখানে...মানুষের পথের নেই কোন ঠিক-ঠিকানা...

তার সামনের আসনে বসে আছে সজনী...তার স্ত্রী। স্ত্রীর এক পাশে লীলা, চতুর্দশ-বর্ষীয়া কন্যা...আর এক পাশে বৃন্দু...বালক-পুত্র।

সজনীর দিকে চেয়ে গঙ্গুর মনে হয়, সে যেন তার কাছ থেকে বহু দূরে অন্য কোথাও চলে গিয়েছে...কিসের যেন ভাবনায় ডুবে আছে। কি সে ভাবছে এত? কেন সে তার কাছ থেকে দূরে সরে আছে? যৌবনের প্রথম দিন থেকে তাদের দু'জনের মধ্যে যে নিবিড় অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠেছে, সেকথা সে কি ক'রে ভুলে যেতে পারে? এই যে নতুন দেশে নতুন ক'রে ঘর বাঁধতে চলেছে, তার সব ভাবনার দায়িত্ব একলা তার ঘাড়ের ওপর ফেলে

দিয়ে কি ক'রে সে বসে আছে? শুধু অসহায়ভাবে তার উপর নির্ভর ক'রে না থেকে, সে কি সেই সম্পর্কে তার সঙ্গে আলোচনা করতে পারে না? দুটো আশার কথা বলে তাকে ভরসা দিতেও পারে না? মনে পড়ে, তার যৌবনে যেদিন নব-বধূ হয়ে সে তার ঘরে এসেছিল, সেদিন রাত্রি-নির্জনে সে নিজেই উপযাচিকা হয়ে তাকে গান গেয়ে শুনিয়েছিল···'জীবন-মরণ কী সাথী!' সে-বছর তাদের পাহাড়-দেশে ঐ গানটি সকলের মুখে মুখে ঘুরে বেড়িয়েছে। আজও তার সুর তার মনের চারিদিকে হানা দিয়ে ঘুরছে। সেদিন বড় সাধ ক'রেই সে বিশ্বাস করতে চেয়েছিল যে, সত্য সত্যই পুরুষ ও নারী এই জীবনেই হতে পারে পরস্পরের জীবন-মরণের সাথী। যদিও সে জানতো, মরণের কথা বাদ দিলেও,—মরণকে তো একাই বরণ করতে হয়, জীবনেও মানুষকে অনেকখানি পথ একাই চলতে হয়, যদি না একজন আর একজনকে অকুণ্ঠভাবে গ্রহণ ক'রে থাকে।

দীর্ঘ পথে রাতের পর রাত নিদ্রাহীন থাকার দরুন লীলা আর বুদ্ধুর চোখের পাতা প্রায় জুড়ে আসবার মতন হয়েছে, কিন্তু তবুও তাদের দেখলে মনে হয়, তাদের আগ্রহ আর উৎসাহের যেন অন্ত নেই। কিন্তু তাদের আগ্রহ আর উৎসাহের কি সার্থকতা থাকতে পারে গঙ্গুর কাছে? তারা তো ভাবনাচিন্তাহীন নাবালক। তারা আপনাতেই আপনি সম্পূর্ণ···স্বতঃস্ফূর্ত··· আনন্দ-বিলাসী···সরল-প্রাণ···একটা মিঠাই বা একটা রঙীন খেলনা দিয়ে যে কেউ তাদের চিত্ত জয় ক'রে নিতে পারে। তারা জানে না প্রত্যেক বস্তুর অন্তরালে লুকিয়ে থাকে বেদনার কি তীব্র ছলনা···তারা বোঝে না, কি যাতনাই না মানুষ অহরহ দিচ্ছে আর নিচ্ছে···নিজেকে···অপরকে···প্রত্যেকে প্রত্যেককে।

গুটিকতক চ্যাপটা-মুখ থ্যাবড়া নাক গোল-গোল-চোখ পাহাড়ী আর একজন মাত্র বাঙ্গালী বাবু ছাড়া কামরায় আর যে-সব যাত্রী চলেছে, তারা অধিকাংশই কুলি শ্রেণীর লোক, ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তাদের সংগ্রহ

ক'রে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে···কেউ হুঁকো টানছে···কেউ বা ঝিমোচ্ছে···কেউ বা নিশ্চিন্ত সুখে নাক ডাকাচ্ছে।

গঙ্গু শুধু আপনার মনে ভেবে চলে, আমার তো ওদের মত বয়স নেই··· আমার দিন শেষ হয়ে আসছে···ক'টা বছরই বা হাতে আছে! কোথায় আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে চোখ বুজবো, না, তার জায়গায় চলেছি কোন্ দূর জঙ্গলে···হোসিয়ারপুর থেকে তো বারো দিন বারো রাত দূরে চলে এসেছি···তবুও জানি না আর কত দূরে যেতে হবে!

মৃত্যুর চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ সেই মুহূর্তে তার মনে হলো মৃত্যু-কীট যেন তার দেহের ভিতরে চলাফেরা ক'রে বেড়াচ্ছে···দেহাভ্যন্তরে তাদের দংশন-যন্ত্রণা যেন সে স্পষ্ট অনুভব করছে। সেই যন্ত্রণাদায়ী চেতনার হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করবার জন্যে সে জোর ক'রে বাইরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে··· দু'ধারে আসামের ঘন বন···এত ঘন যে সেখানকার বাতাসেরও যেন শ্বাসরোধ হয়ে আসছে···একটা সবুজ হিন্দোল-বিস্তার যেন আকাশকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলতে চলেছে। একবার সে কোনও পুরনো পটুয়ার আঁকা নরকের একটা ছবি দেখেছিল···বৈতরণীর কালো জলের ধারে সাঙ্গ-পাঙ্গ নিয়ে দাঁড়িয়ে ভুজশির মৃত্যুরাজ যম···তাঁর বাম হাতে করোটি···ডান হাতে মুক্ত তরবারি। চোখের সামনে সেই দুর্ভেদ্য ঘন অরণ্য আজ তার মনে সেই চিত্রকে আবার জাগিয়ে তোলে। চিরকাল সে কল্পনা ক'রে এসেছে, অরণ্য হলো মৃত্যুর রাজ্য। তার ঘন অন্ধকারে প্রত্যেক গাছের ছায়ার সঙ্গে ঘুরে বেড়ায় অদৃশ্য-মূর্তি বৃক্ষের অধিদেবতারা, অরণ্যচারী লঘুপদ সব প্রেতমূর্তি···প্রতিবাসী তাদের হিংস্র শার্দুল, বৃহৎ অজগর সর্প··ভয়াবহ সব সরীসৃপ···বন্য হস্তী···নামহীন নানা বিষ-পতঙ্গ।

সেই প্রত্যক্ষ ভয়ের রাজ্য থেকে তার মনকে জোর ক'রে টেনে নিয়ে যায় হোসিয়ারপুরে···তার গাঁয়ে···ছোট্ট পুকুরের ধারে মাটির-দেয়াল-দেওয়া তার ছোট্ট ঘরে।

যদিও মাথার ওপর ঘরের চালে ফাটল ধরেছে···কোনও রকমে জানালা কাঠের ঠেকো দিয়ে আটকে রেখেছে···বার বার চারবার বন্যার জলে তার মাটির দেওয়াল ধসে পড়েছে···দরজা বলতে আজ আর কোন পদার্থই নেই··· তবুও আজ এই মুহূর্তে তার ভাবতে ভাল লাগে, সে-ই তার আপনার ঘর··· তার আনন্দ-নিকেতন। কিন্তু তা হলেই বা কি হবে। তার ভাইরা পৈত্রিক জমির সঙ্গে বসত বাড়ীটাও বাঁধা দিয়ে ফেলেছিল। তাই আজ সেটুকুও গিয়েছে। তবে বাঁচাবার জন্যে সে প্রাণপণ চেষ্টা করেছিল···বাড়ীর সঙ্গে প্রায় বিঘে তিনেক জমি···পৈত্রিক সম্পত্তিতে তার অংশটুকু। কিন্তু বাঁচাতে সে পারলো কই! উকীল বেণীরামবাবুর কাছে পরামর্শ নিতে গিয়ে জানলো একান্নবর্তী পরিবারে, ইংরেজ সরকারের আইনে, এক ভাই যদি ধার করে, সব ভাইদের ওপরও তার বোঝা বর্তে। আশ্চর্য! ছোট ভাইয়ের ঋণের সুদ মাসের পর মাস বেড়েই চললো আর তার ফলে তার সম্পত্তিটুকু সেই বদরীদাসের গহ্বরে ঢুকে গেল। তখন আর কি উপায়ই বা ছিল! হয়ত অমৃতসরে গিয়ে চৌকিদারীর একটা কাজ যোগাড় করা যেতো। কিন্তু যদি না জুটতো! তাহলে তো অমৃতসরের পথে পথে ভিক্ষা ক'রে বেড়াতে হতো। বুড়ো বয়সে এক-মাথা পাকা চুল নিয়ে এইভাবে বাপ-পিতামহের নামে কালি চালতে মরে গেলেও সে পারতো না। ভায়ের অবশ্য একটা কাজ জুটে গেল···বারিশালের রেশমী কুঠিতে···যাবেই বা না কেন? সে তো আর তার মত বুড়ো নয়। তাই অগত্যা আজ তাকে চা-বাগানের কুলিগিরি নিতে হলো। মন্দ কি? এই তো সামনেই বুটা সর্দার বসে। সে তো এই কুলিগিরি ক'রেই পয়সা করেছে। সে বলেছে, কিছুদিনের মধ্যেই আমি জমি পাবো··· গরু পাবো···হয়ত তার মতন একজন সর্দার হয়ে উঠবো! সেও তো একদিন তারই মত নিঃস্ব ছিল, গাঁয়ে নাপিতের কাজ করতো। তাই মনে হয়, এই কুলিগিরি, এ ভালই হয়েছে। মনে হয়, অনেকটা সিপাই-এর কাজের মতনই এর সুখ-সুবিধা। হয়ত তার চেয়েও বেশী। কেন না, সে তো

নিজের চোখেই দেখেছে, সিপাই-এর কাজের জন্যে যারা গাঁ থেকে গিয়েছে, তারা শুধু নিজেদের জন্যেই একখানি ক'রে ফ্রী টিকিট পেয়েছে···তার জায়গায় চা-বাগানের সাহেব তার ছেলেপুলে, বউ, সকলের জন্যেই টিকিটের দাম দিয়েছে। আর তা ছাড়া, এই বয়সে তো আর আমি সিপাই-এর কাজ পেতে পারি না। এখানে তবুও ভরসা, বুড়ো বলে সাহেবরা বোধহয় কোন আপত্তি তুলবে না।

চিন্তার জাল ছিন্ন ক'রে সে পাশে উপবিষ্ট বুটা সর্দারকে জিজ্ঞেস করে: 'বলি ভায়া, সাহেবরা খুব ভাল লোক, কি বল?'

মুখ থেকে হুঁকোটা সরিয়ে দু'হাতের তেলো দিয়ে বাগিয়ে ধরে বুটা সর্দার উত্তর দেয়: 'আরে বলছো কি? যাকে বলে মা-বাপ!'

তামাকের ধোঁয়ায় তামাটে গোঁফের ডগা দুটো সরু ক'রে পাকিয়ে ঊর্ধ্বমুখী ক'রে নেয় বুটা সর্দার···তারপর নিজের সংক্ষিপ্ত উত্তরের ব্যাখ্যা-স্বরূপ ব'লে চলে: 'এই ধর, কারুর যদি বিশেষ কোন দায়ে-অদায়ে··· দায়-অদায় তো সবারই আছে গো? ধর একটা গরু কিনতে হবে কিংবা বিয়ে-সাদী পড়ে গেল···হঠাৎ টাকার দরকার···সাহেবের কাছে চাও··· অমনি পেয়ে গেলে···এক পয়সা সুদ নেই···অল্প অল্প কিস্তিতে যখন খুশি শোধ কর। লোকজনের দায়ে-অদায়ে ম্যানেজার সাহেব হামেশাই আছেন। কার কি দরকার···কার কি অসুবিধা হচ্ছে সব সময় তার তদারক করছেন··· বুঝেছ কিনা, কিসে লোকজন সুখে শান্তিতে থাকে। আর শুধু কি ম্যানেজার সাহেব? ছোট সাহেবও আমাদের ঠিক আপনার লোকের মত দেখেন। জিজ্ঞাসা-পত্তর···বিয়ে-সাদীতে নিজেরা এসে ভালমন্দ দেখা-শোনা করা···হাজারো ব্যাপারে রাত-দিনই তদ্বির করছেন ···বোঝ ব্যাপার! আর তা ছাড়া, খেলা-ধুলো আছে···তাতে আবার এখন-তখন তাঁরা এসে বকশিশ দেন। না দেখলে ভাই বিশ্বাস করবে না, মনিব আর কুলি··· বলি সম্পর্ক তো এই···কিন্তু কি আত্মীয়তা···এমন কি

আমাদের ঘরকন্নার কথা তো, তাতেও তাঁদের পরামর্শ নিচ্ছি…তাঁরা এসে মাথা দিচ্ছেন…কম কথা বলো ?'

ঋণ-পাওয়ার কথা শুনেই শঙ্কুর আতঙ্কিত চিত্তে মনে পড়ে যায়, গাঁয়ের মহাজনের কথা…সারা জীবনটা গিয়েছে তার বোঝা বইতে এবং তারই জন্যে আজ সে ভিটা-ছাড়া হয়ে চলেছে এই দূর বিদেশে। তাই জিজ্ঞেস করে :

'সাহেবদের কাছে যদি ধারই নিতে হয়, কত ক'রে সুদ দিতে হয় সর্দার ?'

প্রশ্নটা বুড়া সর্দারের খুব মনোমত লাগে না। যেন কোন তেতো ওষুধ গিলতে হচ্ছে এমনিভাবে ঢোঁক গিলে, চোখ পাকিয়ে সংক্ষেপে জানায় :

'সে যেমন সব জায়গায়। এই দর, বেশীও নয়…কমও নয়।'

শঙ্কু বুঝতে পারে প্রশ্নটা ক'রে সর্দারকে সে বিপন্নই করেছে। হঠাৎ তার বুকের ভেতর কি যেন মোচড় দিয়ে ওঠে। বুড়াকে সে-সম্বন্ধে আর বিব্রত না ক'রে, ম্লান হাসি হেসে সে নিজেই যেন অপরাধীর মত চুপ ক'রে যায়। বুঝতে চেষ্টা করে, হঠাৎ কেন বুকের ভেতর অমনি ক'রে উঠলো ? ভাবতে গিয়ে তার যেন সব গুলিয়ে যায়। অন্তরের অন্তরালে নিঃশব্দে কিসের যেন একটা সন্দেহ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। বুড়া কি তাহলে যা বলেছে সব ঠিক নয় ? জোর ক'রে সে-চিন্তাকে মনের গহন গহ্বরে ঠেলে ফেলে দেয়… পথেই যখন সে বেরিয়ে পড়েছে তখন আর তা নিয়ে দুশ্চিন্তা ক'রে কি লাভ ? বরঞ্চ ভাল দিকটাই ভাবা ভাল !

তাই সে নিজেকে আশ্বাস দেবার জন্যেই যেন সাহস ক'রে ব'লে ওঠে : 'তা হলে তুমি বলছ, সাহেবরা কুলিদের খুব ভালবাসে…খুব ভাল লোক… জমিদারের চেয়েও…কেমন ?'

একটু আগে শঙ্কুর প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বুড়া একটু বেচাল ক'রে ফেলেছিল, তা সে নিজেই বুঝতে পারে…তাই তা সংশোধন ক'রে নেবার জন্যে সে জমাট গলায় বলতে আরম্ভ করে : 'আরে, আসল কথা ধর না কেন !

চা-বাগানে যাঁরা নতুন কার্জ করতে আসে, তাদের তো কোন ঝক্কি-ঝামেলা থাকে না···তবে যদি কারুর পেছনের কিছু ধার থাকে, সাহেবের কাছে ধার নিয়ে শোধ ক'রে দিতে পারে। তা সে সাহেব কিছু সুদে আগাম দিয়ে দেয়। তাছাড়া, প্রত্যেক নতুন কুলি গোড়াতেই একটা বোনাস পায়···তাই থেকেই তো তার আসার খরচটা মিটে যায়, বুঝলে কি না! তারপর, যেমন-যেমন মাইনে পাবে, তেমনি-তেমনি দেশে পাঠাবে। পোষ্ট-অফিসে খোঁজ নিলেই জানতে পারবে, চা-বাগানের কুলিদের কাছ থেকে এইভাবে বছরে লাখ লাখ টাকা গাঁয়ে যায়।'

লাখের কথা শুনে, আপনা থেকে গঙ্গুর ঠোঁটের কোণে ম্লান অবিশ্বাসের হাসি ফুটে ওঠে। এই অসম্ভব ঐশ্বর্যের স্বপ্ন-সম্ভাবনাকে সে মিথ্যা বলে সম্পূর্ণ-ভাবে উড়িয়ে দিতে চাইলেও পারে না। লোকে যেমন রূপকথাকে মিথ্যা জেনেও সত্য বলে গ্রহণ করতে চায়, তেমনিধারা একটা আধ-প্রত্যয় তার মনের কোণে ঝিলিক দিয়ে যায়।

কিন্তু সামনেই বসে ছিল সজনী, হঠাৎ লাখের কথা শুনে সে চমকে ওঠে। এতক্ষণ সে আপনার মনে আপনার চিন্তায় নিশ্চল হয়ে বসেছিল···কখনও স্বামীর কথা, কখনও বা নিজের ভাগ্যের কথা ভাবছিল···হঠাৎ এই লাখের কথায় সে চঞ্চল হয়ে ওঠে···গায়ের কাপড়-চোপড় অকারণেই একবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ঠিক ক'রে নেয়···তারপর সংগোপন দৃষ্টি দিয়ে সারা কামরাটা একবার দেখে নেয়···উদ্দেশ্য, এই অসম্ভব ঐশ্বর্যের কথা অন্য যাত্রীরা কিভাবে গ্রহণ করলো, তাই দেখা।

লাখ টাকা যে কি বস্তু, তার কোন সঠিক ধারণা তার ছিল না। এমন কি একশো পর্যন্ত সে গুনতেও জানতো না। কিন্তু তবু লাখের কথা শুনে তার মনে হলো, যেখানে তারা চলেছে, সে-জায়গাটা বোধহয় স্বর্গের কাছাকাছি কোন শহর হবে।

কামরার অন্য সব কুলি দাদের কথা শুনে তন্দ্রায় ঝুলে-পড়া মুখ হঠাৎ সোজা ক'রে তুলে ফ্যালফ্যাল ক'রে চারিদিকে চেয়ে দেখে···কাঠ হয়ে এ-ওর মুখের দিকে চায়···ভীত···সন্ত্রস্ত···

বুড়ো বুঝতে পারে, তার কথায়, শুধু পঙ্কু আর তার স্ত্রী নয়, গাড়ীর অন্য সব যাত্রীদেরও কান-মন খাড়া হয়ে উঠেছে। তাই সুযোগ বুঝে সে কণ্ঠস্বর আরও মোলায়েম ক'রে বলতে আরম্ভ করে : 'নতুন কুলি তার বউ নিয়ে যখন চা-বাগানে গিয়ে ওঠে, তখন অভাব বলতে তাদের কিছুই থাকে না। যদি বুঝে-সুঝে সংসার চালাতে পারে, তাহলে ছ'দিন পরেই বউ-এর গায়ে নতুন গয়না ওঠে। তারপর, এমন সময় আসে, যখন তার হাতে বেশ কিছু টাকা জমে যায়-গাঁয়ে ফিরে গিয়ে অনায়াসে তখন জমিজমা কিনে বসতে পারে।'

সর্দারের সেই স্বপ্ন-কাহিনী পঙ্কু নীরবে শোনে। স্বভাবতই তারা ভীরু, জোর ক'রে কখনো নিজের অন্তরের সাধ-আহ্লাদ প্রকাশ করতে তারা শেখে নি। তবুও সে চেষ্টা করে···প্রাণপণ শক্তিতে অন্তরে সাহস সংগ্রহ ক'রে সে বোকা জিজ্ঞেস করে : 'কিন্তু ভাই বুড়োরাম, তুমি যে বলেছিলে সাহেবরা প্রত্যেক কুলিকে চা-বাগানেই কিছু কিছু ক'রে জমি দান করে?'

নিজের বক্তব্যকে জোর দেবার জন্যই উত্তেজিত হ'য়ে হাত নেড়ে বুড়ো জবাব দেয় : 'হাঁ, হাঁ, সত্যিই তো! সত্যিই তো বলেছিলাম। ভগবানের যদি মর্জি হয়, তুমি নিজেই দেখতে পাবে, নিজের জমিতে সেখানে চাষবাস করছো। তবে হাঁ···গেলেই কি আর তা পাবে? তার জন্যে একটু সবুর করতে হবে বই কি! জানই তো কথায় বলে, চিনি যে খায়, তাকে যোগায় চিন্তামণি! তবে অত বললেই তো সব হয় না···তার জন্যে ধৈর্য চাই···ধৈর্য! বুঝলে?'

যেন একটা মস্ত বড় দৈববাণী তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে, এমনিতর ভাব দেখিয়ে মৃদু হেসে সে সকলের দিকে ফিরে চেয়ে দেখে, কতখানি তারিফ করছে তারা।

কিন্তু তারিফের কোন চিহ্ন দেখা গেল না। যা লুকোবার জন্যে তাকে গলা চড়াতে হয়েছিল, অতিরিক্ত চড়ানোর দরুনই তা যেন শ্রোতাদের কাছে ধরা পড়ে গেল। বহুদিন জীবনে বহু বঞ্চনার সঙ্গে ঘরবাস করতে করতে, পরাজিত ও লাঞ্ছিত হলেও গঙ্গু এটুকু অন্তত বুঝতো যে, মানুষের কথা নিক্তি ধরেই ওজন ক'রে নিতে হয়, গাঁয়ের মাহুকার যেমন চাষীদের কাছ থেকে প্রত্যেক দানাটা ঝেড়ে-বেছে ওজন ক'রে নেয়। তার মনে একটা অস্পষ্ট ধারণা বরাবরই ছিল যে সে প্রতারিত হচ্ছে, কিন্তু কাল হলো তার জমির প্রতি লোভ। তাই গাঁয়ে যখন বুটা তার সামনে হাজার-রঙীন কথায় নতুন জমি পাওয়ার সম্ভাবনার স্বপ্ন সুকৌশলে তুলে ধরে, তখন তার মধ্যে যে সন্দেহের অবকাশ ছিল না তা নয়, এবং সে যে তা বুঝতে পারে নি তাও নয়; তবু এমনি জমির লোভ যে, মজ্জাগত অভিজ্ঞতার সব সতর্ক বাণীকে এড়িয়ে সেই বাক্-সর্বস্ব ফোড়ের রঙীন-কথার টোপই গিলে ফেলতে হলো তাকে। সব কিছু সে সহ্য করতে পারে, যদি তার বিনিময়ে এক টুকরো জমি পায়।

কামরায় কেউ কোন কথা বলে না, হাঁ-না কোন সাড়াই দেয় না। সেই অস্বস্তিকর নীরবতাকে কথায় ভরাট করবার জন্যে বুটাকেই উদ্যোগী হ'তে হয়। বলে: 'আসামে হাজার হাজার এমনিধারা সব কুলি জমি নিয়ে বসবাস করছে। চা-বাগানের মেয়াদ ফুরিয়ে গেলে তারা আর দেশে ফিরে যাবার নামটি পর্যন্ত করে না। চা-বাগানের কাছে কাছেই থাকতে চায়··· কারণ, তাদের ছেলেপুলেরা তখন বড় হ'য়ে আবার চা-বাগানে কাজ করতে ঢুকে পড়ে কি না! তাই বলছি ভায়া, এতে ভাবনার কিছুই নেই। তুমি তো দেখলে, সাহেব তোমাদের আসার খরচ আগাম দিয়ে দিয়েছেন, তাই নয় কি? তারপর সেখানে গেলেই, সাহেবরা বাড়ী দেবে···যা তা বাড়ী নয়···একেবারে ইংরেজী কায়দায় ইটের ঘর···মাথার ওপর সুন্দর টিনের ছাদ। সব কিছু দেবে, সব কিছু···বুঝলে? আরে, আমার কথা যদি মিথ্যে

হয়, তা হলে আমার নামে কুকুর পুষে তাকে বুটা বলে ডেকো দু'বেলা, হাঁ! এর চেয়ে আর কি ভরসা দিতে পারি, বল?'

দ্রুত কথা বলার দরুন, মুখনিঃসৃত মধু-বিন্দুতে, ঘাসের ওপরে প্রভাত শিশিরের মত, গোঁফের ডগাগুলো ভিজে গিয়েছিল। হাত দিয়ে মুছে নিয়ে, গোঁফের দু'ধারের ডগা বেশ ক'রে পাকিয়ে পাকিয়ে ঊর্ধ্বমুখ ক'রে রাখে।

গঙ্গুর মনে পড়ে, তাদের উত্তর অঞ্চলে একটা প্রবাদ বাক্য চলিত আছে, ঘটক-নাপিত আর জ্যোতিষী-বামুন, দু'জনকে কখনো বিশ্বাস করবে না। একজনকে বিয়ের বাজারে কুৎসিত মেয়েকে পরী বলে জাহির করতে হয়, আর দ্বিতীয়জনকে কুগ্রহের ফলকেও সৌভাগ্য বলে দেখাতে হয়। বুটা সেই নাপিতের ঘরের ছেলে। তবে মেয়ে বেচার ব্যবসা ছেড়ে মানুষ চরাবার ব্যবসা ধরেছে, তফাত শুধু এইটুকু।

যাতে বুটা শুনতে পায়, এমনিধারা কণ্ঠস্বরে সজনী গঙ্গুকে ডেকে বলে: 'আমাদের লীলারও তো বয়স হচ্ছে!'

অধিকাংশ সাধারণ মেয়ের মতন, সজনী বুটার সেই সব লম্বা-চওড়া কথা অনায়াসে সত্য বলেই ধরে নিয়েছিল।

সজনীর কথার ইঙ্গিত বুঝতে বুটার দেরি হয় না। তাই গঙ্গু উত্তর দেবার আগেই সে ব'লে ওঠে: 'সে-সম্বন্ধে তুমি নিশ্চিন্ত থাকো বহিন্! সে সব আমি ঠিক ক'রে দেবো। আমি তোতারামের ছেলে, জানো তো, বাবা আমার ঘটকালি ক'রেই চৌধুরী হয়েছিল। আর আমি অমন চাঁদ-পারা মেয়ের সম্বন্ধ ক'রে দিতে পারবো না? চা-বাগানে আমাদের অঞ্চলের অনেক ভাল ভাল লোকের বাস আছে···বেশ অবস্থাপন্ন লোক সব···ভাবনা কি বহিন্!'

নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোচনায় এবং বুটার প্রচ্ছন্ন সুখ্যাতিতে লীলা হঠাৎ লজ্জিত ও বিব্রত হ'য়ে পড়ে। বহু কষ্টে হাস্য সংবরণ ক'রে সে মাথা নীচু ক'রে বসে থাকে। মনে হয়, গাড়ীসুদ্ধ লোক যেন তার দিকে চেয়ে আছে।

সেই অস্বস্তিকর পরিস্থিতি থেকে নিজেকে উদ্ধার করবার জন্যে অকারণেই সে তার ছোট ভাইটিকে ডেকে ওঠে : 'এই বুদ্ধু, এদিকে আয়···দেখি, চোখটা মুছে দি···'

মেয়ের দিকে চেয়ে দেখতে দেখতে গঙ্গুর দৃষ্টি গাড়ীর অন্য সব যাত্রীর ওপর গিয়ে পড়ে। কাঠের বেঞ্চির ওপর এঁকে বেঁকে দুমড়ে যে যার স্বাচ্ছন্দ্য মতন শুয়ে বসে আছে। মনে হয়, যেন তাদের কারুরই মেরুদণ্ড নেই···মানুষের সাধারণ আয়তনের চেয়ে যেন তারা সবাই ছোট। তাদের কারুর হাতে তার মেয়েকে তুলে দিতে পারা যায় কি না সে বিচার ক'রে দেখে এবং দেখে হতাশই হয়। শুধু একটি অল্পবয়সী ছেলে, পটের কৃষ্ণঠাকুরের মত শ্যামবর্ণ, তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ট্রেনটা তখন সমতল ভূমি ছেড়ে ওপরের দিকে উঠছে। বোধহয় তারই জন্যে ছেলেটি অস্বস্তি বোধ করছিল।

হঠাৎ সেই ছেলেটির দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে, তারও যেন গা কেমন গুলিয়ে আসতে থাকে। সেই ছোঁয়াচে অস্বস্তির হাত থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্যে সে জোর ক'রে আবার বাইরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। কাল সকালে যে সমতল ভূমি ছেড়ে ট্রেনটা এগিয়ে ওপরের দিকে এসেছে, সেখান থেকে আজকের দৃশ্য সম্পূর্ণ আলাদা। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখে, সরু পাহাড়ের গা ঘেঁষে ট্রেনটা চলেছে, পাশেই সোজা খাদ নেমে গিয়েছে··· একেবারে কয়েক হাজার ফিট নীচে।

বোঁচকা-বুঁচকি ঠিক করতে করতে বুটা বলে : 'ঐ যে দেখছো ভায়া, ওটা হলো ব্রহ্মপুত্র ভ্যালী চা-বাগান···এ অঞ্চলের সব চেয়ে পুরনো জমিদারী। আর দেরি নেই···আমরা স্টেশনে এসে গেলুম বলে। স্টেশনে মোটর-গাড়ী আসবে···তাতে ক'রে কয়েক মাইল যেতে হবে···তারপর···ব্যাস···'

বুটার কথায় গঙ্গুর সঙ্গে সঙ্গে অন্য কুলিরাও বাইরে চেয়ে দেখে। পাহাড় ফুরিয়ে এসে, খানিকটা সমতল ভূমি দেখা যাচ্ছে। থাকের পর থাক যেন সুন্দরভাবে সাজানো সবুজ সব গাছের সারি দেখা যাচ্ছে।

দর্শকদের "সমঝে" দেবার জন্যে বুটা ব'লে ওঠে : 'ঐ যে দেখছো থাকে থর থাক সাজানো গাছ, ঐ হলো চা-বাগান। ওখানে গেলেই দেখতে পাবে পাহাড়ের চূড়োর ওপর কি সুন্দর সব সাহেবদের বাংলো। দেখলে চো জুড়িয়ে যায়। আশ্চর্য এই ইংরেজ জাত। পাহাড়কে গুঁড়িয়ে, নদীকে ডিঙিয়ে, জঙ্গলের পশুদেরও জয় ক'রে নিয়েছে।'

বাইরে চেয়ে পল্টু দেখে, অদূরে নিম্নে উপত্যকাভূমি সূর্য-করে ঝিকমিক করছে। সেখান থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে কামরার ভেতর নিয়ে আসতেই তার বুকের ভেতর আবার কাঁপুনি দেখা দেয়···অদৃশ্য ভবিতব্যতার বেদনা-ইঙ্গিত

এমন সময় দেখতে দেখতে চারদিকে বহু-গলায় চীৎকার-ধ্বনি জেগে ওঠে। আর্তনাদ ক'রে ট্রেনের ইঞ্জিন্ বেজে ওঠে···ধূম উদ্গিরণের শব্দের সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীর ব্রেক বন্ধ হবার শব্দ শোনা যায়। ছোট্ট বুদ্ধু মুখ হাঁ ক'রে সেই সব বিচিত্র শব্দ যেন গলাধঃকরণ করে। গাড়ী স্টেশনের ছোট্ট চৌকো বাংলো ধরনের স্টেশন ঘরের সামনে ট্রেন থেমে যায়।

পাঁচ-ছ'জন ক'রে এক এক দলে কুলিরা যে-যার চা-বাগানের দিকে রওনা হয়।

ট্রেনে বুটা সর্দার যে মোটর গাড়ীর কথা বলেছিল, যে কোন কারণে হোক সে গাড়ীটিকে স্টেশনের কাছাকাছি কোথাও দেখা গেল না। তাতে অবশ্য পল্টু বা তার পরিবারের কারোরই মনঃক্ষুণ্ণ হবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। এতক্ষণ ট্রেনে হাঁফ ধরে বসে থেকে, গা জুড়িয়ে হাঁটবার সুযোগ পেয়ে তারা বাকি পথটুকু হেঁটে যেতেই রাজী হলো।

প্রথম [illegible] সেই উঁচুনীচু পথে নতুন আবেষ্টনীর মধ্য দিয়ে যেতে তাদের ভালই লাগছিল। দু'পাশে শস্য-ভরা সুন্দর সব ক্ষেত। এক জায়গায় পল্টু দেখে একটি নতুন ধরনের লোহার লাঙলে কালো-মোটা একটা মোষ মাটি চষছে। এ ধরনের লাঙল তাদের দেশে সে দেখে নি। কিছুক্ষণ পরে পশ্চিম দিকে পড়লো একটানা চা-বাগান, তিন চার মাইলব্যাপী। পূর্বদিকে,

দূরে, স্তরের পর স্তর পাহাড় শৃঙ্গের পর শৃঙ্গ তুলে তুষার-মৌলী নন্দী পর্বতে গিয়ে মিশেছে। বিস্ময়-বিভ্রান্ত নয়নে সজনী দেখে, নন্দী-পর্বতের তুষার-শির সূর্য-করে যেন দ্বিতীয় সূর্যের মত জ্বলছে। সরল-প্রাণ ভারত-নারীর অন্তরের সহজ ভক্তিতে আপনা থেকে তার দু'টি হাত যুক্ত হয়ে যায়। সেই জলৎশুভ্রতার দিকে চেয়ে তার মনে হয়, ও যেন মহাদেবের তৃতীয়-নেত্রের রোষাগ্নি··· নীরবে মহাসম্ভ্রমে সে দেবতাকে অন্তরের প্রার্থনা জানায়।

কিন্তু কিছুক্ষণ পথ চলার পর সমতল মাটি হঠাৎ শেষ হয়ে যায়। শুরু হয় জঙ্গল-ভরা চড়াই-উতরাই। এ-পথে চলতে তারা অভ্যস্ত নয়। বিশেষ ক'রে অসুবিধে হলো বুদ্ধুর। তাকে কোলে ক'রে নিয়ে যেতে হবে। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে সরু একটা পায়ে-হাঁটা পথ, ঘন ঘাসের গুল্ম, ফার্ন আর রডডেনড্রেন-বনের মধ্যে দিয়ে চিরে বেরিয়ে গিয়েছে। যতই অগ্রসর হয়, ততই বায়ু-চলাচল যেন মন্থর হয়ে আসে। চারদিকে একটা ভাপসা গুমোট। সেই দিবালোকে এক বিচিত্র এক আধ-অন্ধকারে বন-পথের গোলকধাঁধার মধ্যে সব যেন একাকার হয়ে গিয়েছে, কোন্ গাছের কোন্ পাতা, কার কোন্ ডাল, সে কিছুই ঠিক করতে পারে না···সব যেন তাল-গোল পাকিয়ে এক ঘন সবুজ বস্তু-পিণ্ডে পরিণত হয়ে গিয়েছে···সেই গাছ-পালা-লতার মধ্যে সে-ও যেন গিয়েছে মিশে। তখনও বনের ভেতর টুপ্‌টাপ ক'রে শিশির ঝরে পড়ছে··· লতায়-পাতায় আলো-আঁধারে বিচিত্র সব ছায়া-মূর্তি গড়ে উঠছে আর ভাঙছে···তার সঙ্গে বনের ভেতর থেকে লক্ষ পতঙ্গের অশ্রান্ত শব্দ আসছে···কোনটা ক্ষীণ···কোনটা উচ্চ···তীব্র কর্কশ···যেন অন্ধকারের আর্তনাদ। সজনীর স্মৃতিতে চিত্র জেগে ওঠে যাত্রার-আসরে শোনা পুরাণের কাহিনী, বুঝি এমনি নরকের বিভীষিকার পরীক্ষার মধ্য দিয়ে উত্তীর্ণ হয়ে পুণ্যাত্মাদের যেতে হয় ঈপ্সিত স্বর্গলোকের অভিসারে। মাঝে মাঝে পিছন ফিরে চেয়ে দেখে, সজনী আর ছেলেমেয়েরা কত পিছনে পড়ে রইলো। সজনী মুখে বুকে তাকে অনুসরণ ক'রে চলে···পুরাকালের

বীর-নারীরা যেমন স্বামীকে অনুগমন করতো…মাঝে মাঝে পায়ে কাঁটা ফুটছে…খিদেতে পেটের ভেতর জ্বলে জ্বলে উঠছে…তবুও সামনে ঈপ্সিত স্বর্গলোকের আশায় কেউ মুখ ফুটে কোন প্রতিবাদ জানায় না।

তাদের চাঙ্গা ক'রে রাখবার জন্যে বুটা দার্শনিকের মত বলে : 'খিদের অন্ন খুঁজতে এমনিধারা অজানা পথে বীর-পুরুষেরাই এগিয়ে যায়। আর এই ব্যাপারে আমাদের উত্তর অঞ্চলের লোকের মতন সাহস আর কারুর নেই।'

মাঠ মাঠের সপিল পথ অতিক্রম ক'রে যখন তারা আবার মুক্ত প্রান্তরে এসে পড়লো, তখন অপরাহ্ণ পড়ে গিয়েছে। সামনেই বৈশাখের খর সূর্য মেঘচুম্বী পর্বতের বাধা উল্লঙ্ঘন ক'রে প্রশান্ত প্রান্তরকে রৌপ্য-বাণ-বিদ্ধ করছে। আঙুল দিয়ে সামনে দেখিয়ে বুটা বলে : 'ঐ আমাদের ডেরা!'

চারদিকে দলে দলে কুলিরা তখন কাজ করছে কিন্তু সে-সব ভাল ক'রে দেখবার সুযোগ ঘটলো না। শম্ভু দেখে, একটা ছোট্ট কাঠের শেডের তলায় তাদের নিয়ে এসে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং তাদের সামনে দাঁড়িয়ে বাবু শশীভূষণ ভট্টাচার্য। এই লোকটি যে চা-বাগানের একজন বিশিষ্ট কর্তা সে-সম্বন্ধে অনেক কথাই বুটার মুখে সে শুনেছে।

পাতলা দেহ, মুখ দেখলেই মনে হয় ধূর্ত, মাথায় একরাশ চুল…বাবু শশীভূষণ ভট্টাচার্য ভাঙা হিন্দুস্থানীতে তাদের শুভ-অভ্যর্থনা জানালেন।

'বলি এই শুয়োরের বাচ্চারা, এই কি লোকজন নিয়ে আসবার সময়? সাহেবরা টিফিন খেয়ে বিশ্রাম করছেন… অফিসও বন্ধ হয়ে এলো…আর এখন তোদের আসবার সময় হলো, হ[illegible]!'

বুটা সচকিত হয়ে উঠে, নমস্কার জানাবার ছলে হাত দিয়ে কিসের যেন ইঙ্গিত করে।

শম্ভু এ-ধরনের ইঙ্গিতের ভাষায় মানুষকে কথা বলতে দেখেছে শুধু যেখানে গোপনে কোন টাকা লেন-দেনের ব্যবস্থা হয়। তার স্পষ্ট ধারণা হলো, বুটা

হয়ত বাবুটিকে যে ঘুষ দেবে বলেছিল, তা দেয় নি। ঠিক এমনি ঘুষের ব্যাপার নিয়ে গালাগাল আর হাত মোচড়ানি সে হোসিয়ারপুর আদালতে দেখেছে। হঠাৎ এই সময় শেডের দরজায় দেখে লম্বা-চেহারা এক সাহেব নিঃশব্দে কখন এসে গিয়েছে।

'হ্যাল্লো শশীভূষণ!' সাহেব ডেকে উঠলো।

হঠাৎ সাহেবকে দেখে বাবু শশীভূষণ চেয়ার থেকে উঠে সেলাম করবে, না, চেয়ারে বসে আগে সেলাম ক'রে তারপর উঠবে, ঠিক করতে না পেরে চেয়ার নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়ে; তার ওপর বাবু টেবিলের তলায় জুতোটা খুলে রেখেছিলেন, তাড়াতাড়ি জুতোটা খুঁজে পায়ে দিতে গিয়ে আরও বিভ্রান্ত হয়ে পড়লেন।

ইত্যবসরে বুটা কপালে হাত ঠেকিয়ে অভিবাদন জানায়: 'সেলাম, হুজুর!'

সহসা শ্বেতাঙ্গের আবির্ভাবে চারদিক থমথম ক'রে ওঠে···আশপাশে যে-সব কুলিরা কাজ করছিল ভয়ে তাদের মুখের চেহারা বদলে যায়।

গঙ্গুদের দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে ভাঙা হিন্দুস্থানীতে সাহেব বলে: 'কাল সকালে আমি ওদের মেডিক্যাল করবো···আজ এই এলো··· নিশ্চয়ই খুব ক্লান্ত···আজকের মতন ওদের ডেরায় পাঠিয়ে দাও···হাঁ···ওদের ডেরা সাফশোফ্ করা হয়েছে তো?'

এতক্ষণে বাবু শশীভূষণ প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়েছেন। জাপানী পুতুলের মত ঘাড় নাড়তে নাড়তে উত্তর দেন: 'ইয়েস্যার ইয়েস্যার!'

সাহেব ঘুরে দাঁড়িয়ে চলে যায়। বোকার মতন একগাল হেসে উঠে, সব অঙ্গ দুলিয়ে, তারস্বরে চীৎকার ক'রে শশীভূষণ তাড়াতাড়ি মিলন-সম্ভাষণেই বিদায়-অভিবাদন জানান: 'গুড্ ডে স্যার!'

কুলিরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে, কারণ পথশ্রমে তখন সর্বাঙ্গ তাদের টনটন করছে।

বাবু শশীভূষণ গর্জন ক'রে ওঠেন : 'যাও। ডাক্তার সাহেব কাল দেখবেন।'

আবার কাফিলা লাইন ধরে শেডের বাইরে গিয়ে হাঁটতে আরম্ভ করে।

বুটাকে ডেকে বাবু শশীভূষণ বলেন : 'এই বুটা! শুনে যা এক মিনিট··· একটা কথা আছে···'

॥ দুই ॥

সেদিন অফিস থেকে বাংলোর দিকে ফেরবার পথে, শুধু একটি মাত্র চিন্তা [illegible] মনকে আচ্ছন্ন ক'রে ছিল। মৃত্যুর চিন্তা। অফিসে যে ল্যাবরেটরীর ভার সে পেয়েছিল, তাকে আর যাই বলা যাক আধুনিক বলা চলে না। পুরনো ধরনের একটিমাত্র অণুবীক্ষণ-যন্ত্র···তারই সাহায্যে সারাদিন ধরে সে জীবাণু-চর্চা করেছে। দৃষ্টির অগোচর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সেই সব মৃত্যুর সংবাহকদের রঙীন বিচিত্র মূর্তি দেখতে দেখতে সে তন্ময় হয়ে গিয়েছে। মৃত্যুর এমন সুন্দর মোহন মূর্তি· ক্ষুদ্রতম আয়তনের মধ্যে এমন নিপুণতম কারুকার্য··· বিন্দুর মধ্যে সিন্ধুর অপূর্ব লীলা···অন্তরকে আপনা থেকেই বিস্মিত করে।

কিন্তু মৃত্যু তো জীবনেরই স্বাভাবিক পরিণতি। বিষণ্ণ ভারাক্রান্তচিত্তে সে ভাবে, এই যে নিত্য রাসায়নিক পরিবর্তন, এই হলো প্রকৃতির স্বধর্ম। কুঁড়ি থেকে ফুল, ফুল থেকে ফল, এক রঙ থেকে আর এক রঙের পরিবর্তন· অজস্র ধারায় সব জড়িয়ে আছে অনাদি জীব-চক্রে। সেখানে জীবন আর মৃত্যু, সৃষ্টি আর ধ্বংস হলো পরস্পর পরস্পরের সম্পূরক। প্রকৃতি থেকে দৃষ্টি তুলে মানব-সমাজের দিকে তাকালেও দেখা যায়, সেই একই সূত্র কাজ ক'রে চলেছে। সমস্ত সামাজিক অগ্রগতি এক বিরাট কার্য-কারণ-চক্রে বিচ্ছেদ আর একীকরণের পথে এগিয়ে চলেছে। সেখানে একের অস্তিত্ব শুধু বহুর

সঙ্গে সম্পৃক্ত বলেই···সমাজের সম্পর্কেই সেখানে মানুষের পরিচয়। যে-মাটিতে সে জন্মগ্রহণ করেছে, যে-পরিবেশ, যে-সামাজিক রীতি-নীতির মধ্যে সে বড় হয়ে উঠেছে, তার সমস্ত অভ্যাস, আকস্মিকতা, জন্মাধিকার, সবই তার অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পৃক্ত।

হঠাৎ রাস্তার ধারে কুলিদের পায়খানা থেকে বাতাসে তীব্র দুর্গন্ধ এসে নাকে লাগে। আপনা থেকে তার নাক উঁচু হয়ে ওঠে···দূর হিমালয়ের তুষার-শৃঙ্গের দিকে মাথা তুলে দাঁড়ায়, যেন তাতেই দূর হিমালয়ের নিকলুষ স্নিগ্ধ বায়ুর স্বাদ সে পেয়ে গেল। কিন্তু এত সহজে সেই উদগ্র দুর্গন্ধের বাস্তবতা থেকে রেহাই পাওয়া সম্ভব হলো না।

মুখ বিকৃতি করে আপনার মনে সে বলে ওঠে : 'কি লজ্জার কথা! এখনো সেপ্‌টিক্ পায়খানার কোন বন্দোবস্তই করলে না কর্তারা!'

সঙ্গে সঙ্গে সে পদক্ষেপের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। চলতে চলতে মানস-চক্ষে সে স্পষ্ট দেখতে পায়, পুঞ্জীভূত আবদ্ধ পুরীষে হুক-ওয়ার্মের কোটি কোটি জীবাণু দলবদ্ধ হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে···নির্বিবাদে বাচ্চা পাড়ছে···অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়েও যাদের দেখা যায় না, তাদের যেন স্পষ্ট সে চোখের সামনে দেখছে। নিশ্চয়ই, মনোমত আবাসভূমি এবং খাদ্য পেয়ে তারা মনের সুখে বংশ বৃদ্ধি করে চলেছে···অসংখ্য হুক-ওয়ার্ম আর মশকের দল।

চলতে চলতে সে ভাবে, যদি একবারও এই সব বড় বড় ব্যবসায়ীরা ভাবতো যে, ব্যাধি আর তজ্জনিত রক্তাল্পতা আর অকাল-স্থবিরতা থেকে যদি কুলিদের রক্ষা করা যায়, তাতে লাভ সকলের চেয়ে বেশী হবে তাদেরই। সমস্ত পৃথিবী যেন আজ উন্মাদ হয়ে গিয়েছে···বদ্ধ উন্মাদ অন্ধের মত ছুটে চলেছে সুনিশ্চিত আত্ম-ধ্বংসের দিকে। বছরের পর বছর কলেরায় কুলি-ধাওড়া থেকে শতশত লোক অকালে প্রাণত্যাগ করতে বাধ্য হচ্ছে। যদি কোম্পানীর মালিকরা তার প্ল্যান অনুযায়ী কাজ করতো, তাহলে সেই জীবধ্বংস অনায়াসেই প্রতিরোধ করা যেতো।

আপনার মনে যে ভেবে চলে, এখানে ল্যাবরেটরীতে বসে আমি একা মাসের পর মাস প্রাণ ক'রে গলদ্‌ঘর্ম হয়েই চলেছি, কিন্তু মালিকদের কাছ থেকে আজও তার কোন জবাব পেলাম না। আজও বাড়ী গিয়ে দেখবো, কোন চিঠিই আসে নি···হয়ত যদিও বা এসে থাকে, দেখবো দুঃসংবাদই এসেছে। অথচ এখান থেকে মাত্র দশ মাইল দূরে, গয়লাপাড়ায় মড়ক শুরু হয়ে গিয়েছে···এখানে এসে পৌঁছলো বলে।

হঠাৎ রাস্তার পাশে একটা উঁচু টিলার ওপর এসে সে থমকে দাঁড়িয়ে যায়··· সামনেই সেই পথ দিয়ে গেলে বড় সাহেবের বাংলো পড়ে। সেখান থেকে সমস্ত উপত্যকা ভূমি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। সামনেই উত্তর দিকে হিমালয়ের ছোট ছোট গিরিশৃঙ্গগুলি থাকের পর থাক পড়ে রয়েছে···তারও ওপারে আকাশের কোলে দেখা যায় শুভ্র-তুষার-বিমণ্ডিত-শির গিরিরাজ···অপরাজেয় ···অনিন্দ্যসুন্দর···অপূর্ব মনোমোহন। সেই দুরধিগম্য পর্বতমালা, প্রকৃতির নিজের হাতে তৈরি সেই সব দুর্গ···তাকে তীব্রভাবে আকর্ষণ করে···সে তীব্রতা যেন সে তার দেহাভ্যন্তরে অস্থিমূলে অনুভব করে। জীবনে বহুবার অন্তরের দুর্বার প্রেরণায় সে পায়ে হেঁটে সেই দুরধিগম্য পর্বত-চূড়ায় পৌঁছবার চেষ্টা করেছে। তার মনে হয়, হিমালয়ের এই দুরধিগম্য পর্বত-শিখরে মানুষের এই যে অভিযান-প্রচেষ্টা, এ যেন জীবনের মহা-সত্যের সন্ধানের প্রতীক। পদে পদে বাধা, পদে পদে প্রতিকূল প্রকৃতির সংগ্রাম-আহ্বানকে তুচ্ছ ক'রে, অতিক্রম ক'রে, সে যেন নিজের অস্তিত্বের সর্বোচ্চ শিখরে গিয়ে দাঁড়ানো!

সামনেই যে পর্বতমালা চলে গিয়েছে, তার পাদদেশ থেকে, না জানি কত শত মাইল পর্যন্ত ঝোপে পড়ে রয়েছে উত্তর আসামের অনাবিষ্কৃত অরণ্য-ভূমি ··মৃত্যুবাহী মশক আর কীট-পতঙ্গ, রক্তমোক্ষণকারী ভয়াবহ সব জোঁক, মানব-অস্তিত্বের জীবন্ত প্রতিবাদ-স্বরূপ নিরুপদ্রবে সেখানে ঘুরে বেড়ায়··

তারও নীচে, প্রায় মাইল দশেক ব্যেপে বিরলশর্ষ্প তৃণ-ভূমি··· বাঁশ বন, কাঁটা গাছ আর ছোট ছোট গুল্মে ভরা। তারই প্রান্তে শুরু হয়েছে চা-বাগান, থাকের পর থাক উঠে গিয়েছে। সর্বোচ্চ স্তরে সাহেবদের বাংলো, ইংলণ্ডের পাহাড়ী অঞ্চলের সেকেলে জমিদারদের ক্যাস্‌ল-এর মতন। তফাত শুধু ইঁট আর পাথরের বদলে এই সব বাংলো কাঠের তৈরি। গড়নটা কিন্তু বিলেতের এপসম্‌ ডাউনে রেসকোর্সের বাড়ীর গড়নের অনুকরণে। তবে বিলেতে বাড়ী গুলোর সামনে মুক্ত মাঠ আর আকাশ, আর এখানে দেশী লোকচক্ষুর কদর্যতা থেকে আভ্যন্তরীণ আব্রু রক্ষা করবার জন্যে ফার গাছ আর উঁচু কাঁতার পাচিল দিয়ে সামনেটা একেবারে ঢেকে রাখা হয়েছে।

সেইখানেই একধারে পাহাড়ের চূড়োর ওপর চা-বাগানের ছোট সাহেব রেগী হাণ্টের বাংলো। তারই দুটো চুড়োর তফাতে ছ লা হাভরের আবাস স্থল, ঠিক হাসপাতালের পেছন দিকে। সেখান থেকে বাঁ দিকে দেখা যায়, ছোট পার্বত্য নদী···ওপর থেকে ঝর্ণার মত নীচে নেমে গিয়েছে।

এই নদীর ধারেই কুলি-ধাওড়া, সামনে ধানের ক্ষেত, তার ওপর দিয়ে থাকের পর থাক চলে গিয়েছে কুলিদের ঘর-বাড়ী···পাঁচটা চা-বাগানের সমস্ত কুলি, সংখ্যায় প্রায় এগারো হাজার হবে, সবাই সেখানে এক জায়গায় এসে জুটেছে।

এইখান থেকেই বছরের পর বছর মড়কের সূত্রপাত হয়। তার ফলে এখন অপেক্ষাকৃত নীচের জমিতে যে সব কুলি কাজ করে তারা সবাই আতঙ্কিত হয়ে গিয়েছে। সেইজন্যেই আজকাল কাছে-ভিতের সমস্ত অঞ্চল থেকে নতুন কুলি সংগ্রহ করা দুরূহ হয়ে উঠেছে।

ছ লা হাভরের এখনও আশা আছে, যদি তার ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়, এবং সত্যিই যদি তাকে স্বাধীনভাবে কাজ করবার ক্ষমতা দেওয়া হয়, তাহলে সে এই ভয়াবহ মানব-ক্ষয়ের মূলোৎপাটন করতে পারে। কিন্তু এখানে কি স্বাধীনভাবে কেউ কিছু করবার অধিকার কখনো পেয়েছে?

এই সমস্যা সমাধানের জন্য যে ব্যবস্থা সে ঠিক করেছে, কোনমতেই তাকে দুরূহ বা দুঃসাধ্য বলা চলে না। অনুসন্ধান ক'রে সে বুঝেছে যে জলের দোষেই এই মড়ক নিয়মিতভাবে প্রত্যেক বৎসরে দেখা দিচ্ছে। এখানে যেভাবে জল সরবরাহ করা হয়, আসল গলদ হচ্ছে তারই মধ্যে এবং তার জন্যেই এত ব্যাধির প্রকোপ। এ-কথা জেনেও সে-সম্বন্ধে কোন প্রতিবিধান না করা আর সজ্ঞানে মানুষ খুন করা, তার মধ্যে কোন তফাত নেই। দুটো চা-বাগান ছাড়া, অন্য সব চা-বাগানের লোক পাতকুয়োর জলই ব্যবহার করে। একটা হলো ম্যাকারার চা-বাগান, তারা একটা পার্বত্য ঝর্ণা থেকে জল ব্যবহার করে। দ্বিতীয়টি হলো, এই ম্যাকফারসনের চা-বাগান: নলের ভেতর দিয়ে নদী থেকে যে জল আনা হয়, এখানকার লোকে তাই ব্যবহার করে। এই সব জলের ব্যবস্থার মধ্যেই গলদ রয়ে গিয়েছে। তাই সে প্ল্যান করেছে, পাহাড়ের ওপর যে জল জমে, নলের সাহায্যে সেই জল নিয়ে এসে একটা বড় আধারে সুরক্ষিত অবস্থায় জমা ক'রে রাখতে হবে এবং সেখান থেকে প্রত্যেক বাড়ীতে সরবরাহ করবার ব্যবস্থা করতে হবে। সে হিসাব, ক'রে দেখেছে, তাতে সবশুদ্ধ প্রায় দু'লাখ টাকা খরচ পড়বে। কিন্তু সে-খরচ গায়ে লাগবে না… অন্যভাবে অনায়াসেই পুষিয়ে যাবে…

পথ চলে আর সেই কথা ভাবে। হয়ত বাড়ী ফিরে আজ সত্যি সত্যিই দেখবে, সুখবর এসে গিয়েছে। আপনা থেকে তার চলার বেগ বেড়ে ওঠে।

জ্যাক্ ট্রেভেকের বাংলোর ভিতরে যখন সে ঢুকেছে, তখন দেখে বৃদ্ধ খানসামা ইলাহি বক্স ধীর মন্থর গতিতে বারাণ্ডার দিকে এগিয়ে আসছে। লাল কোমরবন্ধের ওপর সাদা কোটে সারা গা ঢাকা…বয়সে আপনা থেকে পিঠ কুঁজো হয়ে গিয়েছে। আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে বারাণ্ডার কোণে ঝোলানো ঘণ্টায় মৃদু আঘাত করে… চা পানের ঘণ্টা। কাঠের সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে, বারাণ্ডার হ্যাট্‌স্ট্যাণ্ডের ওপর শিরস্ত্রাণটি ঝুলিয়ে রেখে স্ট্যানলি হাভর জিজ্ঞেস করে: 'সাহেব ওঠে নি এখনো?'

অর্থহীন সশব্দ হাসিতে হরিদ্রাভ দন্তগুলি বার ক'রে ইলাহি বক্স্ জানায় : 'না, হুজুর !···চা রেডী !'

ঠিক সেই সময় সামনের বৈঠকখানা ঘর থেকে দীর্ঘ বিপুলায়তন এক নারীবপু সবলপদক্ষেপে বেরিয়ে এসে ডাক্তারকে অভিবাদন জানায় :

'এই যে, ডাক্তার ! এসো···বসবে এসো ! মিঃ ক্রুক্‌টুকুক্ স্নানের ঘরে ঢুকেছেন।'

দেহের তুলনায় ক্ষুদ্র হাতখানি আলস্যভরে মিসেস্ ক্রুক্‌টুকুক্ এগিয়ে দেন। ডাক্তার তাড়াতাড়ি প্রসারিত হাতটি চেপে ধরেই ছেড়ে দেয়, লৌকিকতার প্রথম ধাক্কাটা কোনরকমে এড়িয়ে ওঠবার জন্যে।

সামনের চিত্রিত দেয়ালের গায়ে হরিণের মাথা. খান দুয়েক ভাল্লুকের চামড়া, এবং এই ধরনের আরও কয়েকটি শিকারের বিজয়-চিহ্ন চোখ তুললেই নজরে পড়ে। দক্ষিণ কেনসিংটনের জীবজন্তুর মিউজিয়ামের কথা ডাক্তারের মনে পড়ে যায়। সেইদিকে চেয়ে থাকতে থাকতে কেমন যেন একটা অস্বস্তি অনুভব করে। তার ক্রমবর্ধমান প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত করবার জন্যে প্রশ্ন ক'রে ওঠে :

'আপনারা কেমন আছেন সবাই ?'

'উঃ ! অসহ্য গরম, ডাক্তার ! কি ক'রে গ্রীষ্মটা কাটিবে ভেবে পাই না। গত বছরের এই সময় একজিমার মতন হয়েছিল দেখতে দেখছি ব্যাপার সুবিধে নয়, মুখের ওপর থেকে যেন এক-পর্দা চামড়া ফেটে পড়ছে। তার ওপর চোখের সেই পুরনো ব্যারামটাও চাড়া দিয়ে উঠছে। তাই চার্লস্‌কে বলছি, এসব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে চল হোমে ফিরে যাই !'

আধা-নাকি-স্বরে মিসেস্ ক্রুক্‌টুকুক্ উত্তরে জানান :

'আর, তাছাড়া বাবুবারাকে তো এই অন্ধকূপের মধ্যে চিরকাল পুরে রাখলে চলবে না··· তাকে ভদ্রনমাজে সভ্যজগতে মিশতে তো হবে।, এই যে রেগী···হ্যালো রেগী···'

সামনের দিকে চেয়ে মিসেস্ ক্রুক্ টুকুক্ উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন।

হ্যা হাভর জানতো, দীর্ঘকাল ভারতবর্ষে বাস করার দরুন, এখানকার সব কিছুর ওপরই একটা বিতৃষ্ণার ভাব দেখানো মিসেস্ ক্রুক্ টুকুকের স্বভাবে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। তা ছাড়াও, তাঁর কথাবার্তার সুরে কেমন যেন একটা অতিরিক্ত মুরুব্বীয়ানা ছিল, হাভরের অসহ্য লাগতো।

হাতের টেনিস-ব্যাটখানি দোলাতে দোলাতে রেণী সিঁড়ির ওপর দিয়ে উঠে এসে প্রত্যভিবাদন জানায়: 'হ্যালো…হ্যালো…'

গলা-খোলা শাদা শার্টের ইস্ত্রী-করা কলারের ওপর তার সুন্দর মুখখানি আরও সুন্দর দেখাচ্ছিল।

মৃদুকণ্ঠে হাভর অভিবাদন স্বীকার করে।

বারান্দার ওপর উঠে এসে, চায়ের টেবিলের ধারে বেতের চেয়ারে বেপরোয়াভাবে রেণী দেহকে এলিয়ে দিয়ে বসে পড়ে। চারিদিকে একবার চোখ ঘুরিয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করে: 'আর সব কোথায় গেল…কি ব্যাপার, কাউকে দেখছি না যে?'

মিসেস্ ক্রুক্ টুকুক্ হেঁকে ওঠেন: 'চার্লস! বাব্বারা! চা!'

মেমসাহেবের সরু বাঁশীর মত আওয়াজ গৃহাভ্যন্তরে পৌঁছবার আগেই, পর্দা ঠেলে চার্লস্ ক্রুক্ টুকুক্ বেরিয়ে আসে; ছোটখাট মানুষটি, …ন চুয়াল্ল হবে, কিন্তু ইতিমধ্যেই মাথার চুল সব শাদা হয়ে এসেছে। দেখলেই বোঝা যায় যে, মেমসাহেবের মত চেহারায় আকর্ষণীয় কিছু না থাকলেও দিব্য শক্ত সমর্থ মানুষ, নিজের ওজন সম্বন্ধে মনে কোন সন্দেহ নেই। অভ্যাগতদের অভিনন্দন জানিয়ে বলে ওঠেন: 'সুস্বাগত!'

'আমি ভেবেছিলাম টুইটি, ম্যাকেরা, হিচকক্ টেনিস্ খেলবার জন্যে এখানে এসেছে।' রেণী জানায়।

'হ্যালো এভ্রিবডি!' সু-উচ্চকণ্ঠে অভিবাদন জানিয়ে বাতাসে দু'হাত দুলিয়ে নাটুকীয় ভঙ্গীতে প্রবেশ করে বাব্বারা। ঝকঝকে তামার

মত রক্তিম দুই গণ্ড···সারা দেহ থেকে উচ্ছল প্রাণধারা যেন গড়িয়ে পড়ছে।

রেগীর কথার উত্তর দেন মিসেস্ ক্রফ্‌টকুক্ :

'এই গরমে কি টেনিস খেলা যায় রেগী ?'

'কারুর কারুর আবার গরমটা একটু বেশী লাগে !'

মার কথায় মেয়ে বক্রোক্তি করে।

'ফাজলামী করতে হবে না, বেব্‌স—' মিসেস্ ক্রফ্‌টকুক্ মৃদু ধমক দিয়ে ওঠেন : 'সত্যিই আমার গরম অসহ্য লাগে···লাগেই তো···এইমাত্র ডাক্তারকে সেই সম্বন্ধে বলছিলাম, গতবারে এইসময় একজিমায় ভুগতে হয় আমাকে। এবারেও চামড়ায় টান ধরেছে দেখছি। বার বার আমি চার্লসকে সেইজন্য বলি : 'বাপু তোমার বোনাস্ যা পাওনা আছে, তা নিয়ে-থুয়ে চল হোমে চলে যাই !'

বার্‌বারা গম্ভীর হয়ে মাকে রাগাবার জন্যে বলে :

'সত্যি ড্যাডি, কি সর্বনাশ করেছ বল দিখি ? কেন এমন কাজ নিতে গেলে ?'

বার্‌বারার দিকে ঘেঁষে শুধু তাকে শোনাবার জন্যেই অতি মৃদু কণ্ঠে ডাক্তার বলে ওঠে : 'দুষ্টু কোথাকার !'

কিন্তু ডাক্তারের চোখের দিকে চেয়ে বার্‌বারা দেখে রূঢ় ভর্ৎসনার দৃষ্টি, প্রথম দিন ক্লাবে ডাক্তারের সঙ্গে তার যখন দেখা হয়, তখন তার দুর্বিনীত রসিকতার উত্তরে এমনি রূঢ় দৃষ্টির প্রত্যুত্তরই মিলেছিল। সে-দৃষ্টি সে আজও ভুলতে পারে নি।

ডাক্তার তার বেশী কিছু বলতে পারে না, কিন্তু যে-কথা এদের সামনে প্রকাশ্যে সে বলতে পারলো না সে-কথা তার মনে তোলপাড় হতে থাকে। ঠিকই তো ! যাদের দেশ, যাদের মাঠ-ঘাট, জমি-জমা, তাদের দেশে তোমরা মোড়লি করতে এসেছ কেন ? তাদের কাজ তাদের ওপর ছেড়ে দাও না কেন ? এ হলো তাদের দেশ, এখানে কী অধিকার আছে তোমাদের থাকবার ?

জ্যাক্সারের দৃষ্টি-ভর্ৎসনা বাতাসে উড়ে যায়। সামনে এতগুলি পুরুষমানুষ সে-ক্ষেত্রে একজন নারী অপর নারীকে আঘাত করবার সুযোগ ছেড়ে দিতে পারে? হোক না সে অপর নারী নিজের গর্ভধারিণী জননী! তাই বারবারার ছেলেমীনুষী-প্রবৃত্তি তীব্রতর হয়ে ওঠে। মাকে শুনিয়ে শুনিয়ে পিতাকে বলে:

'সত্যি ড্যাডি, কি কষ্টে মাকে থাকতে হয়, ভেবে দেখেছ? নির্বান্ধব এই জঙ্গলে, না আছে নাচ, না আছে মজলিস! এমন কি বন্ধুবান্ধব কেউ নেই যে মা একটু গল্প-স্বল্প ক'রে সময় কাটাবে!'

মিসেস্ ক্রুক্‌চুক্ তখন চা তৈরি করতে ব্যস্ত ছিলেন, তাই মেয়ের কণ্ঠস্বরের শ্লেষটুকু বুঝে উঠতে পারলেন না। তাই ব্যথার ব্যথী পেয়ে তিনি আরও যেন কাতর হয়ে উঠলেন। চা ঢালতে ঢালতে বলেন: 'সত্যি বাছা আমিও তাই বলি, কিন্তু শোনে কে? আর তা ছাড়া তোর কথাটাও তো আমাকে ভাবতে হবে। এই প্রচণ্ড গরম, তার ওপর এখানে তোর কেউ খেলার সঙ্গী নেই। তোর মতন বয়সের য়ুরোপীয় মেয়ের চারদিকে কিনা হাজার হাজার কুলি! কি সর্বনাশ! তোকেও বলি বাছা, ঘোড়া নিয়ে বাইরে একলা হৈ হৈ করতে বেরুবি···সঙ্গে একটা সহিস পর্যন্ত নিবি না···এ কি ভাল? এইসব নেটিভদের মধ্যে সবরকমের বদমায়েস আছে···চা···জন্?'

মিসেস্ ক্রুক্‌চুকের নিমন্ত্রণের উত্তরে জন্ লা হাভর সম্মতি জানিয়ে চায়ের কাপটি হাতে তুলে নেয়। বারবারার দিকে ঘাড় বেঁকিয়ে মৃদু হেসে যেন আপনার মনে সে আবৃত্তি ক'রে চলে: 'সেদিন একটা জায়গায় চায়ের বর্ণনা প্রসঙ্গে পড়েছিলাম, শতলক্ষ ভারতবাসীর ক্ষুধা আর নৈরাশ্যের রক্তাক্ত নির্যাস হলো এই চা!'

বিদ্রোহিনীর মত জন্ লা হাভরের দিকে প্রজ্বলিত দুই নয়ন-প্রদীপ তুলে বারবারা সু-উচ্চ কণ্ঠে বলে ওঠে: 'খুব হয়েছে খুব হয়েছে, জন্! ফের আবার তোমার ঐ সব বোলশীভিক্ কথা! এমনেই তো আমার ব্যাপার নিয়ে

বাবা তোমার ওপর চটে আছেন, তার ওপর যদি এইরকম ভুল বকতে থাকো, তাহলে চাকরির দফা খতম!'

কথাটা অস্পষ্ট। তার রেশটি মিসেস্ ক্রুক্‌ট্‌কুকের কানে যেতেই তিনি জিজ্ঞেস ক'রে উঠলেন: 'কি ভুল বকছে রে?'

কিন্তু তার উত্তর শোনবার আগেই তিনি রোগীকে আপ্যায়িত করবার জন্যে জিজ্ঞেস করলেন: 'চা হবে, না, একটা পেগ দেবো?'

'দয়াই যদি করলেন, তাহলে একটা পেগই দিন।'

সঙ্গে সঙ্গে চার্লস্ ক্রুক্‌ট্‌কুকও তার আবেদন পেশ করে:

'আমারও তাহ'লে ঐ একই ব্যবস্থা!'

মিসেস্ ক্রুক্‌ট্‌কুক্ হেঁকে উঠলেন: 'লাই বক্‌স্! দুটো পেগ জলদী নিয়ে আয়! কিন্তু···সোডা বা বরফ, তো কিছুই নেই! ওঃ, চার্লস্ কি হবে বলো তো এখন? এই দুর্ধর্ষ গরমে সোডা আর বরফ ছাড়া হুইস্কী খাবে কি ক'রে? কি সর্বনাশ বলতো?'

'কেন, আজ শহর থেকে বরফ আনা হয় নি?' চার্লস্ বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করে।

মিসেস্ ক্রুক্‌ট্‌কুক্ একান্ত দুঃখিত হয়েই জানান: 'বলতে পারি না অফিসে এসেছে কিনা, তবে সইস্ তো অফিস থেকে নিয়ে আসে নি এখনো! কি বলবো, এই সব দেশী চাকরগুলো···উঃ! এই 'লাই বক্‌স্, রোজ বাজারের তরি-তরকারির দাম নিয়ে আমাকে ঠকাবে···ডাকাতি···স্রেফ্ ডাকাতি। গত শনিবার আমি নিজে বাজারে গিয়েছিলাম···দেখি, বাজারে আনাজ আনায় একসের ক'রে বিক্রি হচ্ছে।'

মজা দেখবার জন্যে গু লা হাডর জিজ্ঞেস করে:

'আর কত ক'রে দর আপনাকে বলেছিল ও?'

'দু'আনা! ভেবে দেখো, একেবারে ডবল! নেটিভগুলো জন্ম থেকে মিথ্যেবাদী!'

'ও-সব কথা ছেড়ে দাও, মা! বাবুবারা মাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে। এখনও পর্যন্ত নেটিভদের সম্বন্ধে তার কোন বিশেষ ধারণা বদ্ধমূল হবার সময়-সুযোগ পায় নি। মাত্র এক বছর হলো সে স্কুল থেকে বেরিয়েছে, এবং তার আগে জীবনের অধিকাংশ সময়টাই ইংলণ্ডে ডালউইচ শহরে তার এক আত্মীয়ার কাছেই কাটিয়েছে।

' 'লাই বক্স্ পুরনো লোক…বড় ভাল লোক, যাই বল! জানো, আজ সকালে আমাকে ওমলেট তৈরি করতে শিখিয়ে দিয়েছে! শেখাবার সময় ইংরেজীতে আমাকে কি বলেছিল জানো? তার ইংরেজী শুনে তো আমি হেসে আর বাঁচি না…"মিস্ সাহিব, আই কুক ইউ টু টিচ্ লেসন্!"* সত্যি বল, ভারি সুন্দর, না?'

বেগী হেসে ওঠে।

'চমৎকার! গত মাসে যখন কলকাতায় গিয়েছিলাম তখন থ্যাকারের বইএর দোকান থেকে একখানা মজার বই কিনেছিলাম "অনার্ড স্যার", কোন বাঙালী বাবুর লেখা…তাতে এইরকম দেশী ইংরেজীর নানান্ রকমের মজার মজার উদাহরণ আছে। এক-একটা যেন এক-একটা মুক্তো। তোমাকে পড়তে দেবো। পড়ে দেখো, কি ভয়ঙ্কর মজা!'

বেগীর কথা শেষ হতে না হতে ছ লা হাডর গম্ভীরভাবে বলে:

'ও-সব হলো শিক্ষার দোষ…যে কুৎসিত শিক্ষা তারা পায়, তারই ফল। তা না হলে ভারতবর্ষের লোকেরা ভাষা আয়ত্ত করবার ব্যাপারে [illegible] বলতেই হয়। দু'একটা গালাগাল ছাড়া ক'টা হিন্দুস্থানী কথা আমরা ঠিক ভাবে বলতে পারি বল তো?'

---

* কথাটার অর্থ দাঁড়ায়, মিস্ সাহেব, তোমাকে শিক্ষা দেবার জন্য তোমাকে রান্না ক'রে ফেলবো! আসলে বেচারা বলতে চেয়েছিল, মিস্ সাহিব তোমাকে আমি রান্না করতে শিখিয়ে দেবো।—অনুবাদক।

হঠাৎ তার মনে পড়ে যায়, যে জিনিসটা থেকে সে দূরে থাকতে চায়, সেই জিনিসটাই সে ক'রে ফেলতে চলেছে।

এইসব সমাজে কোন পক্ষই সে অবলম্বন করতে চায় না। কিন্তু শতচেষ্টা ক'রেও মাঝে মাঝে সে নিজেকে আর ধরে রাখতে পারে না। পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে সে বুঝেছে যে এই সব ক্ষেত্রে তর্ক ক'রে কোন সুফলই পাওয়া যায় না। অথচ এই ধরনের মূঢ় দম্ভ বিনা প্রতিবাদে সহ্য করাও অসম্ভব হয়ে ওঠে।

মিসেস্ ক্রক্‌টকুক্ বুঝতে পারেন, এই নিয়ে হয়ত একটা অস্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টি হবে। কোন অস্বস্তিকর অবস্থাই তিনি সহ্য করতে পারতেন না। তাই অভ্যাসবশত তাড়াতাড়ি কথাটাকে সহজ করবার জন্যে তিনি বলে উঠলেন: 'কিন্তু যাই বল জন্, নেটিভরা বড় কুঁড়ে। সেইজন্যেই আমাদের দেখা উচিত যাতে তারা নষ্ট হয়ে না যায়। তারা জন্ম থেকেই মিথ্যাবাদী··· চুরি করতে তাদের একটুও বাধে না। সেদিন দেখি একটি কুলি-মেয়ে বাগান থেকে চুপি চুপি একটা গোলাপ ছিঁড়ে নিচ্ছে···জুতো মেরে তাকে তাড়িয়ে দিই। বাংলোর পেছনে চার্লস্ সব্জীর বাগান করেছে, সেখানে প্রায়ই দেখি ব্যাটারা গরু-মোষ ছেড়ে দিয়েছে। বোঝ ব্যাপার! তাই যাতে তারা অধঃপাতে না যায়···'

এমন সময় ইলাহি বক্‌সকে ঘরে ঢুকতে দেখে তিনি থেমে গেলেন। বৃহৎ ট্রেতে 'হোয়াইট হর্স'-এর একটি বোতল, এক জগ্ গরম জল এবং দুটো গ্লাস। যথাস্থানে সেগুলো রেখে দিয়ে নিঃশব্দে ইলাহি বক্‌স্ চলে যায়। মিসেস্ ক্রক্‌টকুক্ তখন আবার বলতে আরম্ভ করেন:

'তুমি কি বলতে চাও জন্, যে এই 'লাই বক্‌স্ আর আমি···আমাদের মধ্যে কোন তফাত নেই? কলকাতায় ও-র ছেলে বুঝি আছে···তার সঙ্গে দেখা ক'রে আসার পর থেকেই দু'বেলা আমাকে বিরক্ত করছে, মাইনে বাড়িয়ে দেবার জন্যে। ছেলেটা বোধহয় কিছু লেখাপড়া শিখেছে। বোঝ ব্যাপারটা···আমাদেরই পয়সা নিয়ে যে-ছেলে লেখাপড়া শিখলো, সেই আবার

আমাদের পেছনে তার বাবাকে খেপিয়ে তুলেছে। তাই আজকাল একটু খাটলেই সে দেখায় যেন খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছে···সব সময়ই যেন তাকে খাটতে হচ্ছে···'

বেশী এবং নিজের গ্লাসে হুইস্কী ঢালতে ঢালতে চার্লস্ স্ত্রীর দিকে একবার কটাক্ষপাত করে। তার স্ত্রী সকলের সামনে নিজের স্বরূপ জাহির করছেন সেটা তার আদৌ ভাল লাগছিল না। অবশ্য এই ভাল-না-লাগার কারণ এ নয় যে, স্ত্রীর মনোগত ভাবের সঙ্গে তার কোন দ্বন্দ্ব আছে। কারণটা হলো, এমনভাবে সব সময় নিজের কথা এমনিধারা ভাবে জাহির করা ঠিক নয়। আজ দীর্ঘ কুড়ি বৎসর কাল ধরে সে ভারতবর্ষে আছে এবং ইংরেজ হিসাবে তার যে একটা স্বতন্ত্র গর্ব আছে, সে-সম্বন্ধে একতিলও বিচ্যুতি ঘটে নি। সেটা স্বাভাবিক বলেই সে ধরে নিয়েছে। সেই জন্য যে-সব ব্যাপার আলোচনা না করাই ভাল, তাই নিয়ে পাঁচ-কথা বলা সে আদৌ পছন্দ করে না। তাছাড়া, বেশী কথা বলাটাই তার স্বভাব-বিরুদ্ধ, এবং সে মনে করে সেটা সভ্যতা বিরুদ্ধও। সে বোঝে, যার যা কাজ সেইটুকু সে নিষ্ঠা সহকারে ক'রে যাক। তাই সে একটি সহজ সূত্র আবিষ্কার ক'রে নিয়েছিল, যে-কুলি রীতিমত পরিশ্রম করে তাকে পুরস্কার দাও···আর যে-কুলি ফাঁকি দেয়, গণ্ডগোলের সৃষ্টি করে, তাকে শাস্তি দাও। ঠিক এই এক নীতি তার গৃহ-শাসনেও সে প্রয়োগ করতো। আসল জিনিস হচ্ছে, কাজ, দক্ষতা। ইদানীং কংগ্রেস-ওয়ালাদের প্রচারের ফলে চা-বাগানে গণ্ডগোল দেখা দিয়েছে। কাগজ খুলে কলকাতার বিপ্লবীদের কোন কাণ্ডকারখানার কথা পড়লেই, তার মনের ভিতর কিসের যেন একটা আতঙ্ক জেগে উঠতো। অসংখ্য কালো কালো আদমীর মধ্যে সে যে একা একজন শাদা আদমী···এই বিচ্ছিন্নতার চেতনা যে তাকে আতঙ্কিত ক'রে তুলতো, তা বলা চলে না···তবুও কেমন যেন সে বিভ্রান্ত হয়ে পড়তো। তাই জনতার কাছ থেকে সর্বদাই সে দূরে থাকতো··· এবং ফলে লোকে তাকে বিশেষ সম্ভ্রমই

করতো। তবে, স্বজাতির বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির মতই সে বাইরে বেরুলেই ওয়েষ্ট-কোটের তলায় বিশেষভাবে তৈরী পাতলা ইস্পাতের একটা দেহাবরণ ব্যবহার করতো এবং পকেটে রিভলভার নিতে ভুলতো না। এইভাবে সে অনেকটা নিরুদ্বেগ হতে পেরেছিল।

কিন্তু মিসেস্ ক্রুক্‌টুক্‌কের কথার উত্তর দিতে বাবুবারার দেরি হয় না। উদ্ধত যৌবন আঘাত করতে এতটুকু কাতর হয় না। তাই ব্যঙ্গ করেই বলে :

'আমার কথা ছেড়ে দাও···এই গরমে তোমারও কি কম কষ্ট হয়?'

ছোঁয়াচে রোগের মত দুষ্টুমি করার প্রবৃত্তিও কতকটা ছোঁয়াচে। তাই বাবুবারার দেখাদেখি স্ত লা হাভরও গম্ভীরভাবে বিজ্ঞতার ভান দেখিয়ে বলতে শুরু করে : 'একজন ফরাসী বৈজ্ঞানিক ক্লান্তি দূর করার জন্যে এক ধরনের সিরাম আবিষ্কার করেছেন। কতকগুলো কুকুরকে সেই সিরাম ইন্‌জেক্ট ক'রে দেখা গিয়েছে যে, ক্রমান্বয়ে ষোলো ঘণ্টা ধরে তাদের জাঁতাকলে ঘুরিয়েও তারা বিশেষ ক্লান্ত হয় নি। তাই তিনি অনুমান করছেন যে, এই সিরামের সাহায্যে অনায়াসেই মানুষের জীবনে আরও দশটা বছর পুরে দিতে পারা যাবে এবং সেই দশটা বছর, ইনজেকসন-ওয়ালা কুকুরদের মত মানুষও দিনে ষোলো ঘণ্টা ক'রে অনায়াসে জাঁতাকলে ঘুরতে পারবে। এতটুকু ক্লান্তি বোধ করবে না। আমার মনে হয়, মিসেস্ ক্রুক্‌টুক্‌, আপনার স্বামী যদি সেই সিরাম কিছু আনিয়ে নিতে পারেন, খুব ভাল হয়। সকলেই ব্যবহার ক'রে উপকার পেতে পারে, বিশেষ ক'রে আপনাদের চা-বাগানের কুলিরা।'

কথাটা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে আগ্রহের আতিশয্যে সে ঘাড় ফিরিয়ে চারিদিকে চেয়ে দেখে, তার কথা কে কিভাবে নিল। কিন্তু হতাশ হয়ে দেখে, কারুর মুখে কোন কথা নেই। সে বুঝতে পারে, তার এই বক্রোক্তিতে সকলেই অল্প-বিস্তর অস্বস্তি বোধ করছে।

কয়েক মুহূর্তের সেই অস্বস্তিকর নীরবতার পর ক্রুক্‌টুক্‌ নিজেকে আর চেপে রাখতে না পেরে বলে উঠলো : 'তুমি এবং তোমার এইসব কুলিদের

সেন্ত্রালের সামনে দাঁড় করিয়ে কুকুরের মত গুলি ক'রে মেরে ফেলা উচিত।'
সঙ্গে সঙ্গেই নিজের এই উষ্মা ঢাকবার জন্যে অট্টহাস্য ক'রে উঠলো।

মিসেস্ ক্রফ্‌টকুক্ ব্যাপারটা কিছু বুঝতে না পেরে হাঁ-হাঁ ক'রে উঠলেন : 'চার্লস্! দোহাই তোমার, চার্লস্! ও নিয়ে অকারণে আর মাথা ঘামিয়ো না।'

ড্য লা হাভরের কথার মধ্যে যে তীব্র শ্লেষ ছিল, তা বোঝবার মত মানসিক অভিজ্ঞতা অবশ্য মিসেস্ ক্রফ্‌টকুকের ছিল না।

আবার সেই অস্বস্তিকর নীরবতা। চেয়ারে বসে থাকতে থাকতে চার্লসের গালের রঙ ক্রমশ ফিকে গোলাপী থেকে টক্‌টকে লাল হয়ে উঠতে থাকে। নিঃশ্বাস নাক দিয়ে না পড়ে, মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়···রেগী আপনার মনে এক চুমুক হুইস্কী গলাধঃকরণ ক'রে ফেলে। মিসেস্ ক্রফ্‌টকুক্ ব্যাপারটা কি হচ্ছে, তা ঠিক বুঝতে না পেরে ফ্যালফ্যাল ক'রে প্রত্যেকের মুখের ওপর নজর বুলিয়ে যান। বার্‌বারা ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে দেখে···

কথাবার্তার ধারাটা বদলাবার জন্য বার্‌বারা ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করে : 'তোমার ল্যাবরেটরীর কথা বল···নতুন কিছু গবেষণার ফল··?'

হঠাৎ উত্তর দিতে গিয়ে ড্য লা হাভর অতিরিক্ত জোরেই বলে ফেলে : 'না।'

সে বুঝতে পারে আজ অপরাহ্ণের এই পোষাকী আনন্দের ঢেউ-এ দুলতে গিয়ে সে ক্রফ্‌টকুককে অনিচ্ছাসত্ত্বেও আঘাত ক'রে ফেলেছে। বার বার সে দেখেছে, এই সব চা-পার্টিতে, সৌখীন মজলিসে সত্যিকারের স্বাভাবিকভাবে, কথাবার্তা বলা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। এই সব মজলিসে মানুষ অতি সন্তর্পণে শুধু বাইরের ভদ্রতা বজায় রাখার জন্যে সুশিক্ষিত এবং সুমার্জিত প্রবঞ্চনা দ্বারা অন্তরের সত্যিকারের সব ভাবনা ঢেকে রাখবারই চেষ্টা করে। ভদ্রতার পালিশের আড়ালে মনের সত্য কথাকে লুকিয়ে রাখাই হলো এই সব মজলিসের কথাবার্তার আসল রূপ। এই মজলিসী ভদ্রতা শহরে তবু খানিকটা শিথিল দেখা যায়, কিন্তু এই দূর আসামে, শুধু সম-পন্থী গুটিকতক স্বার্থান্বেষী বণিকদের সমাজে তার এতটুকু ব্যতিক্রম হবার উপায় নেই।

কারণ, এরা সবাই হলো হঠাৎ মাথা-গরমের দল···নিজের নিজের ব্যবসার স্বার্থ ছাড়া আর কিছু জানে না। ইংলণ্ডে, তাদের নিজেদের দেশে, তাদের যতটুকু শক্তি-সামর্থ্য, তাতে বড় জোর তারা এক-একজন অর্থশালী মুদী বা দোকানদার হতে পারতো। এই সমাজের মধ্যে যারা বয়সে তরুণ, তারা তাদের নিজের দেশে, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর 'বয়াটে' ছেলে, সাধারণত তাদের বাপ-মা উত্যক্ত এবং বিরক্ত হয়েই তাদের অষ্ট্রেলিয়ায় চাষবাস ক'রে খেটে খাবার জন্যে পাঠিয়ে দেয়। আজকাল ভারতবর্ষে এই চা-বাগানের বিরাট ব্যবসার সুযোগ নিয়ে, তারা এখানেই চালান হয়ে আসে·· কারণ, এরকম অর্থকরী সুযোগ জগতে আর কোথায়ও পাওয়া যাবে না। স্বদেশে দ্য লা হাভরকে নিয়ে ছেলেবয়সে তার মাকে অনেক অসুবিধাই ভোগ করতে হয়েছে...তবে মার একমাত্র ছেলে বলে দুরন্ত হলেও মার আদরের এতটুকু কমতি ঘটে নি। এই ধরনের সব মজলিসে যে-সব কথাবার্তা বা ন্যাকামি দেখা দিত, দ্য লা হাভর তা সহ্য করতে পারত না। ভদ্রতা ভুলে নিজেকে জাহির করবার চেষ্টাই প্রবল হয়ে উঠতো। তবে ক্রমশ ধাক্কা খেতে খেতে সে শিখেছিল, সব সময়ে মনের কথা স্পষ্ট খুলে না বলে, তার বদলে বুদ্ধি খাটিয়ে যদি গোপন শ্লেষ চালানো যায়, তাহলে অনেক বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়। কিন্তু এই চা-বাগানের বিলিতী সমাজে জল-ছাড়া মাছের মত সে হাঁফিয়ে উঠতো। বারবারার প্রশংসা এবং বড় সাহেবের বিরক্তি ছাড়া তার পাণ্ডিত্য এবং কেতাবী শ্লেষ সবটাই মাঠে মারা যেতো।

কথাবার্তা ঝিমিয়ে আসছে দেখে, বারবারা ডাক্তারকে চেপে ধরে। পূর্ব জিজ্ঞাসার সূত্র ধরে জিজ্ঞেস করে : 'কেন না?'

ডাক্তার বলে : 'সবে মাত্র একটি যে মাইক্রোস্কোপ আমার আছে, আমারই কপালের ঘামে তাতে জং ধরে গিয়েছে···আর তাতে মাত্র একখানি লেন্‌স্‌, তাও আবার প্রতিমুহূর্তের এই উদগ্র দৃষ্টির ভর সইতে না পেরে ফেটে গিয়েছে। জার্মানী থেকে আর-একটা যন্ত্রের অর্ডার দিতে হবে, নইলে কাজ আর চলবে না।'

জার্মানীর কথা শুনে মিসেস্ ক্রফ্‌টকুক্ বলে ওঠেন : 'জার্মানী থেকে কেন? হোম থেকে আনালেই তো হয়?'

দ্য লা হাডর আর নিজেকে সংযত রাখতে পারে না। অবিবেচকের মত সোজা বলে ওঠে : 'বৃটেনের তৈরী হলেই যে সবচেয়ে ভাল হবে এমন তো কোন কথা নেই!'

স্বজাতির এই নিন্দাবাদ সোজা ক্রফ্‌টকুকের অন্তরে গিয়ে বিঁধলো এবং এবার বিরক্ত হয়েই সে ডাক্তারের দিক্ থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিল। হয়ত সেই মুহূর্তেই যে কোন একটা অছিলা ক'রে সে উঠেও যেতো কিন্তু হাতের গ্লাস তখনও আধাআধি ভর্তি রয়েছে। ক্রফ্‌টকুকের দিকে চিবুক তুলে বেশী জিভ দিয়ে একরকম অদ্ভুত আওয়াজ ক'রে উঠলো এবং 'বসে'র সঙ্গে তার মনের গোপন একটা মিতালি ছিল বলেই সে 'বসে'র দিকে চেয়ে নিজের রাগ ছিপি দিয়েই রেখে দিল। মিসেস্ ক্রফ্‌টকুক রাগ দমন করতে না পেরে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন এবং ইলাহি বক্সকে টেবিল পরিষ্কার ক'রে নিয়ে যাবার জন্যে ডাক্তার উদ্দেশ্যে অনাবশ্যক জোরেই দড়িতে টান দিলেন। বাবুবারা মাথা হেঁট ক'রে বসে ভাবে কি ক'রে দ্য লা হাডরকে থামানো যায়, যাতে সে আবার একটা কিছু বলে তার বাবার মেজাজ না একেবারে বিগড়ে দেয়। কারণ, সে জানতো, দ্য লা হাডরের ওপরে তাদের সমস্ত রাগের ধাক্কা শেষকালে তারই ওপর এসে পড়বে।

ডাক্তার বুঝলো তার কথায় কাজ হয়েছে···অবস্থা বেশ থমথমে হয়ে উঠেছে···তাই সে আরও একটা তীক্ষ্ণতর বাণ ছোঁড়বার জন্যে মনে মনে কসরত করে। খুব উঁচুদরের না হলেও, সে ঠিক ক'রে নেয় সে এবার বলবে, বাবুবারা পছন্দ করে ফরাসী মাল···আর আমি পছন্দ করি জার্মানীর তৈরী··· কিন্তু এতটা খোলাখুলি রসিকতা ঠিক হবে না বুঝতে পারে। তাই পূর্ব-উক্তির সমর্থন স্বরূপ একটা যুক্তি উত্থাপন করে :

'অণুবীক্ষণ যন্ত্র তৈরি করার ব্যাপারে টিউটন জাতের লোকেরা স্বভাবতই দক্ষ···কারণ জীবাণুদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তারাই সব চেয়ে বেশী সচেতন।'

কিন্তু এই ব্যাখ্যা কারুরই মনঃপূত হলো না। যদি নিরীহ আর কোন একটা উক্তি দিয়ে এই অস্বস্তিকর নীরবতাকে ভরাট করা যায়, তার জন্যে সে আলাদা হয়ে মনে মনে ভাবতে শুরু করে। কিন্তু কারুকে আঘাত করবে না অথচ সকলের ভাল লাগবে এমন কিছুই মনে পড়ে না। তাই তাড়াতাড়ি যা কিছু একটা বলবার তাগিদে সে তার কেতাবী-বক্তৃতা শুরু ক'রে দেয়:

'সেদিন একজন বৈজ্ঞানিক একটা ভারি দামী কথা বলেছেন, মানুষ এখনও পর্যন্ত এই জীব-জগতে সংগ্রাম ক'রে জয়ী হতে পারে নি। এখনও পুরোদমে এই সংগ্রাম চলেছে এবং তাতে যদি মানুষ হেরে যায়, তাহলে অতীত যুগের অতিকায় সব জীবজন্তুদের মতনই তাকেও এই পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে সরে যেতে হবে। এবং এই জীবন-মরণ সংগ্রামে তার সব চেয়ে শত্রু হলো ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবাণুর দল। হেরে গেলে মানুষকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে হবে, জিতলে নতুনতর সভ্যতার এক নতুন জাতের মানুষের আবির্ভাবকে সে এগিয়ে আনবে।'

আবার সেই নীরবতা।

রেগীর ঠোঁটের ডগায় প্রায় এসে গিয়েছিল, এই সব পচা অখাদ্য জিনিস শুনতে শুনতে প্রায় খেপে উঠেছি...কিন্তু বহু কষ্টে আত্মসংবরণ ক'রে নিয়ে বলে: 'এক হাতশ্টেনিস্ হবে নাকি?'

'এই অসহ্য গরমে?' বাধা দেন মিসেস্ ক্রক্‌টুক্।

বার্বারাও বলে ওঠে: 'তা ছাড়া টেনিস কোর্টে বোধহয় এখনও জল আছে।'

রেগী ক্ষুণ্ণ হয়ে উঠে পড়ে। বলে: 'তাহলে চললুম, নতুন কুলিগুলো এসেছে তাদের তদারক করতে হবে···চেরিও!'

হঠাৎ যে রেগী হাণ্ট এইভাবে বিদায় নিয়ে যাবে, তার জন্যে মিসেস্ ক্রক্‌টুক্ আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না। তবুও রেগী উঠে পড়েছে দেখে তাকে

বিদায়-সম্ভাষণ জানাতেই হয়। ক্রুক্‌টুকুক্ সেইসঙ্গে একটু কাজের ভার দিয়ে দেয়: 'যাবার সময় তাহলে গুদামটা একবার ঘুরে যেয়ো…মাল-গুলো গুদাম থেকে বেরিয়েছে কি না দেখো…'

যেতে যেতে রেগী শুনতে পায় 'বস্' বলছেন, খাসা ছেলে রেগী।

এই সূত্রে স্তু লা হাভর নতুন কুলিদের কথা নিয়েই আলোচনা তোলে:

'ভাল কথা, নতুন কুলিদের কথা যখন উঠলো, তখন বলতে পারেন, নতুন পাতকুয়ো তৈরি করানো সম্বন্ধে আমি যে স্কীম দিয়েছিলাম তার কি হলো?'

আবার সেই নীরবতা। ক্রমশ দীর্ঘতর হতে থাকে। স্তু লা হাভর নতুন ক'রে বুঝতে পারে গত বছর ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিসের সরকারী চাকরিতে ইস্তফা দেবার পর থেকে বড় সাহেবদের সঙ্গে তার মানসিক বিচ্ছেদ ক্রমশই গভীরতর হয়ে উঠছে। এবং সেইসঙ্গে চা-বাগানের মালিকদের মতিগতির বিরুদ্ধে নিজেকে জাহির করতে গিয়ে সে ক্রমশই ভেতর থেকে অনমনীয় এবং কঠোর হয়ে উঠছে।

যখন এই প্ল্যান স্তু লা হাভর ক্রুক্‌টুকুকের সামনে উপস্থিত করেছিল তখন সে-ই উৎসাহ সহকারে সমর্থন জানিয়েছিল। তাই আজ দীর্ঘ দিন পরে সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে ক্রুক্‌টুকুক্ খানিকটা অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। ম্লান হেসে ধীরে কিন্তু স্পষ্টভাবেই সে জানিয়ে দেয়:

'আমার মনে হচ্ছে, ওপর-ওয়ালারা সে-প্ল্যান অনুমোদন করবে না।'

স্তু লা হাভরের মুখ দিয়ে শুধু একটা অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে আসে: 'ওঃ!'

হঠাৎ যেন তার মুখের রঙ ফ্যাকাশে হয়ে আসে।

কয়েক মুহূর্তের জন্যে রাগে সে মূক হয়ে যায়। কিন্তু নিজের মনে ভাবতে গিয়ে দেখে, আজ সারা অপরাহ্ণ সে ক্রুক্‌টুকুক্‌কে যথেষ্ট খেপিয়েছে; বড় সাহেব হিসাবে যতই কেন তার দোষ থাকুক না, একমাত্র সে-ই তাকে উৎসাহ দিয়েছে, তার পরিকল্পনাকে সমর্থন ক'রে উপরওয়ালাদের কাছে

পাঠিয়েছে, হয়ত আজ এই মুহূর্তে কোম্পানীর পরিচালকদের সেই প্রত্যাখ্যানের সংবাদ তাকে জানাতে সে-ও আন্তরিকভাবে ক্ষুণ্ণ হয়েছে। তাই নিজের অসহিষ্ণু উষ্মাকে দমন ক'রে নিয়ে, ম্লান কণ্ঠে জানায় :

'শুনে দুঃখিতই হলাম্…পরিকল্পনাটার পেছনে আমাকে রীতিমত পরিশ্রম করতে হয়েছিল…কোম্পানী যদি বুঝতো, এই সব পাতকুয়ো, যা থেকে কুলিরা জল নিচ্ছে, সেগুলো কতখানি বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে…'

সহানুভূতিসূচক মুখভঙ্গী ক'রে ক্রফ্‌টকুক বলে : 'ব্যাপার কি জান, কোম্পানী হয়ত ভাবছে, অবস্থা যদি ক্রমশ খারাপ হতেই চলে, তাহলে বেশীদিন আর আমাদের এখানে থাকতে হবে না। তা ছাড়া বাজার-মন্দার দরুন আমাদের ব্যবসাও রীতিমত ঘা খেয়েছে। সে-ক্ষেত্রে রয়েল কমিশনে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে উগ্রপন্থীরা যে সব ব্যবস্থার কথা বিধান দিয়েছেন, তা যদি আমাদের কাজে পরিণত করতে হয়, তাহলে ব্যবসাপত্র গুটিয়ে ফেলতে হয়। তা ছাড়া, তুমিও জান, আমিও জানি.. এই সব কুলি…ঠিক মানুষের স্তরে তো এদের ধরা যায় না…তার একধাপ নীচে এরা আছে...স্বাস্থ্যনীতির বালাই এদের নেই…ওসব এরা বোঝেও না…

স্তু লা হাভর স্থির দৃষ্টিতে ক্রফ্‌টকুকের দিকে চেয়ে থাকে। ক্রফ্‌টকুক তা বুঝতে পেরে অস্বস্তি অনুভব করে। তাই নিজেকে ব্যাখ্যা করার জন্তে আরও বিস্তার ক'রে বলে : 'অবশ্য আমি যা বললাম, তার প্রমাণ যদি চাও, দিতে পারি। এই ধর না একটা কথা, আমি যেদিন থেকে এখানে এসেছি, একদিনের জন্তও দেখি নি যে কোন কুলি তার ছেলেমেয়েকে মানুষ করবার জন্তে কোন বিশেষ চেষ্টা কখনো করেছে। তার জন্তে তাদের মধ্যে শিশু-মৃত্যুর সংখ্যাও খুব ভয়াবহ। কিন্তু তবুও ছেলে-মেয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে জন্মাচ্ছে। এখানকার কথা বাদ দাও, ওদের নিজের দেশে মাটি চষে ওদের রোজগার করতে হয়, এবং সেখানে ওরা গড়পড়তা সারাদিনে মাত্র তিন ফার্দিং পায়। তার ওপর আছে দুর্ভিক্ষ…তখন তো রোজগার মোটেই

থাকে না। সুতরাং তুলনা ক'রে দেখলে, এখানে তারা যে খারাপ আছে, সে-কথা তুমি কিছুতেই বলতে পার না। এখানে কপর্দক শূন্য ওরা আসে··· দশগুণ রোজগার বেশী করে···এবং কেউ কেউ ইচ্ছা করলে দেশে ফিরে গিয়ে জমিজমা কিনে নিজেরাই আবার জমিদার বা মহাজন হয়ে বসতে পারে।'

স্থির দৃষ্টিতে বড় সাহেবের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে ড লা হাভর্‌ ভাবে, লোকটা যা বলছে, সত্যিই কি সে তা বিশ্বাস করে? তার কণ্ঠস্বর শুনে মনে হয়, সে-সম্বন্ধে সন্দেহ করবার কিছু নেই।

এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সমাজের বিশ্বাস যে ভারতবর্ষে ভারতবাসীদের সম্পর্কে বৃটিশ মহানুভবতাই দেখিয়ে আসছে, এই ধারণার বিরুদ্ধে ড লা হাভর যেদিন থেকে এই চা-বাগানে এসে পা দিয়েছে, সেইদিন থেকেই প্রতিবাদ তুলেছে। প্রথম প্রথম সেই প্রতিবাদের মধ্যে ছিল, জনতা থেকে স্বতন্ত্র হবার একটা মানসিক দম্ভ। কিন্তু ক্রমশ সে উপলব্ধি করলো তার মধ্যে ভাব-প্রবণ যে রোমাণ্টিক মানুষটি রয়েছে, বাস্তব ক্ষেত্রে জীবনের রূঢ় সংগ্রামে তাকে যাচাই ক'রে নিতে হবে অন্তর থেকে উপলব্ধি করতে হবে যে প্রত্যেক ভারতবাসী তারই মত একজন মানুষ···এবং মানুষ হিসাবে তাদের সম্পূর্ণ অধিকার আছে নিজেদের দেশ নিজেদের শাসন করবার···নিজেদের মধ্যে জাতি, ধর্ম ও শ্রেণীর শত অধিকার নিজেদের হাতে পূর্ণ ক'রে আত্ম-প্রতিষ্ঠা লাভ করবার। তারই প্রেরণায় সে বুক ঠুকে একদিন হঠাৎ ইম্পিরিয়াল মেডিক্যাল সার্ভিসের সরকারী উচ্চপদ স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে।" এবং তাই আজ ক্রুক্‌ট্রুকের বিচার-বিতর্ক অসম্ভব উদ্ভট বলে তার মনে এসে লাগে। অসহিষ্ণু তীব্রতায় মনে হলো সে প্রতিবাদ ক'রে ওঠে! কিন্তু বহু কষ্টে আত্মসংবরণ করে নিয়ে সংযত কণ্ঠেই আপস-নিষ্পত্তি করার ভঙ্গীতে বলে উঠলো: 'মিঃ ক্রুক্‌ট্রুক, কোম্পানীর চিন্তাধারা যে আমি ঠিক অনুসরণ করতে পারলুম, তা নয়···তার জন্যে অবশ্য আমি দুঃখিত এবং হয়ত আপনি ভাবছেন যে আমি একজন বিশ্বপ্রেমিক এবং সেইজন্যেই আমার কথাবার্তা হেঁয়ালির

যত অস্পষ্ট। কিন্তু ভুলে যাবেন না, আমি একজন ডাক্তার এবং ডাক্তারের দিক্ থেকেই সমস্যাগুলোকে আমি দেখেছি। আমি জানি সেই পাতকুয়োর জলে যে-সব জীবাণু বংশবৃদ্ধি করছে, তাদের একটি বংশতেই পাড়াকে পাড়া কুলিদের উজাড় ক'রে ফেলতে পারে। এবং এই কথা জানি বলেই আমার বিবেকে এত লাগে। আমি জানি, তারা যে জল ব্যবহার করছে, সে-জল দূষিত এবং তা জেনেও, যদি তার প্রতিবিধানের ব্যবস্থা না করি, তাহলে ডাক্তার হিসাবে আমি একজন ক্রিমিন্যাল। আর কোম্পানী যেখানে লক্ষ লক্ষ পাউণ্ড তাদেরই পরিশ্রম থেকে তহবিলে ভরছে, সেখানে মাছি আর মশার হাত থেকে তাদের রক্ষা করতে যদি এক-আধ লাখ টাকা খরচই হয় সেটা কি কোম্পানীর পক্ষে খুব লোকসানের হবে?'

আর কোনমতেই গায়ের জ্বালা সহ্য করা সম্ভব নয় দেখে ক্রফ্‌টকুক্ চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ায় এবং বিদায় জানাবার জন্যে ডাক্তারের দিকে হস্ত প্রসারণ ক'রে বলে ওঠে: 'বেশ, ডিরেক্টারদের কাছে আবার না হয় একবার চিঠি পাঠিয়ে দেবো—তাতে আমার যতটুকু সাধ্য আমি তা নিশ্চয়ই করবো...'

ক্লু লা হাভরও উঠে দাঁড়ায়।

'তা যদি করেন সত্যিই ধন্যবাদের কাজ করবেন...বিশ্বাস করুন, আমি...'

কিন্তু বলতে গিয়ে আর সে বলে উঠতে পারলো না...তার অন্তর থেকে যেন কিসের বাধা এসে তাকে মাঝপথে থামিয়ে দিল। সে জানতো, এ অরণ্যে বৃথাই রোদন।

তাড়াতাড়ি ক্রফ্‌টকুক্ ভদ্রতা দেখিয়ে তার নিজের অপূর্ণতাকে ঢেকে নেবার চেষ্টা করে: 'হাঁ...হাঁ...আমি বুঝেছি, বলছি তো, যা করবার আমি তা করবোই!'

যাবার জন্যে পায়ের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে ক্লু লা হাভর বারান্দার দিকে ফিরে চায়। ক্রফ্‌টকুক্ যে-কথা বুঝতে পারলো না, সে-কথা অন্য কোন উপায়ে কি বোঝানো যায় না?

শুধু যে ক্লক্ টুকুই তাকে বুঝতে পারলো না, তা নয়। ভারতবর্ষে প্রায় প্রত্যেক ইংরেজই বিশ্বাস করে যে ভারতবাসী নিজেরা নিজেদের পরিচালন করতে অক্ষম…। প্রত্যেকের মানসিক গঠন অনুযায়ী এই বিশ্বাসের মাত্রা কিছু কম আর বেশী। এই বিরাট দলের মধ্যে,, প্রত্যেক দলেই দু'একজন ব্যতিরেক থাকে, তেমনি তার মতন হয়ত দু'একজন ইংরেজ আছে, যারা স্বজাতির কাছে দুর্জ্ঞেয় এবং এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সমাজে তাদের কোন স্থান নেই। মনে পড়ে যায় টুইটির কথা চা-বাগানের এই উপনিবেশের মধ্যে একজন সত্যিকারের বুদ্ধিমান লোক…কিন্তু তারও ধারণা যে স্ত লা হাডর বড় বাড়াবাড়ি করে। টুইটি স্বভাবতই খুব মৌন প্রকৃতির এবং স্ত লা হাডরের কথা সে ধৈর্য সহকারে কোন বাধা সৃষ্টি না ক'রেই শোনে। কিন্তু মাঝে মাঝে তার মুখের ভেতর থেকে এক ধরনের একটা অস্পষ্ট আওয়াজ বেরুতো এবং মুখ থেকে পাইপ সরিয়ে নিয়ে টেবিলে ঠুকতে ঠুকতে মৃদু হাসতো, সেই স্বল্প ইঙ্গিত থেকে স্ত লা হাডর তার মনের কথা স্পষ্টই বুঝতে পারতো। একদিন সন্ধ্যাবেলা ক্লাবে তার মনের কথা সে বলেও ফেলেছিল, সে বলেছিল একথা তোমাকে স্বীকার করতেই হবে যে এখানে কুলিদের অপেক্ষাকৃত ভালভাবেই রাখা হয়। অনেক সুবিধা তারা পায়। তাদের ধর্ম-কর্ম বা আচার-অনুষ্ঠানে আমরা কোনই বাধা দিই না। অন্নের সংস্থানের সঙ্গে সঙ্গে থাকবার জায়গাও আমাদের কাছ থেকে তারা পায়। দিব্বি গরু-ছাগল মুর্গী পোষে। আর তা ছাড়া, তাদের চাল-চলন খুব সাদাসিধে, সেখানে কোন বিশেষ হাঙ্গামাই নেই। সুতরাং তারা যে অসুখী একথা ভাববার কোন হেতুই নেই। ছোট্ট তাদের মন, কথার পুঁজিও গোনাগুনতি। বিশেষ কোন ভাবনা বা চিন্তার বালাই সেখানে নেই। হয়ত তারা দুঃখী সে-কথা কেউই অস্বীকার করবে না, কিন্তু আমরা যে-দিক থেকে মনে করি যে তাদের জীবনের অভাব ঘটছে বা ঘটতে পারে, তাদের সে ধারণাই

নেই। সে-অনুভূতিই তাদের নেই, সুতরাং সে-দুঃখ-বোধও তাদের নেই, একথা ভুলে গেলে চলবে না...

একটানা এতখানি বলে ফেলে আবার সে তার খোলসে ঢুকে পড়ে...হাতের কৌটোটা সামনে থাকা সত্ত্বেও খুঁজবার জন্যে হাতড়ে বেড়ায়।

সেই ঘটনা এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে টুইটির সেই মন্তব্য, তার মনের মধ্যে হঠাৎ বিদ্যুতের মতন চমকে ওঠে। কয়েক মুহূর্তের জন্যে তার মনে হয় যেন সেই আলোকে সব রহস্যের সমাধান-সূত্র সে খুঁজে পেয়েছে। আবার কিছুক্ষণ পরে সন্দেহ জাগে...সত্যিই কি সে সব জিনিসটাই বাড়াবাড়ি ক'রে দেখছে? বাইরে যাবার জন্য সে পা বাড়ায়।

'গুডবাই মিসেস্ ক্রফ্‌টকুক্...গুড্ বাই...'

ড না হাভর চলতে শুরু করে।

যখন তাদের মধ্যে বচসা শুরু হয়ে গিয়েছিল, মিসেস্ ক্রফ্‌টকুক্ তখন বেগতিক দেখে টেবিল থেকে মারগারেট পিয়ারসনের লেখা "সাহারা মরুতে প্রেম" নভেলখানি তুলে নিয়ে, সকালবেলা যেখানে পড়া বন্ধ ক'রে রেখেছিলেন সেখান থেকে আবার পড়তে শুরু ক'রে দিয়েছিলেন। ড না হাভরের বিদায় সম্ভাষণে নভেল থেকে মুখ তুলে প্রত্যভিবাদন জানান: 'গুডবাই জন্!'

বারবারা মাঝখানে ঘর থেকে সরে গিয়েছিল। হঠাৎ ঘরে ঢুকে ডাক্তারকে চলে যেতে দেখে ব'লে ওঠে: 'একটু দাঁড়াও জন্! আমিও একটু বেড়াতে বেরুবো!'

মিসেস্ ক্রফ্‌টকুক্ কন্যার সেই অভিলাষ শুনে বাধা দিতে চেষ্টা করেন:

'সে কি! তুই তো এখন ঘোড়ায় চড়ে বেরুবি বলে আমি সইসকে খবর পাঠিয়েছি, ঘোড়া ঠিক ক'রে রাখতে...আগে থাকতে খবর না দিলে তো সইসকে পাবার জো নেই...কুঁড়ের বাদশা সব...'

কিন্তু সে-কথায় কর্ণপাত না ক'রে বারবারা বেরিয়ে পড়ে:

'আমি এই এক্ষুনি ফিরে আসছি মা!'

মিসেস্ ক্রফ্‌টকুকের চোখের সামনে ডাক্তার আর বারবারা বেরিয়ে পড়ে।

, মেয়ের জীবনকে তদারক ক'রে বেড়িয়ে সময় নষ্ট করবার এতটুকু সদিচ্ছ রুক টুকুকের কখনো ছিল না। বড় জোর মাঝে মধ্যে অস্ফুট প্রতিবাদ দু'একটা করে, এই পর্যন্ত। তাই পত্নীর মন্তব্যের ইঙ্গিতে কন্যাকে বাইরে যেতে বারণ করবার কোন চেষ্টাই তার মধ্যে দেখা গেল না। বোতল থেকে পাত্রে একটা কড়া পেগ ঢেলে নিয়ে নিঃশেষিত ক'রে, বারাণ্ডার ধারে তার টেবিলে গিয়ে বসলো। কাজের সুবিধার জন্যে বাড়ীতে একটা ছোটখাটো অফিস সে ক'রে নিয়েছিল। পাকা ব্যবসাদার সে, তার ওপর মাথায় তখন বেশ খানিকটা হুইস্কী গিয়ে প্রবেশ করেছে, সুতরাং টাকা-আনা-পাই-এর হিসাবের মধ্যে মেয়ের চিন্তা, ডু না হাভরের কলেরা-প্রতিষেধক পরিকল্পনা, সব কোথায় তলিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

॥ তিন ॥

কুলি-ধাওড়ায় সারি সারি ইটের কুঠি-ঘরের করগেটের টিনের ছাদের উপর অপরাহ্ণের ম্লান সূর্যকর এসে পড়েছে। সজনীর মন অজানা স্পন্দনে উল্লসিত হয়ে ওঠে। লাইনের একধারে, উপত্যকা-ভূমির প্রান্তে, বুটা যখন তাদের নিয়ে গিয়ে একটা কুঠিতে গিয়ে উঠলো, সজনী আনন্দে আর চুপ ক'রে থাকতে পারলো না। বলে উঠলো: 'এ দেখছি, আমাদের গাঁয়ের উকীল বাবুর বাড়ীর মতন! কি সুন্দর!'

গঙ্গু অবশ্য ঠিক ততখানি উল্লসিত হতে পারলো না। তাদের গাঁয়ে নিজের হাতে সে তাদের মাটির ঘর তুলেছে, সে জানে, আমাদের দেশের জল-হাওয়ায় আমাদের ঘর-বাড়ী কি রকম হওয়া উচিত। তাই তার মনে হলো, এই সব ছোট ছোট টিনের বাক্সে বাস করা খুব আনন্দদায়ক হবে না, গ্রীষ্মে গরমে পুড়ে যেতে হবে, বেশী ঠাণ্ডায় হিম হয়ে যেতে হবে। বাপ রূপ

দেখে প্রতারিত হবার বয়স তার চলে গিয়েছে। তাই সারি সারি সেই কুঠিগুলো, বাইরে থেকে দেখতে যতই সুন্দর কেন মনে হোক না, তাতে বাস করা ততখানি সুখকর হবে না, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহই তার থাকে না।

সুঁটা কিন্তু বুক ফুলিয়ে বলে : 'কি, কোনদিন স্বপ্নেও ভেবেছিলে, এই রকম পাকা কুঠিতে বাস করতে পারবে? আমরা গেঁয়ো লোক, আমাদের কোন জ্ঞানগম্যি নেই…দেখতো, গরীবদের জন্যেও ইংরেজরা কেমন কায়দা ক'রে সুন্দর বাড়ী তৈরি করতে পারে!'

সজনীকে সঙ্গে ক'রে গঙ্গু ঘরের ভেতর ঢুকে বুঝলো, তার সন্দেহ মিথ্যা নয়। তাদের ঘরের গা ঘেঁষে আর একখানা আলাদা ঘর উঠেছে…কোথাও এতটুকু জায়গা ফাঁক নেই…পাশাপাশি ঠেসাঠেসি। ঘরের ভেতরও হাত পা নাড়বার জায়গা নেই। টিনের ছাদ রোদে পুড়ে সমস্ত ঘরটাকে একটা জলন্ত উনুনের মত গরম ক'রে রেখেছে। ঘরের ভেতর ঢুকে তার মনে হলো চারদিক থেকে ইঁটের শক্ত দেয়ালগুলো যেন ঘাড়ের ওপর চেপে আসছে… গাঁয়ের নরম মাটির ঘরে এ-রকমভাবে চারদিক্ থেকে চেপে ধরে না তো! ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে তার মনে হলো সে যেন মানুষ নয়…যেন এই ঘরের আর একটা খুঁটি…এই ইঁট আর অন্ধকারের শামিল। দুর্বল ভীরু মনকে বিজ্ঞের মতন সে বোঝাতে চেষ্টা করে, একদিন সব সয়ে যাবে।

সজনী কিন্তু তখন মনে মনে ঠিক ক'রে নেয়, কোথায় কিভাবে তার গেরস্থালী পাতবে।

'উনুনটা এইখানে করবো…আর এই কোণে জলের কলসী থাকবে…' সঙ্গে সঙ্গে তার উৎসাহ বাড়তে থাকে।

'এই লীলা, বুদ্ধু, গোটা কতক ইঁট আর খানিকটা মাটি নিয়ে আয় তো!'

গঙ্গু বাধা দেয় :

'বলি ও লীলার মা, অত ব্যস্ত হয়ো না…ধৈর্য ধর…এই তো এসে দাঁড়ালে…একটু বিশ্রাম কর…তারপর উনুন-টুনুন সব করা যাবে। তুমি ঐ

কোণে জলের কলসী রাখবে কিন্তু তাতো হবে না—ও কোণটা শোয়া জন্যে রাখতে হবে···বুঝলে? এখনথাক্, পরে পঞ্চাতে সব দেখবো কোথ কি করা যায়!'

তাহিত সম্মতি জানায় বুটা:

'হাঁ, হাঁ, এখন একটু জিরিয়ে নাও। আমাকেও এখুনি যেতে হবে তবে তোমাদের পাশের কুঠির নারাণকে ডেকে দিয়ে যাচ্ছি···সেই তোমাদের পড়শী হবে!'

এই বলে সে তারস্বরে নারাণকে হাঁক দিল। টিনের ছাদে সে ধ্ব প্রতিহত হয়ে ফিরে এলো।

বাইরে থেকে একটি বৃদ্ধের প্রত্যুত্তর শোনা গেল: 'এই যে···সর্দারজী

বুটা যাবার সময় তাদের আশ্বাস দিয়ে যায় 'আচ্ছা তাহলে আমি এখ যাই, কেমন? আমি চৌকিদারকে বলে দেবো ধন তোমাদের দেখাশো যাতে করে···বস্তির কারুর কিছু চুরি না যায়, তার জন্যেই তাকে রা হয়েছে। নারাণের কাছেই সব জানতে পারবে। এখন আমি চলি···ওখা আমার বাড়ীর লোকেরা সব অপেক্ষা ক'রে আছে তো···'

এই বলে দু'হাত তুলে নমস্কার জানিয়ে সে বিদায় নেয়। হয়ত নীচজাতে সংস্কার এখনো তার চলে যায় নি, কিংবা হয়ত জন্ম-মৃত্তিকা থেকে তাদে মিথ্যা প্রবঞ্চনা দিয়ে টেনে নিয়ে এসে যে অপরাধ করেছে, নিজে অগোচ তা তার বিবেকে দংশন করতে থাকে।

'আচ্ছা ভাই বুটারাম···বহুৎ মেহেরবানি···' গঙ্গু প্রত্যভিবাদন জানায়

পিঠের বোঝা মেঝেতে নামিয়ে মাটিতে বসে পড়ে, সে হাঁ ছেড়ে বাঁচে।

কিন্তু সজনীর বিলম্ব সয় না!

'একটু ওঠো দেখি, ঘরটা ঝাঁট দিয়ে গোবর জল নিকিয়ে আগে লোকের করে নি!'

বদ্ধ গেঁয়ো মেয়ে···সেই তার স্বভাব-ধর্ম···তার কাছে জীবন মানে ঝাঁট দেওয়া আর রান্না করা আর গোবর নিকানো।

গন্থু একটু বিরক্ত হয়েই বলে ওঠে : 'একটু বসো, একটু জিরোও দেখি [illegible]র মা!'

খোলা দরজা দিয়ে তখনও বুটা সর্দারকে দেখা যাচ্ছিল। দু'ধারে সারি সারি কুলিদের ঘর, তার মধ্যে ধুলোয়-ভরা রাস্তা দিয়ে বুটা সর্দার এগিয়ে চলেছে···মাঝে মাঝে ভিড় ক'রে কুলিরা দাঁড়িয়ে আছে। যেখানে সে ক্লান্ত হয়ে বসে পড়েছিল, সেখান থেকে উঠে দাঁড়িয়ে গন্থু বাইরে আসে। অদূরে দল বেঁধে যে-সব কুলি দাঁড়িয়ে আছে তাদের সঙ্গে গিয়ে আলাপ করতে তার মন চায় কিন্তু সেই সঙ্গে তাদের দেখে মনটা কেমন যেন সঙ্কুচিতও হয়ে পড়ে! মনে তার শঙ্কা জাগে, ওরাও কি বুটার মত, অফিসের সেই বাবুটির মত, অমনি স্বার্থপর, অমনি অবিশ্বাস্য!

পরনে হাঁটু পর্যন্ত একখানি সামান্য ছোট বস্ত্র···হাতে হুঁকা...শীর্ণদেহ নারাণ তার সামনে এসে অভিবাদন জানায় :

'রাম, রাম ভাই!'

ম্লান হেসে গন্থু জবাব দেয় : 'রাম, রাম ভাই!'

'অনেক দূর থেকে আসছো বুঝি?' নারাণ জিজ্ঞেস করে।

'বারো দিন আর বারো রাতের পথ···হোসিয়ারপুর জেলা থেকে,' গন্থু জানায়।

'তাহলে তোমরা পাঞ্জাবী?'

'হাঁ, পাহাড়ী। আপনার দেশ?'

বিষণ্ণকণ্ঠে নারাণ উত্তর দেয় :

'আমি, আমি ভাই এসেছি বিকানীর থেকে।'

'কত দিন হলো এসেছেন?' গন্থু জিজ্ঞেস করে।

নারাণ জবাব দেয় : 'ও, সে অনেক···অনেক দিন আগে···'

এক টান ধোঁয়ার সঙ্গে খানিকটা থুতু গিলে নিয়ে কাশতে কাশতে নারা বলে : 'তা সে⋯সে বারো বছর হবেও'

'কোনও সর্দার নিয়ে এসেছিল বুঝি ?'

'হাঁ, এখানে যত কুলি দেখছো, সব মালিকদের আড়কাটি যোগাড় করে নিয়ে এসেছে। নিজের ইচ্ছেয় কেউ কি এখানে আসে ? তা ভাই, তুমি এখানে মরতে কেন এলে ?'

সে-কথার জবাব না দিয়ে গন্নু চিন্তিতভাবেই জিজ্ঞেস করে :

'তাহলে আপনি দেখছি এখানে সুখী নন ?'

'আছি ঐ এক-রকম ভাই। কিস্‌মতে যা আছে, তা তো হবেই। সেখানে গাঁয়ে মনে হতো, কয়েদখানা⋯এখানে তার চেয়ে একটু খারাপ লাগে, এই আর কি ! সেবার বিকানীরে মস্ত বড় দুর্ভিক্ষ হলো। কেন হলো জান ? মহারাজাকে এত টাকা আংরেজ সরকারকে দিতে হলো যে গরীব প্রজাদের জন্যে খাল কাটার টাকা আর তার রইলো না। আমার দুই বড় ছেলে, সেবার সেই অকালেই গেল মারা⋯গিন্নী আর আমি মরতে মরতে কোনরকমে বেঁচে গেলাম। সেই সময় চা-বাগানের একজন সর্দারের সঙ্গে দেখা। তার পর বুঝতে পেরেছ কিনা, এইখানে চলে এলাম। সেই দুর্ভিক্ষে উপোস দিয়ে মরার চেয়ে এখানে অবিশ্যি দু'বেলা দু'মুঠো যা হোক জুটলো। তা ছাড়া, ঐ যে দেখছো বুনু⋯ঐ যে⋯ও তখন হামাগুড়ি দিচ্ছে⋯ওকে নিয়ে আরও দুটি ছেলে ভগবানের ইচ্ছেয় তখনও বেঁচে⋯ওদের তো আর না খাইয়ে মেরে ফেলতে পারি না। এখানে আমাদের তিন বছরের মেয়াদ ছিল কিন্তু মেয়াদ ফুরিয়ে গেলে ফিরে আর যেতে পারলাম না। এখানকার বেনের কাছে ধার পড়ে গিয়েছিল, ইদানীং তো এখানে আর তেমন রোজগারপাতি হয় না। গোড়ায় গোড়ায় শুনেছি লোকের অবস্থা এত খারাপ ছিল না। তখন সাহেবদের ব্যবসা খুব চলতো, মাইনেও নাকি ভাল দিত। আজ বারো বচ্ছর হলো আত্মীয়-স্বজন ছাড়া হয়ে আছি; তারা বেঁচে

আছে কি মরে গিয়েছে, তাও জানি না। আমার যেটুকু জমিজমা ছিল, তাও আছে কি না জানি না। পরে যখন শুনলুম মহারাজা নাকি খাল কাটিয়ে দিয়েছিলেন, তখন মনে হয়েছিল বুড়ো বয়সে গাঁয়ে ফিরে গিয়ে নিজের জমিজমা চষে কোনরকমে দিন কাটাবো, তবুও আপনার জনের মধ্যে শান্তিতে চোখ বুজতে পারবো তো। তবে বরাতে তা নেই ভাই! হাঁ, তোমার কথা তো শোনা হলো না...তুমি এলে কেন?'

গঙ্গু হতাশভাবে জানায়: 'এই পোড়া পেট!'

'তাহলে তুমিও কনট্র্যাকে সই করেছ?' নারাণ জিজ্ঞেস করে।

'না, সই এখনও করা হয় নি।'

'তা এখানে যখন এসে পড়েছ, আর পালাবার পথ নেই···সই কর আর নাই কর···ফেরবার পথ বন্ধ।'

নিজের অন্তর থেকে এই নিদারুণ সত্য যেন সে ইতিপূর্বেই উপলব্ধি করেছিল। তাই আপনা থেকে গঙ্গু বলে ওঠে: 'তা জানি!'

তবুও কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করে: 'কিন্তু কেন, কেন নেই?'

নারাণ বলে: 'কেন যে নেই, তা তুমি নিজেই জানতে পারবে শিগ্‌গির। কথায় বলে, পয়লা জল, তার পর কাদা। এ এক অদ্ভুত কারাগার ভাই, এর দরজা-জানালায় একটিও শিক নেই···একটিও খিল নেই···তবুও এ জেল ভেঙে পালাবার কোন উপায়ও নেই! সমস্ত চা-বাগান ঘিরে চৌকিদার পাহারা দিচ্ছে, তুমি যদি লুকিয়ে পালাবার চেষ্টা কর, ধরে নিয়ে আসবে। সেদিন সাঁওতাল পাড়া থেকে বালকিষন বলে একটা ছোট ছেলে পালিয়ে যায়, বেচারা ভেবেছিল, হেঁটে অযোধ্যায় তার মার কাছে চলে যাবে— চৌকিদার মারতে মারতে তাকে ধরে নিয়ে এলো! সারারাত ধরে হাতে লণ্ঠন নিয়ে চৌকিদারেরা পাড়া পাড়া ঘুরে বেড়ায়, প্রত্যেক ঘরে উঁকি মেরে দেখে, সাড়া নেয়, ঘরে আছ কি না।···আমরা আসবার আগে, এখানে রোজ রাত্তিরে কুলিদের খাতা-কলমে হাজিরা নেওয়া হতো।'

মনে মনে যদিও সব লাঞ্ছনা সহ্য করবার জন্যে সে নিজেকে তৈরী ক'রে নিয়েছিল, তবুও নারাণের কথায় যখন সে জানতে পারলো যে, প্রত্যেকের গতিবিধির উপর পাহারা বসানো আছে, তখন তার সমস্ত চৈতন্য উদ্বেলিত হয়ে উঠলো। সকরুণভাবে জিজ্ঞেস করে: 'কিন্তু এসব কথা তো বুটা আমাকে একবারও বলে নি?'

সঙ্গে সঙ্গে তার সারা মুখখানাকে যেন এক নিদারুণ দুশ্চিন্তার রজ্জু দিয়ে দুশ্ছেদ্য গ্রন্থিতে পাকিয়ে দেয়।

তার মুখের দিকে চেয়ে নারাণ বুঝতে পারে, নতুন এসেছে, এরকমভাবে তাকে ভয় দেখানো ঠিক হয় নি। তাই তাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে চিরাচরিত ভঙ্গীতে বলে: 'ভয় নেই ভাই, সব ঠিক হয়ে যাবে, সব সয়ে যাবে!'

কয়েক মুহূর্ত চুপ ক'রে থাকার পর, সে আবার বলতে আরম্ভ করে:

'একথা ভুলে যাচ্ছ কেন ভাই, এখানে অন্তত দু'বেলা দু'মুঠো যাহোক তো জুটবে! আমার কথাই ধর, আমি যদি বিকানীরে থাকতাম, তাহলে তো দুর্ভিক্ষে মারাই যেতাম। আমার চোখের সামনে দেখেছি, আমার তিন-তিন ভাই, দু-দুটি ছেলে না খেতে পেয়ে মরে গেল। আমি আর জামা গাছের পাতা ছাড়া, একমাস দাঁতে আর কিছু কাটতে পাই নি···ঐ যে বেচারা বুলু··· ওতো মারাই গিয়েছিল, কেন না আমার বুকে তখন এক ফোঁটাও দুধ ছিল না। শিশু খাবে কি? এখন তো তবু এখানে এসে, যাহোক মানুষ হয়ে উঠছে, সেই সান্ত্বনা।'

করুণায় তার মুখ ভিজে উঠেছিল, কথা বলতে বলতে তাই সে ঢোক গিলে ফেলে।

গঙ্গু বাইরে চেয়ে দেখে, তার ছেলেমেয়েরা তখন নিশ্চিন্ত মনে নারাণের ছেলের সঙ্গে খেলতে শুরু ক'রে দিয়েছে। পীড়িত মন খানিকটা শান্ত হয়।

হঠাৎ নারাণ হেঁকে উঠলো: 'বুলু ও-বুলু, ছুটে তোর মাকে বলগে যা, অতিথিদের জন্যে ভাত রান্না করতে!'

গঙ্গুর দিকে ফিরে বলে : 'ভাই, আজ রাত্তিরে তোমরা আমার ওখানে খাবে, বুঝলে ?'

এই আন্তরিক প্রীতির আহ্বানেও সেই দুঃসময়ের মধ্যে গঙ্গুর সংস্কারাচ্ছন্ন মন সহজে সাড়া দিয়ে উঠতে পারলো না। তার ধারণা ছিল যে, বিকানীরিরা সাধারণত ছোটজাতের নিঃস্ব পথের ভিখারী··· আর তারা বনেদী সাচ্চা কিষাণ-জাতের লোক। তাই সে কুণ্ঠিত হয়েই জবাব দেয় : 'সে কি কথা! থাক্ থাক্, আপনাকে আর দাদা আমাদের জন্যে এত কষ্ট করতে হবে না!'

নারাণ কিন্তু সহজভাবেই বলে ওঠে: 'এতে আর কষ্ট কি ভাই, তুমি আমাকে দাদা বলেছ, আমিও তোমাকে ভাই বলে ডেকেছি। আর তা ছাড়া পাশাপাশি তো বাস করতেই হবে।'

গঙ্গু তবুও বলে : 'তোমার দয়া দাদা আমি বুঝি, কিন্তু ভগবানের ইচ্ছায় আমরা তো অনেকগুলি কিনা? এতগুলো মুখের রান্না রাঁধতে বাড়ীর লোকের নিশ্চয় কষ্ট হবে। আর তা ছাড়া আমাদের সঙ্গে কিছু পিঠে-পুলী বাড়তি রয়ে গিয়েছে, তাই খেয়ে শুয়ে পড়বো।'

নারাণ তীব্রভাবে প্রতিবাদ ক'রে ওঠে : 'না, না, সে কিছুতেই হতে পারে না।'

এখনো পর্যন্ত অতিথি-সংকারের পুরনো আদর্শ এদের মধ্যে থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায় নি। যদিও আজ চারদিকে নতুন অর্থনীতি নিয়ে এসেছে নতুন সামাজিক ব্যবস্থা, তোমার চোখ আমাকে দিয়ে দাও আর তুমি অন্ধকারে মর হাতড়ে, এই হলো আজকের মানুষের সামাজিক নীতি। কিন্তু এই সব গেঁয়ো লোকদের মনে এখনো তার পুরো প্রভাব এসে পড়ে নি।

অবশেষে গঙ্গুকে সে-নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতেই হয়। লীলা আর লীলার মাকে ডেকে বলে : 'ও লীলা, তুই যা, তোর কাকীকে সাহায্য করগে যা, যাও না লীলার মা, তুমিও গিয়ে তোমার দিদির সঙ্গে আলাপ-পরিচয় ক'রে এসো?'

নারাণ তাদের ডেকে সঙ্গে নেয় : 'এসো বহিন্, চল বুলুর মার কাছে তোমাদের নিয়ে যাই।'

লীলা আর সজনী নারাণকে অনুসরণ ক'রে চলে। বোনের কাপড়ের আঁচল ধরে বুদ্ধুও পেছনে পেছনে চলে, তার হাতে তখন বুলুর ন্যাকড়ার বল্।

গন্নু নীচে উপত্যকাভূমির দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে, অপরাহ্ণের বিদায়োন্মুখ সূর্যকর তখন চা-গাছের সারি আর জমির আলোর ফাঁকে ফাঁকে কখনো হলুদ, কখনো রক্ত-রাঙা, কখনও বা তুঁতের মত নীল রঙ পর্যায়ক্রমে ছড়িয়ে চলেছে। সামনের সেই সবুজের সঘন বিস্তার দেখে আপনার মনে সে ভাবে, কি পর্যাপ্ত ফসলই না ফলেছে। বাতাস এসে চায়ের গাছে দোলা দিয়ে যায়। তার মনে পড়ে, যে-বছর, আকাশ সদয় থাকতো, এমনিধারা গমের ফসল তার জমিতেও দেখা দিত···পরিপুষ্ট গমের শীষগুলো ভার বইতে না পেরে নুয়ে পড়ে এমনি হাওয়ায় দুলতো। মানসচক্ষে সে যেন স্পষ্ট দেখতে পায়, দিনের শেষে ক্ষেতের কাজ সেরে শস্য-ভরা মাঠ দিয়ে সে বাড়ী ফিরে চলেছে···মাঠের প্রত্যেকটি ধুলোর কণা যেন সে আলাদা ক'রে স্পষ্ট দেখতে পায়···সারা চোখে-মুখে তার তুষ্টির হাসি, সে-হাসি যেন নীরবে জানিয়ে দেয়, এই পৃথিবী আর তার মধ্যে, কোথাও যেন কোন বিরোধ নেই···সে আর সজনী আর এই শস্য-ভরা পৃথিবী···তার মধ্যেই আছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কুশল-বারতা। কিন্তু হায়, সে বহু বহু দিন আগেকার কথা! তখন সে সবে মাত্র বিয়ে করেছে···তার নিজের বলতে তখন পাঁচ-একর জমি।

চোখের সামনে দেখতে দেখতে বিদায়-রবি সোনার রঙে সারা বাগানটা রাঙিয়ে দেয়। সেই দিকে চেয়ে চেয়ে তখনও সে সন্দিগ্ধচিত্তে ভাবে নারাণদা এখানকার জীবন সম্বন্ধে যে-ভয়াবহ কাহিনী বললে, তা কি সত্যি?

সেই পর্যাপ্ত অপরাহ্ণে সে-কথা স্বীকার করতে মন কি চায়?

ক্রমশ তার দৃষ্টি উদাস হয়ে আসে। সে চেয়ে থাকে কিন্তু কিছুই দেখতে পায় না। ধীরে ধীরে পথের ক্লান্তি মারাত্মক বিষের মতন দেহ-মন-মস্তিষ্ককে ছেয়ে ফেলে। সেই নিঃশব্দ বিষের ক্রিয়ায় তার দেহ অলস অসাড় হয়ে আসে। উদাসীনতার চেয়েও উদাস এক চরম নিষ্ক্রিয়তা তাকে গ্রাস ক'রে ফেলে।

হঠাৎ কিসের যেন একটা চীৎকার পেছন দিক্ থেকে উঠলো। বুধু চীৎকার করতে করতে ছুটে আসছে : 'সাহেব! সাহেব! বাবা!'

গঙ্গু ঘাড় ফিরিয়ে চারদিক্ দেখে।

তার কাছে এগিয়ে এসে নারাণ বলে : 'হাণ্ট সাহেব, চা-বাগানের ছোট সাহেব!'

সঙ্গে সঙ্গে নারাণের হাত যেন আপনা থেকে কপালে উঠে যায়। সেলাম ঠুকে সে দাঁড়িয়ে পড়ে।

নারাণের দেখাদেখি গঙ্গুও কপালে হাত ঠেকিয়ে সেলাম জানায় :

'সেলাম হুজুর!'

জ্বরে যেমন ক'রে মানুষ কাঁপে, তেমনিভাবে মাথা কাঁপিয়ে, ভাঙা হিন্দুস্থানীতে হাণ্ট জিজ্ঞেস করে : 'টোম্ নয়া কুলি?'

'জী, হুজুর!' গঙ্গু জানায়।

'কৌন্ লে আয়া? বুটা সর্দার?'

'জী, হুজুর!'

'কিধার হ্যায় উ?'

গঙ্গু মাথা নাড়িয়ে জানায়, সে-সংবাদ সে জানে না।

সাহেব যে কোন্ দিকে চেয়ে আছে, তা গঙ্গু বুঝতে পারে না। সাহেব বিরক্ত হয়ে বলে ওঠে : 'কেন সে এখানে এসেই তাকে খবর দেয় নি?'

নারাণ তার উত্তরে জানায় : 'হুজুর, সে বোধ হয় ঘরে ফিরে গিয়েছে।'

হাণ্ট আশে-পাশে চারদিকে নিরীক্ষণ ক'রে কি দেখলো, তার পর একটা অস্পষ্ট শব্দ ক'রে উঠে যাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়ালো।

এমন সময় লীলা ছুটতে ছুটতে গঙ্গুর কাছে এসে ডাকে : 'বাবা! খাবার তৈ...'

সে আর কথাটা শেষ করতে পারলো না। এখানে যে সাহেব-নামে একটি বস্তু আছে তা সে জানতো না। তাই কথার মাঝপথে সেই শুভ্র-চর্ম

মূর্তিটিকে দেখতে পেয়ে, অসমাপ্ত সংবাদ শেষ না ক'রেই পেছন ফিরে নিরাপদ আশ্রয়ের জন্যে প্রাণপণে ছুটতে আরম্ভ ক'রে দিল।

নারাণের দিকে চেয়ে হার্ট জিজ্ঞেস করে : 'উ কৌন্ হায় ?'

গজু সভয়ে জানায় : 'হুজুর, আমারই মেয়ে !'

'ভাগা কাহে ? বলাও উস্‌কো...' সাহেব আদেশ করে।

গজুর উত্তর দেবার আগেই নারাণ বলে : 'হুজুর, ছোট্ট মেয়ে...তাই... এই যে বুটা আসছে।'

'আচ্ছা !' বলে সাহেব বুটার দিকে এগিয়ে যায়। সাহেবের পেছনে পেছনে কুলি-পাড়ার একদল ছেলে বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে অনুসরণ ক'রে চলে।

সাহেব চলে গেলে নারাণ গজুকে ডেকে বলে : 'তোমার বরাত খুব ভাল ভায়া! বড় বদমায়েস সাহেব...তার ওপর সব সময়ই মদ খেয়ে টং হয়ে আছে। কারুর মা-বোনকে এতটুকু খাতির করে না। তিন-তিনটে কুলি-মেয়েকে নিয়ে ব্যাটা সদরেই বাস করে।'

গজু বলে ওঠে : 'তাতে আমার কি ! লীলা তো আমার বাচ্ছা মেয়ে... দুধের শিশু...ওকে...'

নারাণ বলে : 'এখানে যে কখন কি হতে না পারে, তা কেউ বলতে পারে না। তবে এইটুকু জেনে রাখো ভায়া,—এখানে কারুরই মা-বোন নিরাপদ নয়। যাক্‌গে, খাবার তৈরী, চল। খাওয়া-দাওয়া সেরে শুয়ে পড়...এত দূর পথ এসে নাকাল তো কম হও নি ভায়া!'

বিভ্রান্ত গজুকে সঙ্গে নিয়ে সে এগিয়ে চলে।

॥ চার ॥

অফিসে ক্রফ্‌টকুকের ঘরে ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে ঢুকে পড়ে রেণী হার্ট জিজ্ঞেস করে : 'কোন স্পেশাল অর্ডার আছে স্যার?'

বড় সাহেব তখন ফাইলের মধ্যে মুখ গুঁজে বসেছিল, তাই রেণীর প্রশ্নের উত্তরে মাথা না তুলেই অস্পষ্টভাবে কি যেন বিড়বিড় ক'রে বললে। তার পর, মাথা তুলে, ঘাড় শক্ত ক'রে শুধু জানায় : 'গুড মর্ণিং রেণী!'

সুবৃহৎ টেবিলের ডান দিকে একটা ট্রের ওপর অনেকগুলি পাইপ পড়ে ছিল। খেলনার মত সেগুলো নাড়াচাড়া করতে করতে যেন গুরুতর কি একটা সমস্যার সমাধান চিন্তা করে।

কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর বলে ওঠে : 'না বিশেষ কিছু নেই। তবে হাতীতে চড়েই আমাকে স্টেশনে যেতে হবে···ট্রেন থেকে ট্রেজারীর বাক্স নিয়ে আসতে হবে···একজন শুধু দারোয়ান সঙ্গে চাই। কাকে পাঠাবে?'

'বুটা কাল ফিরে এসেছে···কিন্তু এসে আমাকে খবর পর্যন্ত দেয় নি। বাইরের কাজে লাগিয়ে বেটাকে সায়েস্তা করতে হবে। মাত্র একটা বুড়ো কুলি ধরে নিয়ে এসেছে···তাও আবার তাদের সংসারে মাত্র তিনজন লোক।'

কয়েক মুহূর্ত চুপ ক'রে থাকার পর ক্রফ্‌টকুক বলে : 'তা, বুটা সঙ্গে গেলেই চলবে, আর দেখ, কুলি-সংগ্রহ সম্বন্ধে এখন বিশেষ কিছু ভাবনা করো না। জাতীয় আন্দোলন ফেঁসে গেলেই আবার হুড়হুড় ক'রে কুলি আসবে। যারা এসেছে তাদের ঘর-দোরের বন্দোবস্ত করা হয়েছে কি?'

রেণী ঘাড় নেড়ে হাঁ জানায়।

'অল্ রাইট্!'

হঠাৎ কি মনে ক'রে হাতের ঘড়ি তুলে দেখে, সাড়ে ন'টা বেজেছে। সঙ্গে সঙ্গে রেণীর দিকে চেয়ে মুখটা বিকৃত ক'রে নীরবে জানিয়ে দেয়, আজও অফিসে আসতে তার দেরি হয়েছে!

রেগী তা লক্ষ্য করতে ভুল করে না। সে বুঝতে পারে সেই মুখ-বিকৃতির অর্থ হলো নীরব ভর্ৎসনা। কারণ ক্রফ্‌ট্‌কুক্‌ নিজে ঘড়ির সেকেণ্ডের কাঁটার সঙ্গে চলতো। সেই নীরব ভর্ৎসনায় আহত হয়ে, রেগী কোনরকমে চাপা গলায় বিদায়-সম্ভাষণটুকু জানিয়ে বেগে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে।

বাইরে টিপু অপেক্ষা ক'রে দাঁড়িয়েই ছিল···দীর্ঘ সুগঠিত দেহ। আপনারি মনে ঘাস চিবোতে চিবোতে গোল গোল চোখ বার ক'রে পার্শ্বে দণ্ডায়মান হামির সিং-এর লাল উর্দির দিকে চেয়ে আছে। হামির সিং অফিসের আর্দালির সরকারী পোষাকে সুসজ্জিত হয়ে ছোট সাহেবের সঙ্গে বেরিয়েছে।

তার হাত থেকে লাগাম নিয়ে রেগী টিপুর উপর উঠে বসে। চা-বাগানের শেষের দিকে যেখানে বন কেটে কুলিরা চাষবাসের জায়গা বার করছিল, রেগী সেই দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দেয়। এইভাবে বন কেটে প্রায় পনরো শো একর জমি বার করা হয়েছে, এবং কুলিদের পরিশ্রমে সেখানে পর্যাপ্ত শস্যও আজ দেখা দিয়েছে। সম্প্রতি তার সঙ্গে আরও দশ একর জমি সংযুক্ত করবার চেষ্টা চলছিল।

জগতে শ্বেত-জাতিরাই সব ব্যাপারে সব সময় অগ্রণী, রেগী ষোলো-আনা সে-সব অনুভব করতো। যখন ঘোড়ায় চড়ে ঘুরে বেড়াতো, তখন তাকে দেখলে মনে হতো, যেন দেহগত কামনার একটা অব্যক্ত অগ্নি-দীপ্তি তার ভেতর থেকে উৎসারিত হয়ে চুধারে ছড়িয়ে পড়ছে। তার বলিষ্ঠ বাহু থেকে, বাহুমূল থেকে, বক্ষ থেকে, দৃঢ়-সুপুষ্ট মাংসপেশী থেকে দৈহিক স্বাস্থ্যের একটা অবর্ণনীয় জ্যোতি আপনা থেকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতো। অশ্বের গতি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেই সুগঠিত দেহের মধ্যে কামনার সুতীব্র শিখা সহস্র-জিহ্বায় জ্বলে উঠতো। সেই বিপুল শক্তি তাকে তীব্রভাবে আত্ম-সচেতন ক'রে তুলতো। তখন সে চাইতো সকলের দৃষ্টি উৎসুক আগ্রহে তার দিকেই নিবদ্ধ হোক, তাকেই অভিনন্দিত করুক। কিন্তু কোন কোন দিন সকালবেলা ঠিক সময়ে অফিসে পৌছতে সে পারতো না। মুখে না

বললেও, ক্রুক্‌ টক্‌কের দৃষ্টিতে ভর্ৎসনা ফুটে উঠতো। তাতে রেণীর আত্মশ্লাঘায় রীতিমত আঘাত লাগতো।

আপাতত সে খুশীই ছিল, কেন না আজকে বিকেলে হাতীর পিঠে চড়ে আর তাকে স্টেশনে যেতে হবে না। প্রত্যেক মাসে একবার ক'রে দশ মাইল দূরে রেল-স্টেশনে গিয়ে কুলিদের মাইনে হাতীর পিঠে বাক্স ক'রে নিয়ে আসতে হতো। হাতীর হাওদায় চড়ে নিজেকে যতই ভারিক্কি দেখাক না কেন, সেই দশ মাইল ধরে ঝাঁকানি সহ্য করার ফলে সপ্তাহখানেকের মত তার শরীর একদম ভেঙে যেত এবং শাদা-চামড়ার লোক হয়ে, কুলিদের সামনে অসুস্থ বলে নিজেকে জাহির করতেও তার আত্মসম্মানে রীতিমত আঘাত লাগতো।

চলতে চলতে টিপু হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ায়, সামনে সারি সারি ফার গাছের ছায়া তার পথের ওপর এসে পড়েছে। এক পাক ঘুরে ছায়া এড়িয়ে সে আবার চলতে আরম্ভ করে।

ছেলেবেলায় স্কুলের পাঠ্য বইতে অশ্বারূঢ় নেপোলিয়নের যে ছবি সে দেখেছিল, তার ছাপ তার মনে রয়েই গিয়েছিল। আসামের এই পার্বত্যপথে টিপু যখন কদমে কদমে চলতো, তখন তার মনে হতো, সে যেন নেপোলিয়ন, আল্‌পস্‌ পাহাড়ের ওপর দিয়ে বিপুল সেনাবাহিনী নিয়ে এগিয়ে চলেছে। হঠাৎ সামনে বনের মধ্যে কুলিদের দেখে, নেপোলিয়ন সাজবার এই প্রবৃত্তি আরও সুতীব্র হয়ে উঠতো। অকারণে তীব্র শব্দ ক'রে বাতাসে চাবুক আস্ফালন করতো, সেই শব্দের ইঙ্গিতে টিপু দ্রুত ছুটতে শুরু ক'রে দিত, রেণীর মনে হতো যেন সে বীর-বিক্রমে চলেছে সামনের শত্রুর দুর্গে ঝাঁপিয়ে পড়তে। মনে মনে কল্পনা করতো, নেপোলিয়ন যেমন ভঙ্গীতে তাঁর সৈন্যদের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেন, তেমনিভাবে সে সেই সব অর্ধ-মানবদের সামনে এসে মাথা তুলে দাঁড়াবে, তাকে দেখে সম্ভ্রমে ভয়ে তারা সচকিত হয়ে উঠবে। যখন সে প্রথম চা-বাগানে আসে, তখন প্রায়ই এই ছেলেমানুষি তাকে পেয়ে বসতো। তখন তার ইচ্ছামাত্রই মনের সুপ্ত স্তর থেকে সেই প্রবৃত্তি আপনি জেগে

উঠতো এবং যখনই খেয়াল হতো তখনি সে নেপোলিয়ন সেজে বসতো। এবং এই খেয়াল তার প্রায়ই হতো। যদিও তার এখন বাইশ বছর বয়স এবং এর মধ্যে যুদ্ধেও ঘুরে এসেছে একবার, তবুও, বুদ্ধি-বৃত্তি এবং প্রবৃত্তির দিক্ থেকে সে সেই টর্নব্রিজের স্কুলের নাবালক ছাত্রই রয়ে গিয়েছে। আসামের একটা সবচেয়ে বড় চা-বাগানের সে যে ছোট সাহেব, সে-কথা সে প্রায়ই ভুলে যায়।

কুলিরা যেখানে কাজ করছিল, সে-জায়গাটা ম্যানেজারের বাংলোর ওপারে একটা খাড়া পাহাড়ের গা ঘেঁষে ছিল। ওপরে উঠতে গিয়ে টিপু হাঁপিয়ে উঠছিল··· বাধা হয়েই সে শ্লথ-গতি হয়ে পড়ে। তাকে উত্তেজিত করার জন্যে রেগী জোরে তার পেটে লোহার খোঁচা দিয়ে চাবুক চালাতে থাকে। হঠাৎ জোরে ছুটতে গিয়ে একটা বড় গাছের শেকড়ে পা আটকে টিপু প্রায় মাটিতে পড়ে যাবার মতন হলো। কুলিদের সামনে সেই হাস্যাস্পদ অবস্থায় তাকে পড়তে হলো দেখে, রাগে রেগীর হঠাৎ জ্ঞান-বুদ্ধি ক্ষণকালের মত বিলুপ্ত হয়ে যাবার মতন হলো···কিন্তু দৈবক্রমে সুবুদ্ধির উদয় হওয়াতে, রাশ টেনে ধীর মন্থর গতিতেই কুলিদের দিকে এগিয়ে চলে···নেপোলিয়ন বোনাপার্টের অভিনয় সেদিনকার মত ব্যর্থ হয়ে যায়।

পথের ধারেই একটা শাবল হাতে নিয়ে বুটা সর্দার কুলিদের ওপর সর্দারী করছিল। রেগীকে দেখেই সে সেলাম ঠুকে দাঁড়ালো। কাছেই দু'জন কুলি কাজ করছিল, সাহেবকে দেখে তারা নিঃশব্দে ধীরে কপালে হাত ঠেকিয়ে সেলাম জানায়। অন্য সব কুলিরা তখন যে যার সাধ্যমত মাটি কোপাচ্ছে··· ঘাস, আগাছা, কাঁটাগাছ কেটে সাফ করছে···

অরণ্য আর লোহে চলেছে সংগ্রাম···উন্মাদ আক্রোশের কুড়ুল আর কোদালের আঘাত উঠছে আর পড়ছে···কাস্তের ধারে কচি সবুজ ঘাসের বন দেখতে দেখতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে, সমানে ছুরি চলেছে তার কাজ ক'রে, অরণ্য নীরবে আত্মদান করছে লোহের নিষ্করুণ আক্রমণে। দেখতে দেখতে সেই

শাণিত লৌহের ছোঁয়া লাগে রেণীর মনে, জেগে ওঠে অমনি আঘাত করবার সাধ। ঘোড়া থেকে নেমে পড়ে। ভাবে একটা কুড়ুল নিয়ে ওদেরই মতন কেটে দু-টুকরো ক'রে ফেলে একটা গাছ। কিন্তু খেলার ছলে হয়ত কুড়ুল হাতে ধরা যায়, তা বলে কুড়ুল নিয়ে কুলিদের মতন গাছ কাটা ইংরেজ মনিবের মর্যাদায় বাধে। মাঠে চাষবাসের সময় হয়ত নিজের হাতে ট্রাক্টর চালানো চলতে পারে, কিন্তু কুড়ুল নিয়ে গাছ কাটা—না, তা সম্ভব নয়।

এগিয়ে গিয়ে বুটাকে জিজ্ঞেস করে: 'কাল ফিরে এসে আমার কাছে হাজিরা দিস নি কেন?'

বুটা উত্তরে শুধু বলে: 'হুজুর!'

তার পর মাথা হেঁট ক'রে অপরাধীর মত দাঁড়িয়ে থাকে।

'বড় সাহেবের জন্যে মাগী যোগাড় ক'রে আনতে গিয়েছিলি বলে বড় দেমাক, না?'

হঠাৎ পেছন থেকে একজন কুলি চীৎকার ক'রে ওঠে:

'সাবধান সাহেব! সাবধান!'

জঙ্গল কেটে যে-সব আবর্জনা জড় হয়, কুলিরা ঘাড়ে ক'রে তা নিয়ে পাহাড়ের তলায় ফেলে দেয়। একটা বিরাট বোঝা কাঁধে তুলে একজন কুলি প্রায় সামনে ঝুঁকে পড়েছিল, লতা-পাতায় তার চোখ ঢাকা পড়ার দরুন, সামনে কে আছে তা সে দেখতে পাচ্ছিল না। তাই আন্দাজে ছুঁড়ে ফেলতে গিয়ে হঠাৎ মাথা তুলে দেখে তার বিশ গজের মধ্যেই সাহেব দাঁড়িয়ে। তাই সে ভীত হয়ে সাবধান করবার জন্যে চীৎকার ক'রে ওঠে।

'শপ্'!

বাতাসকে চিরে রেগীর হাতের চাবুক সশব্দে কুলিটির মুখের ওপর গিয়ে পড়ে। রাগে রেগী চীৎকার ক'রে ওঠে: 'বেটা অন্য দিকে ফেলতে কি হয়? দেখছিস না, এখানে দাঁড়িয়ে আমি সর্দারের সঙ্গে কথা বলছি?'

একে বোঝার ভার, তার ওপর হঠাৎ চাবুকের আঘাত এসে পড়াতে লোকটি টাল সামলাতে না পেরে মুখ থুবড়ে পড়ে যায়। গোঙাতে গোঙাতে তবু বলে: 'দেখতে পাই নি হুজুর, চোখ ঢেকে গিয়েছিল যে!'

বলার সঙ্গে সঙ্গে সেই অবস্থাতেই সাহেবকে কপালে হাত ঠেকিয়ে সেলাম করবার চেষ্টা করে।

বুটা সর্দারের হেফাজতে গঙ্গুও সেখানে কাজ করছিল। সেই দৃশ্য দেখে তার শিরায় উপশিরায় রক্ত যেন টগবগ ক'রে ফুটে উঠলো।

খালি কালো গায়ে, ঘামের ধারা বৃষ্টির জলের মত যেন ঝরে পড়ছে··· কুলিরা কাজ করতে করতে সবাই মিলে হঠাৎ কাজ বন্ধ ক'রে থমকে দাঁড়ায়। তারা প্রথমটা ভেবেছিল, হয়ত তাদের কোন সঙ্গী নিজের পায়েই কুড়ুল চালিয়ে দিয়েছে, গাছ কাটতে গিয়ে হয়ত নিজের আঙুলই কেটে ফেলেছে। এমনধারা প্রায়ই হয়। কিন্তু ঘাড় তুলে যখন দেখলো, অদূরে "রাজা সাহেব" দাঁড়িয়ে—তারা রেগীকে রাজা সাহেব বলেই ডাকতো—তখন আর তাদের বুঝতে দেরি হলো না যে রাজা সাহেবের হাতের [illegible] শুয়েছে। এমনধারা প্রায়ই হয়। তাই তারা সেই দৃশ্য-থেকে চোখ ঘুরিয়ে নিয়ে, আল্লার কোমর ভেঙে মাটির দিকে মুখ ক'রে কাজে মন দেয়। মাঝখানে শুধু এক মুহূর্তের জন্য একটু দম নিয়ে নেয় মাত্র।

রেগী চীৎকার ক'রে ওঠে: 'কাজে হাত লাগাও! লাগাও হাত!'

অধীর পদক্ষেপে সে তাদের দিকে এগিয়ে চলে।

তৎক্ষণাৎ যে যার কাজে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে মাথা হেঁট ক'রে লেগে যায়··· আড়চোখে একবার শুধু দেখে নিতে চেষ্টা করে এবার কার ওপর রাজা সাহেবের অনুগ্রহ বর্ষিত হতে পারে। অরণ্যের সঙ্গে সংগ্রামে লৌহের রণ-হুঙ্কারে দেখতে দেখতে তাদের চেতনা হারিয়ে যায়···চোখের সামনে শুধু দেখে, শাণিত ইস্পাতে, পুঞ্জীভূত হয়ে চলেছে তৃণ-শস্যের সবুজ শব-দেহ।

বুটাকে ডেকে রেগী হুকুম জানিয়ে দেয়, দাঁড়িয়ে দেখবি যেন সবাই ঠিক কায়দা মাফিক কাজ করে…একজন আর একজনের কাছ থেকে যেন বেশী দূরে সরে না থাকে…বিকেল বেলা বড় সাহেবের কাছে অফিসে রিপোর্ট দিবি…

তার পর ঘোড়ায় চড়ে নাটকীয় ভঙ্গীতে প্রস্থান করে।

রেগীর ধারণা যে, সব কুলিকে যদি কাছাকাছি এক জায়গায় রেখে কাজ করানো যায়, তাহলে তাদের ওপর নজর রাখার সুবিধা হয়। এইরকম অনেকগুলি দামী দামী ধারণা রেগী নিজের অভিজ্ঞতা থেকে সৃষ্টি করেছিল। রেগীর মতে এই সব কুলি জন্মসূত্রেই কুঁড়ে এবং সব সময় তাদের ওপর কড়া নজর না রাখলে কাজ পাওয়া সম্ভব নয়। এই সম্পর্কে, এই সিদ্ধান্তের অনুগামী সূত্র হিসাবে, তার আর-একটি মত ছিল যে, এদের সঙ্গে চলতে হলে চাবুক নিয়েই চলতে হবে, কারণ এরা যদি জানতে পারে যে তুমি কড়া লোক, তাহলেই এরা তোমাকে ভক্তি করবে, সম্ভ্রম দেখাবে। সাধারণত যে সব লোক নিজের মতকেই জগতের সব চেয়ে বড় জিনিস বলে জানে, তারা সাধারণত জেনেই খুশী থাকে, কিন্তু রেগী সেগুলোকে কাজেও পরিণত করে।

ফেরবার মুখে হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল যে, ইদানীং সে তো নিজেকে ওজন ক'রে দেখে নি, ওজন বাড়লো না কমলো। গত বছর বিশুদ্ধ নগ্ন দেহে সে নিজের ওজন নিয়ে দেখেছিল, মোটে দুশো পাউণ্ড। এ বছর অন্তত আরও কিছু বেশী হওয়া উচিত, তার গায়ের রঙ থেকেই সে তা অনুমান করে। বসন্তকাল আসার সঙ্গে সঙ্গে তার গায়ের চামড়ার রঙ অলিভের মত পেকে উঠেছে।

কিন্তু মনে মনে ভাবে, স্বাস্থ্যের দিক্ থেকে সে-রকম তো ভাল বোধ হচ্ছে না। কিন্তু কেন যে হচ্ছে না, সে-সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই সে নিজেকে করে না। উল্টে সে নিজেকে এই বলে আশ্বাস দেয় যে গতকাল কুলিদের তাক লাগিয়ে দেবার জন্যে সে তিনশো পাউণ্ডের একটা কাঠের গুঁড়ি অনায়াসে হাতে ক'রে তুলেছে—যদিও ইদানীং নিয়মিতভাবে পোলো খেলা হচ্ছে না এবং শিকারে যাওয়াও কমতি পড়েছে। ক্রক্‌টুকুকে বলে একটা

শিকারের ব্যবস্থা শিগ্‌গীর করতে হবে। তবে কুলিদের তদারক করবার জন্যে, এই যে পাহাড়ে ওঠা আর নামা তাকে নিয়মিত করতে হচ্ছে, এতেই শরীরের কলকব্জা ঠিক থাকবে।

একমাত্র আপদ এই দুঃসহ উত্তাপ। চারদিকে নিস্তব্ধ মূহ্যমান উত্তাপ··· শুভ্র···অগ্নি-শুভ্র···অবিচ্ছেদ···যেন শ্বাস রুদ্ধ হ'য়ে আসে। সে-নিস্তব্ধতাকে ভঙ্গ ক'রে চলেছে শুধু তার বাহন, পায়ের ক্ষুরের শব্দে।

চা-বাগানের প্রান্তে এসে রেগী লাগাম টেনে দাঁড়িয়ে পড়ে। সামনের বাগানে কুলি-কামিনরা একমনে পাতা তুলে চলেছে। পকেট থেকে সিল্কের রুমালখানা বার ক'রে ভাল ক'রে ঘাড় মুছে নেয়। চায়ের বন থেকে একটা দমকা হাওয়া এসে চোখে-মুখে লাগে।

গুর্খা সর্দার নিয়োগী সেইখানে দাঁড়িয়ে তদারক করছিল। নির্বিকার মুখ, যেন পাথরে তৈরী। চোয়ালের উঁচু হাড় আর খুদে খুদে লাল চোখে কেমন যেন বীভৎস দেখায়। সাহেবকে দেখে নিয়োগী সেলাম করে।

বাজ দেখলে পায়রারা যেমন ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে, হঠাৎ কাজ করতে করতে মাথা তুলে রেগী সাহেবকে দেখে কুলি-কামিনরা ঠিক তেমনি শশব্যস্ত চঞ্চল হয়ে উঠলো।

নিয়োগীর সেলামের উত্তরে রেগী গম্ভীরভাবে উত্তর দেয়, সেলাম! তার পর সামনের কুলি-কামিনদের ওপর নজর পড়তেই, তাদের সেই হঠাৎ চাঞ্চল্য এবং আড়চোখে চাউনি দেখে সে অনায়াসেই ধরে নেয় যে, সেটা হলো তার সুন্দর বলিষ্ঠ দেহের প্রতি মুগ্ধ-নারীকুলের নির্বাক সমাদর। অবশ্য কেউ কেউ যে তা করতো না তা নয়, তবে সেটা সাহেব বলেই তারা করতো, রেগী হার্ট বলে নয়। রেগী কিন্তু খুশী হয়ে, সেই সমাদরের বিনিময়ে স্বজাতি-সুলভ অভিমানবত্তা জাহির না ক'রে, এক্ষেত্রে অতিরিক্ত মোলায়েম হয়ে ওঠে। তার ফলে, এই মাত্র যে লোকটিকে চাবুক মেরে এসেছে, তারি জন্যে মনে ঈষৎ অনুকম্পারও উদয় হয়। নিজেকে মৃদু তিরস্কার ক'রে মনে

মনে বলে ওঠে, লোকটা উঠে এসে আমার সঙ্গে দেখা করলে তো পারতো ? উদ্ধত যৌবনের প্রাণ-প্রাচুর্যে শ্বেতজাতির সর্বাধিনায়কত্ব সম্বন্ধে যে-সব ভ্রান্ত ধারণা অক্ষয় সত্য বলে সে গ্রহণ ক'রে নিয়েছিল, তার আড়ালে, তার মনের একটা নমনীয় দিক্ তখনও পর্যন্ত লুকিয়ে বেঁচে ছিল। তবে সেটা, আমরাই এই সাম্রাজ্য গড়েছি, এই চেতনার দম্ভ আর আত্মস্ফীতির ধাক্কায় অন্তরের নিম্নতম স্তরে একেবারে সমাহিত হয়ে পড়েছিল। এই দেশে পা-দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ম্যালেরিয়া আর সেই দম্ভের ছোঁয়াচ একসঙ্গেই তাকে পেয়ে বসে। তাই সে-অনুকম্পা বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না, নিজের মনে একতরফা বিচারে সে লোকটাকেই দোষী সাব্যস্ত ক'রে নেয়, এবং নিজের কৃতকার্যের জবাবদিহিস্বরূপ ঠিক ক'রে ফেলে আচমকা আমাকে উত্তেজিত করেছিল, তাইতেই হঠাৎ রাগটা এসে গেল। অসীম অনুগ্রহভরে লোকটির অপরাধ সে ক্ষমা করে···ভুলে যায়, যে একটু আগে কারুর ওপর সে চাবুক চালিয়েছিল। এক কোণে একদল মেয়ে নিজেদের মধ্যে কি নিয়ে হাসাহাসি ক'রে উঠতেই নিয়োগী হাতের ছড়ি শূন্যে আস্ফালন ক'রে তাদের দিকে এগিয়ে যায়, ধমক দিয়ে বলে ওঠে : 'হুঁশিয়ার হয়ে কাজ কর···বড় মোটা পাতা হচ্ছে··· হুঁশিয়ার।'

ছোট ছোট নরম হাত আরও তাড়াতাড়ি চলতে আরম্ভ করে···দুটো ক'রে পাতা আর একটা ক'রে কুঁড়ি···দুটো ক'রে পাতা আর একটা ক'রে কুঁড়ি··· ছেঁড়ে আর পিঠের ঝুড়িতে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে।

ওস্তাদি দেখাবার জন্যে বেগী বলে ওঠে : 'গাছের মাথা যেন সমান থাকে।'

কিন্তু আসলে তখন মনে মনে সে 'প্যাঁচ' কষছে কি ক'রে একটা কুলি-কামিনকে 'বাগাতে' পারা যায়।

মাথা হেঁট ক'রে তারা পাতা ছিঁড়ে চলে, ভয়ে তাদের বুক কাঁপে, এলোমেলো ভাবনায় গুলিয়ে যায় মগজ।

বেদী কিন্তু বুঝতে পারে না, তার অতিথ তাদের মর্য্যাদা গহনে কি আতঙ্কের তরঙ্গই না তুলেছে। অন্যের আশ্বাস দেবার জন্যই সে তাদের শুনিয়ে শুনিয়ে বলে : 'পুরুষের চেয়ে মেয়েরা কিন্তু বেশী কাজের।'

এটা যে ঠিক তার মনের কথা, তা নয়। প্রশংসার প্রাথমিক সূত্র অবলম্বন ক'রে অন্তরঙ্গতার দ্বিতীয় স্তরে পৌঁছবার একটা চেষ্টা মাত্র। এতক্ষণ ধরে অশ্ব-পৃষ্ঠে জঙ্ঘা-পেষণের ফলে, জঙ্ঘা-দেশে, কটিমূলে একটা অব্যক্ত নিপীড়ন স্পৃহা তাকে পীড়িত ক'রে তোলে।

ব্যস্তভাবে জিজ্ঞেস ক'রে ওঠে : 'আজ কত ঝুড়ি কারখানায় গিয়েছে?'

মনের ভেতর যে উত্তাপ জমা হয়ে উঠছে, তাতে যেন তার নেশা ধরে যায়···সেই নেশার আবহাওয়া ছেড়ে যেতে মন চায় না। কিন্তু টিপু অস্থির হয়ে ওঠে, দৈনন্দিন অভ্যাসবশত সে জানে, এ জায়গা থেকে তাকে যেতে হবে এবার পাতা-ঘরে···তাই অধীর হয়ে সে মাটিতে পা ঠোকে···লাগাম কামড়ে ধরে টানে।

বেদীর প্রশ্নের উত্তরে নিয়োগী জানায় :

'খুশো দশ ঝুড়ি···আরও কিছু যাবে এইবার···'

বেদী সর্দারের দিক্‌ থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে চারদিকে চেয়ে দেখে··· যেন একটা বিরাট অঙ্ক মনে মনে কষছে, এই রকম ভাব দেখিয়ে বলে : 'দাঁড়া···ভেবে দেখি তাহলে, একর পিছু হলো পাঁচশো পাউণ্ড···'

সেই সঙ্গে তার নজর গিয়ে পড়ে নাক-চেপটা হজিরাবাদী এক গুর্খা রমণীর ওপর ··তাকে দেখিয়ে নিয়োগীকে জিজ্ঞেস করে :

'ওটা বুঝি তোর বউ, নিয়োগী?'

সর্দার জবাব দেয় : 'জী, হুজুর!'

'হুঁম্‌!' বলে বেদী আর কিছু কথা খুঁজে পায় না। নিয়োগীর দিকে চেয়ে হেসে তাকে তারিফ জানায়, এমন একটা ভাল জিনিস সে ভোগ-দখলে পেয়েছে বলে। সেই তারিফের কি ফল দাঁড়ায় দেখবার জন্যে সে নিয়োগীর

দিকে চেয়ে থাকে কিন্তু নিয়োগী মুখ ঘুরিয়ে নেয়। সেই অবকাশে সত্যাবনত সেই পরিপুষ্ট রমণী-দেহ নিরঙ্কুশ দৃষ্টি দিয়ে যেন সে লেহন করে। সে বুঝতে পারে মেয়েদের মধ্যে এই নিয়ে একটা কানাকানি শুরু হয়ে গিয়েছে…তাই একজনের ওপর থেকে দৃষ্টি তুলে নিয়ে সকলের ওপর সমান বিতরণ করে।

রেণী যেখানে দাঁড়িয়েছিল, তার কাছ বরাবর এক সারিতে লীলা তার মায়ের পাশেই কাজ করছিল। মেয়ের দিকে ঝুঁকে সজনী চাপা গলায় বলে ওঠে:

'দেখ্ দেখি লীলা, কি আপদ! সাহেবটা যাবে না কি গা? সারাদিন কি মিনসে এইখানে দাঁড়িয়ে থাকবে নাকি?'

তার পর গলাটা আরও একটু খাটো ক'রে বলে:

'আমার কিন্তু বাছা বড় ভয় করছে…ঐ আংরেজ লোকটাই না কাল আমাদের কুঠির সামনে এসেছিল?'

এত কাছে একজন সাহেব দাঁড়িয়ে আছে, তার কাজ দেখছে, ছোট ছেলের মতন লীলা সেই সৌভাগ্যের আনন্দে বিভোর হয়ে গিয়েছিল। তাই মার সেই ভীত উক্তি শুনে সে মাকে ধমক দিয়েই ওঠে:

'কি যে তুমি বলো মা! দাঁড়িয়ে রয়েছে তো কি হয়েছে? তোমার কাজ তুমি ক'রে যাও না! এখনো তো ভাল ক'রে ছিঁড়তে পারো না, দুটো পাতা আর একটা কুঁড়ি…দুটো পাতা আর একটা কুঁড়ি…'

মেয়ের কথায় সজনী যেন সাহস পায়। আবার নিজের চিন্তায় ডুবে যায়। বলে: 'বছরের মধ্যে ন-মাস নাকি এই রকম পাতা ছিঁড়তে হবে।'

নিয়োগীরও মনের অবস্থা খুব বেশী সুস্থির ছিল না, তবুও সে কত হুঁশিয়ার তাই সাহেবকে দেখাবার জন্যে সজনীকে ধমক দিয়ে ওঠে: 'খালি বাজে কথা…কাজ কর্, পাতার দিকে নজর দে, মুখ বন্ধ ক'রে কাজ কর্।'

রেণী আবার নিয়োগীর মুখের দিকে ফিরে চায়। দেখে, সেই নির্বিকার পাণ্ডুর মুখ লাল হয়ে উঠেছে।

হঠাৎ রেণী বলে ওঠে: 'সেলাম, নিয়োগী!'

সঙ্গে সঙ্গে টিপুর লাগামে টান পড়ে···টিপু অধীরভাবে এই জন্যেই অপেক্ষা করছিল। দেখতে দেখতে সে ছুটতে আরম্ভ করে।

কিন্তু রেগীর অন্তরে নিয়োগীর স্ত্রী তখন এতখানি জায়গা দখল ক'রে নিয়েছে যেখানে বেচারা নিয়োগীর দাঁড়াবার মত একটুও জমি আর ছিল না। সূর্যের তেজ পাতলা টুপি ভেদ ক'রে তার মগজে যেন আগুন জেলে দেয়,· সে-আগুনের আঁচে শুধু চোখে পড়ে সেই লজ্জাবনত পরিপুষ্ট নারী-দেহ। অন্তর চুঁয়ে যে রক্ত ঝরতে থাকে, তাতে লাল হয়ে ওঠে তার মুখ। তার কামনার অব্যক্ত গুঞ্জনে যেন নিবিড় হয়ে ওঠে চারিদিকের নীরবতার সেই শ্যাম-সমারোহ··· কিন্তু তার মধ্যে দিগন্তরেখায় একে একে স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে অবান্তর সব ভাবনা···বিঘ্ন···

প্রথম নম্বরের বিঘ্ন, শ্বেত-জাতির মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে··· ক্রফ্‌টকুকের এই এক কথা শুনে শুনে সে জ্বালাতন হয়ে উঠেছে। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানাভাবে সে রেগীকে এই সম্বন্ধে সচেতন করতে চায়। 'নিয়ম···বুঝেছ বৎস, সব সময় নিয়ম মেনে চলতে হবে।' ক্ষিপ্ত হয়ে রেগী ভাবে, কবে এই টাক-মাথা বেজন্মা বুড়ো অবসর নিয়ে চলে যাবে···নীচ, অতি নীচ···আজ পঁচিশ বছর ধরে এই চা-বাগানে শিকড় গেড়ে বসে আছে···বেশ দু-পয়সা গুছিয়েও নিয়েছে তবুও নড়বার এতটুকু লক্ষণ নেই।

নিজের অসুবিধার কথা ভাবতে গিয়ে রেগীর মনে পড়ে যেদিন প্রথম সে এই চা-বাগানে এসেছিল, বুড়ো সেদিন থেকেই যেন তাকে পেয়ে বসেছিল। তখন সে অবশ্য দস্তুরমত বড় সাহেব এবং তার চাল-চলন দেখে রেগীর যে খানিকটা সম্ভ্রম জাগে নি, তাও নয়। কিন্তু কয়েক সপ্তাহ যেতে না যেতেই নতুনত্বের বিস্ময় তার কেটে গেল। তখন এক-একদিন একসঙ্গে খেতে বসে তার মনে হয়েছে, টেবিলে লাথি মেরে সব উল্টে ফেলে দেয়। তার মাথার ওপরে ওপরওয়ালা সেজে একজন মুরুব্বিয়ানা ক'রে সর্বদাই তাকে চোখে চোখে রাখতে চাইবে, এ অসহ্য অত্যাচার। রেগীর মনে হতো, সে প্রত্যেক চামচে

ক'রে যা মুখে দিচ্ছে, তাও যেন বুড়ো নজর দিয়ে দেখছে। খাওয়া শেষ না হতেই বুড়ো অধীর হয়ে খানসামাকে ডেকে টেবিল পরিষ্কার করতে হুকুম দিত, এমনি অধীর, এমনি ব্যস্ত! তার পর সন্ধ্যাবেলায়, কাজকর্ম সেরে যখন একটু হাত-পা এলিয়ে বিশ্রাম করবে, বুড়ো তখন কানের কাছে বকতে থাকবে, নতুন লোকের এই করা উচিত, এই করা উচিত নয়···এই কথা রোজ শুনতে শুনতে রেগীর ধৈর্য নিঃশেষিত হয়ে আসবার মত হতো। সেবার বুড়োকে ম্যালেরিয়া ধরলো, উল্টে পাল্টে জ্বর আসে। বুড়োর অবস্থা দেখে রেগীর মন তখন একটু নরমও হয়েছিল। জ্বরের পর বুড়ো ভয়ানক রোগা আর দুর্বল হয়ে গেল। যাবে না তো কি? কোনদিন বুড়ো বাঁচার মতন ক'রে বাঁচতে চেষ্টা করেছে? প্রাণ খুলে ভাল ক'রে কোন কিছুই সে ভোগ করে নি। তার জন্যে অবশ্য দায়ী, মনে করতেই রেগীর ঠোঁট উল্টে যায়···বুড়োর পত্নীরূপী গাভীটি। মিসেস্ ক্রুক্‌ট্যুক্ আর রেগীর মধ্যে এতটুকু মিল কোথাও ছিল না। রেগী মনে করতো মিসেস্ ক্রুক্‌ট্যুক্ হলো পয়লা নম্বরের ভণ্ড। মিসেস্ ক্রুক্‌ট্যুক্ জানতো, রেগী অতি কুৎসিত মাতাল এবং সেই জন্যে প্রকাশ্যেই বলতো, তার ত্রিসীমানার মধ্যে সে বাবুর্বারাকে যেতে দিতে চায় না। আবহুদ্ধ লোক বুড়ীকে নিয়ে হাসি-তামাশা করে, বুড়ী তা বুঝেও বোঝে না। এধারে হিচককে দেখলে, বুড়ী পড়ে কি মরে, তার কাছে ছুটে যাবেই। হিচকই তাকে একদিন বলেছিল, বুড়ো নাকি ঠিক করেছে, সে বিদায় নিলে তার জায়গায় হিচকককেই বসাবে। রেগীর বিশ্বাস এ সেই-বুড়ী ময়নারই কাজ। হিচককের দালাল। বুড়ো কিন্তু জানে না, নিজের হাতে সে তার নিজের মরণ ডেকে আনছে। জানলেই বা কি! বুড়োর মধ্যে পদার্থ বলে তো আর কিছুই নেই। ছোবড়া। এখন তার উচিত—সরে পড়া।

মাথাটাকে পেছন দিকে ঝাঁকি দিয়ে ফেলে সামরিক কায়দায় লাগামটা টেনে ধরে রেগী আপনার মনে বলে ওঠে: 'এই অফিস, এই কারবার চালাবার একমাত্র উপযুক্ত লোক হলুম আমি।' এই স্বগতোক্তির সঙ্গে সঙ্গে তার

মনে নিবিড় আত্ম-প্রত্যয় জেগে ওঠে। চারিদিকের সুবিস্তীর্ণ লতা-গুল্মের দিকে ধীরে চোখ ঘুরিয়ে দেখতে দেখতে ভাবে, একদিন আমিই হব এসবের সর্বময় কর্তা। ভবিষ্যতের সেই সোনালী স্বপ্নে আচ্ছন্ন হয়ে যায় তার মন।

সূর্য তখন ঠিক মাথার উপরে এসে দাঁড়িয়েছে, সামনে আলোর পর্দা ঝালরের মত কাঁপছে।

মনে মনে সে ভাবে, লাঞ্চের এখনও অনেক দেরি। তবে পাতা-ঘরে গেলেই—পরখ ক'রে দেখবার জন্যে এক কাপ চা পাওয়া যাবে, হয়ত দু'একটা পেগও জুটতে পারে। সুতরাং টিপুর পিঠে চড়ে এখন সে অনায়াসে ভবিষ্যৎ জীবনের স্বপ্নে মশগুল হয়ে এগিয়ে চলতে পারে।

কিন্তু চা-বাগানের পরিচালনার ব্যাপারে, তার যা কিছু মত আজ গড়ে উঠেছে, সে উপলব্ধি না করলেও, তার অধিকাংশই সে পেয়েছে ক্রফ্‌টকুকের কাছ থেকে এবং কিছুটা সংগ্রহ করেছে ক্লাবের শাশ্বত আড্ডা-ঘর থেকে। দু'এক পেগের পর. যখন জিহ্বা আর কল্পনা বল্গা-ছেঁড়া ঘোড়ার মত ছুটতো, তখন ক্লাবের প্রত্যেক সভ্য. নিরঙ্কুশভাবে যে-যার মত জাহির করে চলতো। 'এখানে তলায় তলায় রীতিমত সিডিশন চলছে. বুঝেছ হে,'···কেউ বলতো, 'কুলিদের যেমন ক'রে হোক নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে রাখতে হবে···ছ'কড়া-ন'কড়া এখানে চলবে না!'···'আসল গণ্ডগোলের মূল ঐ সব চাটুজ্যে আর বাড়ুজ্যের দল, এখানে এসে কুলিদের দাঙ্গা-হাঙ্গামায় খেপিয়ে তুলবে আর শাসন-পরিষদের নিরাপদ আশ্রয়ে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে আকাশ ফাটাবে'···'যারা এই রকম প্রকাশ্যভাবে মানুষদের খুন করতে খেপিয়ে বেড়ায়, সেই সব হতচ্ছাড়া হতভাগাদের জেলের বাইরে রাখা হয় কেন বলতে পার? গভর্নমেন্ট এদের পা দিয়ে টিপে মেরে ফেলতে পারে না?' ইত্যাদি

এই সব ধ্বনি ও প্রতিধ্বনিতে অনুপ্রাণিত হয়েই রেগী হান্ট তার নিজের সব সমস্যা সমাধান করতে মনঃসংযোগ করে এবং তার ফলে সে একটা নিজস্ব সিদ্ধান্তও খাড়া ক'রে তুলেছিল। প্রথম প্রথম এখানে এসে

'হোমে' তার বাবার কাছে সে যে-সব ছেলেমানুষী উচ্ছ্বাস লিখে পাঠাতো, তার একটিতে সে এই সিদ্ধান্তের কথা তার বাবাকে লিখে জানায়। মহাবিজ্ঞের মত সে স্থির জেনে ফেলেছে যে তাদের দামী-দামী পোষাকের জন্তেই এদেশী লোকেরা তাদের সমীহ ক'রে চলে, তাদের বিদ্যাবুদ্ধির জন্তে সম্মান করে, আর তাদের ব্যক্তিগত গুণের জন্তে তাদের শ্রদ্ধা করে। সাহস, শক্তি আর তেজ দেখিয়ে এদের অনায়াসে বশ ক'রে রাখা যায়।

হঠাৎ এই জায়গাটায় উচ্ছ্বসিত কলম থেকে এক ফোঁটা অতিরিক্ত কালি পড়ে গিয়ে চিঠিটা কলঙ্কিত হয়ে যায়, এবং ফলে চিঠিটার কিছু সৌন্দর্য-হানিও ঘটে কিন্তু তাতে লেখকের উৎসাহ বিন্দুমাত্র ব্যাহত হয় নি। সমান উৎসাহে সে লিখে চলে,—যতই বিশ্রী হোক্ না কেন এখানকার জল-হাওয়া, আমি টলছি না, কারণ ড্যাড্‌ আমি বুঝেছি, বছরে দু'হাজার এই আবহাওয়াতেই ফলে।

সেই সম্ভাবনাই রেগীর সামনে স্বর্ণ-প্রদীপ জ্বালিয়ে রেখেছে। চলতে চলতে কাঁধটা চৌকস্ ক'রে নেয়, যেন সে মহাসম্ভাবনা সামনেই এসে গিয়েছে, তাকে বরণ ক'রে নিতে হবে। দুর্ভোগের মধ্যে, গরমে ঘাড় বেয়ে ঘাম গড়িয়ে পড়াতে, মাঝে মাঝে এই চিন্তার স্বর্ণসূত্র ছিঁড়ে যাচ্ছিল।

তবু তো এপ্রিল মাস। সামনে আসছে মে। হয়ত আরও অসহ্য গরম পড়বে সেই গরমে ঘুরে ঘুরে এই তদারক ক'রে বেড়ানো, অসম্ভব কঠিন ব্যাপার। কড়াই মাংস যেমন সেদ্ধ হয়, তেমনি সেদ্ধ হয়ে যেতে হবে। আর তারা তখন 'হোমে' নিশ্চিন্ত আরামে বসে বলাবলি করবে, আহা কি মনোরমই না ভারতের বসন্ত। বসন্ত! রক্ত-চোষা মশা আর মাছির আড্ডা! তার ওপর আছে ম্যালেরিয়া। দোহাই ভগবান, ম্যালেরিয়া যেন তাকে না ছুঁতে পারে। গত বছরে হাড় কাঁপিয়ে দিয়েছিল একবার, কিন্তু তাতেই সেবার রেহাই পেয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সে তো কাছাকাছিই ঘুরছে ফিরছে, ভাবতে শরীর অবশ হয়ে আসে।

এতক্ষণ ধরে কেউ কাজ করতে পারে? সকাল সাড়ে আটটা থেকে দুপুর একটা। সাড়ে আট-টা না হোক, ন'টাই না হয় হলো। ন'টার আগে কোনদিন সে অফিসে গিয়ে পৌঁছতে পারে না। বুড়ো ক্রফ্‌টকুক্‌ তখন তাকে দেখিয়ে দেখিয়ে ঘড়ি দেখবে! প্যাচে কতি বুড়ো হাড়গিলের মন··· এতটুকু কোথাও নজর এড়িয়ে যাবার উপায় নেই। এতক্ষণে বোধ হয় বারোটা বেজে গিয়েছে। হাঁ, এই তো একদল কুলি ঝুড়ি নিয়ে কারখানার দিকে চলেছে। উঃ! কারখানার ভেতর এখন নরক-কুণ্ড জ্বলছে। এধারে মেশিন চলেচে, ওধারে মাথার ওপরে টিনের ছাদ ফুঁড়ে আগুন নামছে।

সহসা চিন্তার গুটি ভেঙে সে টিপুকে সম্বোধন ক'রে ওঠে: 'ভালা-মোর টিপুরে, চল তো খুকী এবার একটু ছুটে চলি! খুকী কিন্তু নাক দিয়ে নানারকমের শব্দ করতে শুরু ক'রে দেয়। প্রভুর আদর-মাখা কণ্ঠস্বর বুঝতে তার এতটুকু দেরি হয় না, তার কারণ সে সত্যিই প্রভুর প্রেমে পড়ে গিয়েছে। তাই আদরে তার গতি মন্দীভূত হয়ে যায়। কিন্তু হঠাৎ অনুভব করে, পাঁজরে লোহার গুঁতো···তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারে প্রভুর ভাষার তাৎপর্য। সারি সারি দল বেঁধে মাথায় ঝুড়ি নিয়ে চলেছে কুলি-কামিনরা···তাদের গা ঘেঁষে ছুটে চলে টিপু।

দূর থেকে সাহেবকে আসতে দেখে, কারখানার দরজায় গুর্খা প্রহরী সামরিক কায়দায় পায়ে পা ঠুকে, সঙ্গীন যথারীতি খাড়া ক'রে সাহেবকে সামরিক অভিবাদন জ্ঞাপন করে।

রেমীও প্রত্যুত্তরে তার সামরিক দিনের স্মৃতি অনুযায়ী অভিবাদন জানায়। হঠাৎ এই সামরিক আবহাওয়ার সংস্পর্শে অন্তর উল্লসিত হয়ে ওঠে। চারিদিকে এই নোংরা লোকগুলোর বিশৃঙ্খলার মধ্যে বলবন্ত সিং থাপাই হলো একমাত্র কাজের লোক!

যুদ্ধ যারা করে, তাদের রেমী স্বভাবতই প্রীতির চোখে দেখতো। সে জানতো, জগতে খুব কম সৈন্যই আছে, যারা গুর্খাদের মত কুকরী চালাতে

কিংবা গুলি ছুঁড়তে পারে। তাই দারোয়ান হলেও, রেগী মোলায়েম সুরেই তার কুশল জিজ্ঞেস করে: 'আছ্‌হা হ্যাঁয়?'

বলবন্ত সিং-এর হাতে টিপুকে ছেড়ে দিয়ে, রেগী কারখানার শেডের দিকে এগিয়ে চলে।

শেডের বড় ঘরে, ওজন করবার যন্ত্রগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে টুইটি তখন প্রত্যেকের ঝুড়ি ওজন ক'রে দেখছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে খাতায় লিখে রাখছিল।

টুইটির দিকে এগিয়ে যেতে যেতে, তার পরিপুষ্ট গোল মুখের দিকে চেয়ে রেগী ভাবে, আচ্ছা লোক এই টুইটি! ইঞ্জিনীয়ার না হয়ে, কোন কোম্পানীর ঘুরে-বেড়ানো এজেন্ট হলে পারতো!

'হ্যালো রেগী!' টুইটি সম্বোধন জানায়।

'হ্যালো! ক'টা চোর আজ ধরলে?' রেগী জিজ্ঞেস করে।

খানিকটা বিরক্ত হ'য়ে, খানিকটা রসিকতা ক'রে টুইটি জবাব দেয়: 'শালীরা ঝুড়ির ভেতর আজকাল ইঁটের বদলে শেপলা-মাখা কাঠ পুরে রেখে ঠকাবার ফিকির করছে। এক শালী নিজের ছেলেটাকে রেখেছিল হে! ছেলেটা পাতা চাপা পড়ে দম আটকে মারা যায় আর কি! ধরা পড়তে যখন জিজ্ঞেস করলুম, কেন করেছিলি? সটান জবাব দিল, পাতা তোলবার সময় অন্ত কোথাও রাখতে জায়গা পায় নি বলে ঝুড়িতে রেখেছিলাম। হারামজাদী শয়তানী!'

'যেমন বদমায়েস তেমনি সাজা দেওয়া উচিত। সমস্ত মাইনে কেটে নাও।৷৷ আর যারা যারা এর মধ্যে আছে, প্রত্যেকের মাইনে থেকে তিন আনা ক'রে কেটে নাও। দলের সব ক'টাই পাজী বদমায়েস। হারামজাদীরা ভেবেছ শুধু এখানেই তোমাকে ঠকায়, তা নয়, বিছানাতেও অমনি ঠকায়, পাছে ভুলে দিয়ে ঠিক সময় মইটি কেড়ে নেয়!'

হঠাৎ থেমে যায়, যেন আরও কিছু মন্তব্য করবে। কিন্তু টুইটির সঙ্গে এসব কথা বলে কোন লাভ নেই, এত অল্প কথা সে বলে, এবং সেই

অল্প কথায় আড়ালে রেণী বুঝতে পারে, লোকটা তাকে কিঞ্চিৎ ভুলভাবেই রেখে।

এই রসিকতায় ছলে রেণী বলে ওঠে: 'চুপ ক'রে আছ কেন বাছাধন, বলই না…'

'কি বলবো?'

'তাই তো, কি জিজ্ঞেস করছিলাম, ভুলে যাচ্ছি…'

'অতএব ভাল ছেলেটির মতন, যে-ঘরে পাতা শুকোচ্ছে, সে-ঘরে একবার যাও…দেখ, ঠিকমত তারা কাজ করছে কিনা!'

ব্যঙ্গভরে সেলাম ক'রে রেণী বলে ওঠে: 'তথাস্তু প্রভু!'

মাঝখানের দরজা দিয়ে সে বেরিয়ে পড়ে। সেখান থেকে সিঁড়ি বেয়ে দু'তলার ঘরে গিয়ে ওঠে। পাতা শুকোবার জন্যে বিশেষভাবে এই সব ঘর তৈরী, কাঠের মেঝে, ইস্পাতের ফ্রেমে আঁটা, লোহার-পাতের ছাদ। ঘরের মধ্যে সারি সারি তারের জালে ঢাকা শতশত থাক, এক ফুট অন্তর এক গজ ক'রে চওড়া। ঘরের মধ্যে কুলি-কামিনরা ঝুড়ি-ভর্তি যে-সব পাতা রেখে গিয়েছে, কুলিরা সেগুলো নিয়ে পাতলা ক'রে তারের জালের ওপর বিছিয়ে দিচ্ছে।

রেণীকে দেখে ঘরের সর্দার অভিবাদন জানায়।

'কাজ ঠিক চলছে?' রেণী জিজ্ঞেস করে।

'জী, হজুর!'

সামনের শেডের দিকে আঙুল দেখিয়ে রেণী জিজ্ঞেস করে:

'মিস্ত্রী ওখানে আছে এখন?'

'জী, হুজুর!'

'পাতাগুলো লোকে গুঁড়িয়ে একেবারে যেন ধুলো না ক'রে ফেলে… বা বলে, আয়! কালকে যে-সব প্যাকেট হয়েছে, তার চা ভাল ছিল না।'

অত্যন্ত সম্ভ্রমের স্বরে তদারককারী জবাব দেয় : 'পয়লা পাতা কি না হুজুর! তাই একটু খারাপ হবে। এপ্রিলে যাসে যে সব পাতা তোলা হয়, সেগুলো স্বভাবতই একটু কাদচে আর নরম থাকে। গ্রীষ্ম আরও একটু বাড়লে, আপনা থেকেই পাতা উৎরোতে থাকবে।'

পাশের ঘরে শান-বাঁধানো মেঝেতে সেদ্ধ পাতা বিছিয়ে রাখা হয়েছে। সেখানে গিয়ে তদারক করতে আর তার ধৈর্যে কুলোয় না। সেখান থেকে পাতাগুলো যায় আর-এক ঘরে, শুকোবার জন্যে। সেই অবস্থায় আধ-ভেজা চা-পাতা থেকে যে তীব্র গন্ধ বেরোয়, রেণী তা আদৌ সহ্য করতে পারে না। সুতরাং সে-ঘরও বাদ দিয়ে, সে প্যাকিং-ঘরে গিয়ে হাজির হয়। প্যাকিং ঘরে তখন কাঠের বাক্স সীসের পাত দিয়ে জোড়া হচ্ছে। রেণী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে, হুঁশিয়ার ক'রে দেয়, যাতে অতিরিক্ত পেরেক ঠোকার ফলে বাক্সগুলো নষ্ট না হয়ে যায়। যে মিস্ত্রীর ওপর প্যাকিং-এর ভার ছিল, সে লোকটা একটু বোকা-ধরনের। রেণী তাকে দেখতে পারতো না, কারখানার কাজ ফেলে, সে রাত-দিন মিসেস্ ক্রফ্‌টকুকের জন্যে এটা-সেটা তৈরি করত।

হঠাৎ রেণীর মনে পড়ে, তাই তো আজকে আর গরুর গাড়ীর মিছিল বেরুচ্ছে না···আর তা ছাড়া, ক্রফ্‌টকুকও স্টেশনে বেরিয়ে গিয়েছে, মাইনের টাকার সিন্দুক আনবার জন্যে···

ফিরে গিয়ে টুইটিকে রিপোর্ট দেয় : 'সব ঠিক আছে··· আমি চললুম এখন. কেমন বুড়ো? গরমে মাথা যেন ফেটে পড়ছে···'

টুইটি প্রত্যুত্তরে জানায় : 'ওজনটা শেষ করা পর্যন্ত যদি অপেক্ষা করতে পারো, দু'এক পাত্র দিতে পারি!'

'না থাক্, আমাকে এখন ফিরতেই হবে···'রেণী জবাব দেয়।

কারখানা থেকে বেরুবার মুখেই রেণী দেখে, এই কিছুক্ষণ আগে যে-আকাশে আগুন ঝরছিল হঠাৎ কখন সেখানে কালো কালো মেঘ জমে উঠেছে। বৃষ্টির মিষ্ট আভাসে বাতাস ভরে উঠেছে। আপনা থেকে সে দ্রুত চলতে আরম্ভ করে।

বলবন্ত সিং থাপা টিপুর লাগাম ধরে যেখানে অপেক্ষা করছিল, সেখানে গিয়ে পৌঁছতেই, মাথার ওপর মুহুর্মুহুঃ বজ্র ডেকে উঠলো, তার প্রতিধ্বনিতে সারা আকাশ অনুরণিত হয়ে ওঠে, যেন ক্ষুধিত সিংহের দল একসঙ্গে গর্জন ক'রে উঠলো। আর তাদের ভীত সন্ত্রস্ত করবার জন্যে আকাশের বুক চিরে কে বিদ্যুৎ-কশাঘাত ক'রে চলেছে।

লাগামের সঙ্গে ওয়াটারপ্রুফ কোটটি বাঁধা ছিল। তাড়াতাড়ি সেটা খুলে নিয়ে কোনরকমে গায়ে জড়িয়ে সে লাফিয়ে টিপুর ওপর উঠে বসে।

হঠাৎ এক ঝলক পাগলা হাওয়া দুর্দান্ত বেগে অরণ্য কাঁপিয়ে চলে গেল, সঙ্গে সঙ্গে আকাশের আতপ্ত আনন থেকে উষ্ণ অশ্রুবিন্দুর মত বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা দগ্ধ মৃত্তিকার ওপর ঝরে পড়লো।

হয়ত একটু অপেক্ষা ক'রে থাকলে বুদ্ধিমানের কাজ হতো, কিন্তু তার ধারণা হলো যে, বৃষ্টি পড়বার আগেই সে স্বস্থানে গিয়ে পৌঁছতে পারবে। তাই টিপুর পাঁজরায় দু-পাশে সজোরে লৌহ-অঙ্কুশের আঘাত করে…টিপু ছুটতে আরম্ভ ক'রে দেয়।

কিন্তু মাত্র শ'খানেক গজ যেতে না যেতেই, মাথার ওপর আকাশ ভেঙে বৃষ্টির ধারা নেমে এলো, এমন বিপুল ধারায় যে একমাত্র আসামের আকাশেই তা সম্ভব। ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল বেগে ঝড়ো হাওয়া সামনে থেকে তাকে ধাক্কা মেরে ছুটে যায়, তার মধ্যে সে কিছুই শুনতে পায় না, কিছুই দেখতে পায় না। কোনরকমে ঘাড় নীচু ক'রে ঝড়ের মুখেই এগিয়ে চলে আর চীৎকার ক'রে হাঁকে : 'কোই হ্যায় ?'

প্রতি মুহূর্তে তার আশঙ্কা হয়, বুঝি ঝড় তাকে টেনে নিয়ে পাহাড়ের তলায় ফেলে দেবে।

মাথার ওপর আবার ডেকে ওঠে বাজ। বড় রাস্তা থেকে, ধান ক্ষেতের পাশ দিয়ে একটা সরু রাস্তা ধরে তার বাড়ীতে তাড়াতাড়ি পৌঁছনো যায়। অভ্যাসবশত টিপু সেই রাস্তায় ঢুকে পড়ে। ঘন ঘন বিদ্যুৎ ঝলকে সহসা মনে

য়ে, সমস্ত উপত্যকাটাকে স্বর্ণে আর সবুজে গলিয়ে কে যেন বিচিত্র এক সঙ্কর নব-রঙের সৃষ্টি করেছে। ডেকে ওঠে মেঘ…দূরে জাগে আর্তনাদ… াজোরে মাথার ওপর কে যেন করে আঘাত…কেটে হাজার টুক্‌রো হয়ে ছড়িয়ে পড়ে আওয়াজ যেন ছিন্ন হয়ে যায় আকাশ ও ধরণীর মিলন-দিগন্তরেখা। ভীত আতঙ্কতচিত্তে ভাবে, বুঝি আজ পৃথিবীর শেষ দিন…সেই সঙ্গে তারও। তবুও নিজেকে অবিচলিত রাখতে চেষ্টা করে। বৃষ্টি-আহত দৃষ্টিতে চেয়ে দেখে, তার সামনে আকাশ আর পৃথিবী-জোড়া জলের ধারা, আর তার বাহনের সামনে শুষ্ক পথে সন্ত-জাত দুরন্ত গিরি নির্ঝরিণী।

দেখে, সেই জলের মধ্যে, দলে দলে কুলিরা, পরনে কোমরের কাছে শুধু এক টুকরো কাপড় জড়ানো, কাঁধে লোহার নিড়েন, ক্ষেতের দিকে এগিয়ে চলেছে। বৃষ্টির সময় পাহাড়ের গা থেকে লতা-পাতা ছিঁড়ে এসে মাঠ ভরিয়ে তোলে, সঙ্গে সঙ্গে তাদের ঝেঁটিয়ে ফেলে দিতে হবে।

অসহায় শিশুর মত রেগী চীৎকার ক'রে ডাকে : 'কোই হ্যায়—!'

ঝড় আর জলে তার কাতর আহ্বান ভেসে চলে যায়।

সৌভাগ্যবশত কয়েকজন কুলির হঠাৎ সেই দিকে নজর পড়ে। তক্ষুনি তারা ছুটে এসে লাগাম ধরে বাংলো পর্যন্ত তাকে পৌঁছে দেয়।

ঘোড়া থেকে নেমে বারান্দায় উঠতে উঠতে আপনার মনে সে গর্জে ওঠে :

'নরক! আস্ত নরক!'

এই কিছুক্ষণ আগে, যে মৃত্যুভয় মনকে একেবারে পেয়ে বসেছিল, নিজের নিরাপদ আওতায় দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে তা ভূতপূর্ব হয়ে গেল; মনে মনে আফসোস জমা হয়ে ওঠে। যে ঝড়ো আবহাওয়ার জন্তে এই আসামের জঙ্গলে চা ফলে এবং যার দৌলতে তাদের সিন্দুক ভরে ওঠে টাকায়, হায়, তা যদি এত কঠোর না হতো!

'সালাম, সাহেব!'

ছুরিয়া ফিরে যাবার জন্যে আবার ঝড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ে···মাথা নীচু ক'রে পিছল মাটির উপর সন্তর্পণে পা ফেলে ফেলে তারা ঝড়ের মধ্যে মিশে যায়।

তখনও পর্যন্ত বেণীর মেজাজ ঠিক ধাতস্থ হয়ে ওঠে নি। তাই ছোট ছেলের মত সে চীৎকার ক'রে ওঠে : 'টিফিন!'

আফজল সসম্ভ্রমে জানায় : আগে পোষাক বদলান হুজুর···তারপর, একটু পেগ খান · টিফিন তার মধ্যেই হাজির হয়ে যাচ্ছে · '

বেতের চেয়ারে উপবিষ্ট মনিবের পায়ের বুটের ফিতা খুলে দিতে এগিয়ে আসে।

কয়েক মুহূর্তের জন্যে মনে দ্বন্দ্ব জাগে, বার বার এই লোকটির কাছ থেকে এইভাবে ব্যক্তিগত সেবা পাওয়ার দরুন একটা কৃতজ্ঞতার দায় তাকে খোঁচা দেয়। কিন্তু বেশীক্ষণ তা থাকে না। আফজলের সেবা নিরঙ্কুশভাবেই গ্রহণ করে।

আফজল আর তার মধ্যে একটা চমৎকার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। সে মনিব আর আফজল তার চাকর, তার সেবক, পরস্পর সহজভাবেই সেটুকু স্বীকার ক'রে নিয়েছিল। সেইজন্যে আফজলের প্রতি তার দাক্ষিণ্যের কোন ত্রুটি ছিল না। সময়ে-অসময়ে প্রচুর বকশিশ সে পেতোই, তা ছাড়া, তার পুরনো বুট, পোষাক, এটা সেটা···অনেক জিনিসই তার ভাগ্যে জুটে যেতো। ছুটির দিনে প্রভুর পরিত্যক্ত সেই পোষাকে সুসজ্জিত হয়ে সে সন্ধ্যা-বিহারে বেরতো। এমন কি জিমখানা ক্লাবে খেলবার জন্যে সাহেবের নতুন পোলো টিকও সে ব্যবহার করতে পেতো। সাহেবী পোষাক ছেড়ে কখন আবার বাবুর্চির পায়জামা পরতে হবে, তা আফজলের বেশ ভাল ক'রেই জানা ছিল। সাহেবের কাছ থেকে সে এই যে সব সুবিধা পেতো তার বদলে সে নিখুঁত-ভাবে শিখেছিল, সাহেবের মেজাজ খারাপ থাকলে কি ক'রে তার তোয়াজ করতে হয়। বিদ্যা হিসাবে সে তা শিক্ষা করেছিল।

। পাঁচ ।

লীলার ফরমাশ হলো, একটা নেকলেস, একটা নাকছাবি আর বুড়োর বউ যে-রকম কাঁচের চুড়ি পরেছে, সেই রকম এক জোড়া রেশমী চুড়ি।

বুধু বললো: 'বাবুর যে রকম রঙীন ডাকঘার বল আছে, তার চাই ঠিক সেই রকম একটা বল।'

সজনীর ইচ্ছা এখানে দোকানে জিনিস-পত্রের দর যে-রকম মাগ্‌গি, তাতে মেলা থেকে, একসঙ্গে কিছু বেশী ক'রে ঘর-সংসারের জিনিস কিনে রাখাই উচিত।

গজু কিন্তু নানারকম অজুহাত দেখিয়ে, আজ নয় কাল বলে, এড়িয়ে চলে।

তবে রবিবার তাকে রাজী হতেই হলো। এই একটি দিন সাহেবদের সঙ্গে সঙ্গে কুলিরাও ছুটি পায়। সজনীকে নিয়ে গজু বাজার করতে বেরিয়ে পড়ে, তাদের চা-বাগান থেকে মাইল ছয়েক দূরে বেথি বলে একটা গাঁ আছে, সেইখানে বড় মেলা বসে।

বেরুবার সময় বুধু গজুর পা জড়িয়ে ধ'রে আবদার করে:

'বাবা, আমিও যাব।'

গজু বারণ করে: 'সে কি এখানে রে? অনেক দূরের পথ, তুই যেতে-আসতে পারবি কেন? আর তোকে কাঁধে ক'রে নিয়ে যাব, এমন শক্তি তোর মারও নেই, আমারও নেই!'

কিন্তু বুধু তা মানে না। বলে: 'তুমি দেখো, আমি পারবো…ঠিক পারবো…আমি বলছি, আমাকে কাঁধে করতে হবে না…দেখবে পালোয়ানের মত আমি হেঁটে যাবো!'

সজনী পুত্রের হয়ে মিনতি করে: 'নাও, নাও, সঙ্গে নাও! সারা হপ্তা ধ'রে বল্ বল্ ক'রে আমাকে বিরক্ত ক'রে মারছে…যা হোক একটা কিছু কিনে দিতেই হবে।'

ঘরের ভেতর চেয়ে দেখে, লীলা ঘাড় নীচু ক'রে চুপটি ক'রে বসে আছে লজ্জায় সে মুখ ফুটে বলতে পারে না, এমনকি চোখের চাউনিতেও ধরা দিতে চায় না, যাবার জন্যে কি আকুলিবিকুলি করছে তার মন।

গম্বু বুঝতে পারে। বলে : 'তা বুদ্ধু যখন যাচ্ছে, তুইও তাহলে চল্, জানি না, ঘর-দোরে কে নজর রাখবে!'

সজনী বলে ওঠে : 'আমি বরক নারাণের বউকে এদিকে একটু নজর রাখতে বলে যাচ্ছি।'

গম্বু বাধা দিয়ে বলে : 'তার দরকার নেই। টাকা-পয়সা যা আছে সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেলেই হবে। বাজারে হয়ত দরকার লাগতে পারে তা ছাড়া ঘরেতে এমন কিছু নেই যে লোকের নিতে সাধ যাবে। কত আছে ঘরে?'

সজনী ঘরের কোণে চিমটে দিয়ে একটা ইট তুলে তাদের তহবিল বার করে। একটি একটি ক'রে গুণে বলে : 'সাত টাকা আর কয়েক আনা...'

গম্বু মনে মনে হিসেব ক'রে নেয়, এখানে আসবার সময় বুটা পথ খরচার জন্যে যা দিয়েছিল, তা থেকে পাঁচ টাকা বাঁচে...তা হলে বাকি থাকে দু'টাকা কয়েক আনা...'কি বলছো, এই ক'দিনে তা'হলে আমরা সবাই মিলে রোজগার করলুম মাত্র দু'টাকা আর এই কয়েক আনা?'

সজনী জবাব দেয় : 'তা কেন? শেঠ কাশ্মলের দোকান থেকে কিছু জিনিসপত্তর আমাকে কিনতে হয়েছে...তা ছাড়া এই ক'দিন, তো সংসার-খরচ চালাতে হয়েছে...মনে ক'রো না যে আমি পয়সা চুরি ক'রে সরিয়ে রেখেছি!'

সে-কথা গম্বুর মনে হয় নি। শুধু সেই মুহূর্ত বলে নয়, এই ক'দিন ধরেই সে ভাবছে, বুটার ধাপ্পার কথা...বেশী মাইনে...বোনাস...খরচ-খরচা বাদে হাতে দেখবে মোটা পুঁজি জমা হয়ে যাবে...এই সব আশ্বাস যে কত মিথ্যা, তার প্রমাণ প্রতিদিনই তার মনে জমা হয়ে উঠছিল। বোনাসের ব্যাপারটা সে আজ বুঝতে পেরেছে...তাদের এখানে ভুলিয়ে আনবার জন্যে সাহেবদের

কাছ থেকে বুটা মোটা রকমের একটা ঘুষ পাব···তাই থেকে খানিকটা সে বোনাস বলে তুলিসের জেব। সেই বোনাসের টাকাটা ছাড়া, এই সাড়ানিকে সপরিবারে তারা কতটুকুই বা উপার্জন করতে পেরেছে? সকলের দিয়ে দিনে গড়পড়তা আট-আনাও হয় না। তার তিন আনা, মেয়ে আর বউ-এর মিলিয়ে দু'আনা, আর ছেলের তিন পয়সা। এই হলো গড়পড়তা তাদের আয়। মনে পড়ে, তার নিজের জমি যখন মহাজনের ঘরে চলে গেল, তখন জমিদারের ক্ষেতে জন-মজুরী খেটে সে একাই তো দিনে আট আনা ক'রে রোজগার করেছে। আর জমির কথা! কাগজে সই করবার সময় সে তো নিজের কানেই শুনেছে সাহেবকে বলতে, তাদের দেবার মত কোন জমিজমা এখন আর নেই। মজুরী হিসাবে সে যা পাচ্ছে, তার চেয়েও যদি কম পেতো, তাতেও তার কোন দুঃখ ছিল না, যদি সে নিজের জন্তে একটুকরো জমি পেতো! তাতেই সে খেটে তার পেটের যোগাড় ক'রে নিতো।

সজনী বুঝতে পারে, নীরবে লোকটা মনে মনে কি ভাবছে। তাই ব'লে ওঠে: 'তার ওপর কি অবিচার ভেবে দেখো! ছোট ছেলেটার দু'দিনের রোজ কেটে নিল গো···তার অপরাধ, মিস্ত্রী বললো যে তার পাতা কাটা ভাল হয় নি!'

গঞ্জু বলে ওঠে: 'তা হলে কি ক'রে ওকে বল্ কিনে দেবো বল? ও বরঞ্চ বাড়ী থাক্—'

হঠাৎ মূল প্রস্তাবের পরিবর্তনে বুদ্ধু রেগে ফুলে কেঁদে ওঠে, চীৎকার ক'রে জানায়: 'আমার বল চাই-ই চাই! আমি কোন কথা শুনবো না!'

গঞ্জুকে রাজী হতেই হয়। বলে: 'বেশ, বেশ, তাই হবে, কাঁদতে হবে না। তবে মনে রেখো, আট বছর তোমার বয়স হলো···কচি খোকাটি আর নও যে যখন-তখন যা খুশির জন্তে বায়না ধরে কাঁদবে···'

বুদ্ধুর হাত ধরে গঞ্জু বেরিয়ে পড়ে।

পথ চলতে চলতে বুদ্ধু জিজ্ঞেস করে: 'আমরা কোথায় এসেছি, বাবা? জায়গাটার নাম কি?'

৬

গজু উত্তর দেয় : 'এ জায়গাটার নাম হলো আসাম। লোকে বলে এর উত্তরে খানিকটা গেলে নাকি তিব্বত আছে, পুবে চীনাদের দেশ···দক্ষিণে বর্মা···আর পশ্চিমে বাংলা দেশ।'

শিশুর স্বভাবসুলভ ক্রমবর্ধমান কৌতূহলবশত বুদ্ধু একটার পর একটা প্রশ্ন ক'রে চলে : 'আচ্ছা, বাবা, আমরা এখানে এসেছি কেন?'

'পেটের ভাত রোজগারের জন্যে বাবা!' গজু জবাব দেয়।

কিন্তু সেই উত্তরের সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ তার মনের মধ্যে যেন একটা দুর্ভেদ্য পর্দা পড়ে যায়···তাকে এড়িয়ে কোন শব্দ আর তার কানে এসে পৌঁছোয় না। কি যেন অনিশ্চিত দুশ্চিন্তায় ডুবে যায় সব চেতনা। পথের পাশে বসে পড়ে, দেখে মাইলের পর মাইল ব্যাপ্ত, তাদেরই হাতে গড়ে-তোলা ঘন-সবুজের অপূর্ব বিস্তার। এই পাহাড়ে বুনো দেশে, যারা কল-[illegible] দিয়ে এরকম সুন্দর চাষবাস গড়ে তুলতে পেরেছে, তাদের শক্তির কথা [illegible], আপনা থেকে সে বিস্মিত হয়ে যায়। সেদিন সে নিজের চোখে দেখেছে [illegible]ঞ্জিনিয়ার সাহেব মস্ত বড় একটা কলের লাঙল নিয়ে জমি চষছে। এ[illegible]ন সেই অপূর্ব বিস্ময় সে দেখছিল, এমন সময় তার কানে এসে সূচের ম[illegible] [illegible]ধলো ছোট সাহেবের চাবুকের আওয়াজ[illegible] সেই নিষ্ঠুর ঔদ্ধত্যে ছি[illegible] টুকরো টুকরো হয়ে গেল তার দিবাস্বপ্ন। [illegible]কন এমন হয়? নিজের মধ্যে এই আপাত-দ্বন্দ্বের মীমাংসার চেষ্টা কর[illegible]গিয়ে বিস্ময়ে সে নিজেকে [illegible]জ্ঞেস ক'রে ওঠে, আমাদের ভাবনা-চিন্তা [illegible] সাহেব কি কিছুই জানে না? জানতে চায় না। যে বিলাত থেকে [illegible]ই সব অদ্ভুত জিনিস তৈরী হ'য়ে আসছে, সেখান থেকেই কি এরা আসে? না, সে আলাদা আর-একটা বিলাত? সব সাহেব কি এখানে এমনি মিথ্যা দিয়ে ভুলিয়ে কুলিদের ঘর-ছাড়া ক'রে আনে? ধাপ্পাবাজীকেই কি তারা ধর্ম বলে জানে? যারা বুটার মতন চোর-বদমায়েস, তাদের বিচারেও কি তারাই ভাল? বুটার মত নির্লজ্জ সবজান্তা লোককেই কি এরা সর্দার করে? নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির

জন্যে যে কোন পাপ করতে কি এদের বাধে না? ভাল মানুষ যারা, তারা কি এখানে মরবার জন্যেই আসে? এ পৃথিবীতে তাহলে বদমায়েসরাই শুধু বেঁচে থাকবে?

হঠাৎ পথের ধারে একটা ঝর্ণার দ্রুত শব্দে তার চিন্তার সূত্র ছিন্ন হয়ে যায়। দেখে, তাদেরই মতন একদল কুলি সাঁকোর ধারে বসে বিশ্রাম করছে। সাঁকোর ওপর দিয়েই সেই গাঁয়ে যাবার পথ চলে গিয়েছে।

গঙ্গুর দিকে এগিয়ে এসে, সজনীকে শুনিয়ে শুনিয়ে লীলা বলে: 'দেখছো মা, সবাই বাজারে চলেছে!'

সেই চলমান জনতার মধ্যে সে-ও একজন, তারা আজ সবাই চলেছে এক পথে গাঁয়ের বাজারে, সেই সামান্য ঘটনা আজ অপরূপ হয়ে লীলার কিশোরী-চিত্তকে দোলা দিতে থাকে। মনে হয়, যেন সে চলেছে উৎসবে। অপরূপ বিস্ময়ে প্রতিটি লোক তাকে আকর্ষণ করে। এখনও পর্যন্ত সে বুঝে উঠতে পারে নি, ঠিক কোন্ জাতের মধ্যে তারা এখন বাস করছে। সেই বহু জাতির বহু বৈচিত্র্যের মধ্যে তার দৃষ্টি বৃথাই সমতার সন্ধান ক'রে ফেরে। কারুর রঙ মোষের কাঁধের মত কালো, নাক চেপটা; কারুর গায়ের রঙ হলদে, চওড়া চোয়াল, সীমের মত বড় টানা টানা চোখ; কারুর বা ইয়া বড় নাক, কারুর বা ফাটা ফুটির মত ফেটে গিয়েছে চামড়া। এই বিচিত্র জনতার মধ্যে সে লক্ষ্য ক'রে দেখে, খুব অল্প লোকই আছে, যাদের গড়ন আর চেহারার মধ্যে একটা সুসামঞ্জস্য রয়েছে। সাঁকোর কাছে যে দলটি বসেছিল, তাদের কাছাকাছি আসতেই, কেমন যেন ভীত সঙ্কুচিত হয়ে সে গঙ্গুর গা ঘেঁষে চলে। কিন্তু সাঁকো পেরিয়ে গাঁয়ে যাবার গরুর গাড়ীর রাস্তায় এসে ভিড়ের মধ্যে তারা মিশে যায়। ক্রমশ তার আতঙ্কও কমে আসতে থাকে।

কোথাও কুলিরা দল বেঁধে যেতে যেতে হঠাৎ সবাই মিলে একসঙ্গে গেয়ে উঠলো। সেই গানের সুরে লীলা আনমনা হয়ে পড়ে। ভেতরের দিকে

চেয়ে তার মনের আঁধার-আকাশে দেখে এক ফালি একটুখানি আলোর রেখা ...অতি সযত্নে ঘিরে রেখেছে জীবনের একটি স্মৃতি। একে একে মনে পড়ে বাধাবন্ধনহারা শৈশবের দিনগুলি, যখন পড়শী ছেলেরা মাঠে মাঠে ছাগল চরিয়ে বেড়াতো আর সে তাদের সঙ্গে পরমানন্দে খেলা করতো; সে-সব দিনের কথা পেরিয়ে এসে এক জায়গায় তার ভাবনা দাঁড়িয়ে পড়ে···যেদিন তাদের গাঁয়ের গুরুমশায়ের ছেলে যশবন্তের সঙ্গে সে বেড়াতে বেরিয়েছিল। যশবন্তের বিমাতা বাড়ী থেকে তাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। সেই শোকে তার সঙ্গীরূপে লীলা সেদিন বনে বনে তার সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়। তার নিজের দেশের সেই সব পাহাড় আজকের এই পাহাড়গুলোর মতনই, তবে হোশিয়ারপুরের পাহাড়ের চারদিকে এত বন-জঙ্গল ছিল না। খাদ্যের অন্বেষণে ছাগলগুলোকে বহু ঘুরে উঠে পাথরের ফাটলে ফাটলে তৃণশষ্প সংগ্রহ করতে হতো। একবার তারা পথ হারিয়ে ফেলে; বিভ্রান্ত হয়ে পথ খুঁজতে খুঁজতে, লীলার মনে পড়ে, হঠাৎ একটা শ্যাওলা-মাখা পাথরে পা পড়তে সে পিছলে পড়ে যায়। পেছন থেকে যশবন্ত ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে ধ'রে ফেলে, নইলে সে-যাত্রা তার আর রক্ষা ছিল না। ভয়ে তার সর্বশরীর পাথর হয়ে গিয়েছিল। সেই সময় এক ঝলকের মত তার মনে হয়েছিল, মার বকুনির কথা···তার চেয়ে বেশী ক'রে তার মনে হয়েছিল, তাকে জড়িয়ে ধ'রে যশবন্তের কান্না। মার বকুনি এমন কি প্রহার পর্যন্ত সে নীরবে সহ্য করতে পারতো কিন্তু যশবন্তের চোখে জল, সে নিজে না কেঁদে কিছুতেই সহ্য করতে পারতো না। সেই ম্লান ছোট্ট মুখটিতে সেই দু'টি বিষণ্ণ কালো চোখ তার বড় ভাল লাগতো। একান্তভাবে সে কামনা করতো, যদি যশবন্ত তার ভাই হতো, তার সত্যিকারের নিজের ভাই। চোর-চোর খেলবার সময় যশবন্ত কিন্তু তাকে ধরবার জন্তেই বন্দী ক'রে ফিরতো এবং ধরতে পারলে এমনভাবে তাকে জড়িয়ে ধরতো যে তার দেহের ভিতর হাড়ে গিয়ে লাগতো। আর অষ্ট-প্রহর তাকে কি জ্বালাতনই না করতো, উড়নি কেড়ে নিত, হঠাৎ পেছন দিক্

থেকে এসে চোখ টিপে ধরতো, যতক্ষণ না বলতো সে কে, চোখ ছাড়তো না। হায়, সে আজ কোথায়? কি করছেই বা এখন? কেন যে ছাই তার বাবা নিজের ঘর-বাড়ী ছেড়ে এই দূর দেশে চলে এলো, সে কিছুতেই বুঝতে পারে না। যদিও ইদানীং দেশে বাড়ী থেকে বেরুনো তার নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল, পড়শী ছেলেদের সঙ্গে তার মা তাকে মিশতে দিত না, কচিৎ কদাচিৎ যশবন্তের দেখা সে পেতো, তবুও এক গাঁয়ে তো তারা ছিল···

স্ত্রীর দিকে ফিরে গঙ্গু বলে: 'পাহাড়ের ওপার থেকে ঐ যে ঘণ্টার শব্দ আসছে, শুনতে পাচ্ছো গা? কৈলাস পর্বত পার হয়ে যাত্রীরা যাচ্ছে লামার দেশে···জান তো, লামা হলো অমর?'

বিস্মিত হয়ে লীলা বলে ওঠে: 'অমর? চিরকাল কি ক'রে বেঁচে থাকে বাবা?'

গঙ্গু জবাবে বলে: 'তাইতো লোকে বলে বাছা···যে লামা হয়, সে কখনো মরে না!'

কিন্তু এই অদ্ভুত সৌভাগ্যের কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে গঙ্গু নিজের মনে ভাবে, নিশ্চয়ই ভগবানের নির্দিষ্ট লোক তিনি···তাঁরই ইচ্ছায় তিনি অমর। হয়ত এ সৌভাগ্য জগতের মধ্যে শুধু তিনি একাই লাভ করেছেন। তবুও তার মনের মধ্যে প্রশ্ন জাগে, কি ক'রে তা সম্ভব হলো? এতকাল সে এই পৃথিবীতে বাস করছে, এমন সৌভাগ্যময় একটি প্রাণীকেও তো সে দেখে নি···অবশ্য এই পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, মাথার ওপরে ঐ আকাশ, মনে হয় অনাদি অনন্ত। কিন্তু তাদেরও মধ্যে তো সে দেখেছে বিকার···মনে পড়ে যখন সে বালক, সেই সময় কাংড়া অঞ্চলে একবার ভূমিকম্প হয়েছিল, তার ধাক্কায় পাহাড়-পর্বত দুলে উঠেছিল···কত নদী সে দেখেছে, শুকিয়ে গিয়েছে···কত অরণ্য নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। ভাবতে তার মনে সন্দেহ জাগে, হয়ত এটা একটা গল্প-কথা কিংবা হয়ত লোকটি এমন কোন যাদু জানে যার ফলে অনন্তকাল ধরে সে মৃত্যুকে এড়িয়ে চলে। সে যাই হোক,

এর সঙ্গে ভগবানের নিশ্চয়ই কোন সংশ্রব নেই। কারণ তাদের গাঁয়ের বামুন-ঠাকুরের মুখে সে শুনেছে ভগবান নির্বিকার···সর্বভূতে তিনি আছেন অথচ কোন কিছুই তিনি নন্। কোন দিন তার নিজের জীবনে সে প্রত্যক্ষভাবে সেই রহস্যময় অস্তিত্বের কোন পরিচয় পায় নি বটে তবু যখনি কোন বিপুল সুখে কিংবা কোন ভীষণ দুঃখে, অথবা কোন প্রিয়জনের মৃত্যুতে সে অভিভূত হয়ে পড়েছে, তখনি নিজের ভেতরের দিকে চেয়ে, কিংবা আশে-পাশের লোকজনের মুখে-চোখে সে এমন একটা তীব্র অনুভূতির স্পর্শ অনুভব করেছে, যার বিরাট শক্তির কাছে পরম বিস্ময়ে সে আপনা থেকে নতজানু হয়েছে। কিন্তু সেই অদৃশ্য অনুভূতিই কি ভগবান? সজনীকে সে দেখেছে রাত-দিন নুড়িকে পুজো করতে···সেই সামান্য নুড়ি কখনই ভগবান হতে পারে না। ভগবান বলে তাহলে কিছু নেই, কিছু থাকতো না। শুধু আছে মানুষ আর মানুষের এই সংসার···মস্ত বড় একটা দাবার ছক···সেই ছকের ওপর চালের হেরফের ক'রে মৃত্যু শুধু আপনার মনে তার কাজ গুছিয়ে চলেছে। সমস্তই হলো মৃত্যুর খেলা, পণ্ডিতেরা যাকে বলে লীলা। মনে পড়ে একদিন এই মায়ার খেলার কথা তার মনে এমনভাবে গেঁথে গিয়েছিল যে যেদিন তার শিশু-কন্যা জন্মগ্রহণ করে, তার কচি মুখের হাসি দেখে সে ইচ্ছা ক'রেই তার নাম রেখেছিল লীলা। হঠাৎ সে লীলার দিকে ফিরে চায়।

পাহাড়ের ওপর থেকে ঘণ্টার সেই স্নেহ-আহ্বানের সুরে লীলার মনে তখন এক অব্যক্ত সঙ্গীতের আমেজ জেগে উঠেছে। নিজের মনে মশগুল হয়ে আনন্দময় মহা-নীরবতায় আকাশচারী অশরীরীর মতন সে উড়ে চলেছে···

হঠাৎ পার্বতীর ছোট্ট ভাইটির ওপর নজর পড়তে সে স্নেহভরে বলে ওঠে:

'হাঁরে, পা ব্যথা করছে বুঝি? আয়, আমার কোলে আসবি তো আয়!'

নীচের দিকে আঙুল দেখিয়ে গজু জানায়: 'আর বেশী দেরি নেই···ঐ দেখা যাচ্ছে গাঁ!' সেই অঙ্গুলি-সংকেতে দেখা গেল, নীচে উপত্যকা ভূমিতে

ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কতগুলি কুঁড়ে ঘর···আঁকা-বাঁকা ছোট্ট পাহাড়ে পথটি অপস্রিয়মান স্বপ্নের ছবির মতন ধীরে ধীরে গিয়ে মিশেছে সেখানে।

ক্রমশ দূর-থেকে-দেখা সেই ছোট্ট গাঁয়ের ঘর-বাড়ী স্পষ্টতর হয়ে ওঠে ···পথের দু'ধারে দেখা দেয় সারি সারি ভেঙে-পড়া ছোট ছোট সব বিপণী··· নোংরা, অল্প-পরিসর জায়গা, ফলমূল শাকসব্জীতে ভরা। তার পাশে রঙ-চঙে মনোহারী দোকান···কোনটায় রঙীন কাপড়-চোপড় বাইরে থেকে টাঙানো··· কোনটাতে খরিদ্দার আকর্ষণ করবার জন্যে চিরুনি, ঝুটো পাথর, মুক্তা, আয়না, নানান রকম ছেলেদের খেলনা বাইরে সুসজ্জিত ক'রে রাখা হয়েছে··· পাশেই বাসনের দোকান···থালা ঘটি-বাটি থরে থরে সাজানো। তার সামনে খাবারের দোকান···আর একদিকে বাইরে থেকে মস্ত বড় সাইন-বোর্ডে ওষুধ আর সুগন্ধী দ্রব্যের বিজ্ঞাপন। তার পাশেই পথের ধারে জড়ি-বটী নিয়ে বসেছে হাতুড়ে বেদেরা···একটু দূরেই গণক-ঠাকুর পাজি-পুঁথি খুলে পথের ওপরেই বসে আছেন···সামনেই মিষ্টি-জলের দোকান···লাল, নীল, হরেক রঙের জলে ভর্ত্তি সব কাঁচের বোতল।

এই বিচিত্র দৃশ্যে লীলার মন আনন্দে ভরে ওঠে। বাপের হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বুদ্ধু ছুটতে আরম্ভ করে।

সজনী উৎসাহের আধিক্যে ছেলেকে সাবধান করবে, না সামনের দোকানের দিকে যাবে, ঠিক ক'রে উঠতে পারে না। তাই চেঁচিয়ে বুদ্ধুকে ডাকতে ডাকতে সে-ই দোকানের দিকেই এগিয়ে চলে।

···সেই জনতার মধ্যে, গদু দাঁড়িয়ে দেখে, বিচিত্র মানুষের সমাবেশ, কেউ মোটা, কেউ কঞ্চির মত সরু, মেয়েদের মধ্যে অনেকে লম্বায় তার চেয়েও উঁচু, কেউ বা আবার একেবারে বামন···কারুর সঙ্গে ছেলের দল, কারুর পিঠে পুঁটলির পর পুঁটলি···কারুর হাতে লাঠি, কারুর হাতে ছড়ি···মুখে হুঁকো··· সেই বিচিত্র বিভিন্নতার মধ্যে গদু ভাবে কোথায় কোন্ দোকানে খরিদ করা যায়?

'এই যে সাধু মহাশয়! আসেন···আসেন···'

'যা চান···তাই পাবেন···'

'এই দোকানে···আট আনায় একটা ঝাউ···'

চারদিক্ থেকে দোকানদারেরা হাঁকে···এ-ওর সঙ্গে গলায় পাল্লা দেয়···

কন্তার দিকে চেয়ে গন্ধু বলে : 'কোন্ দোকানে আটা পাওয়া যায় বুঝতে তো পারছি না? দেখি, ঐ দোকানীকে জিজ্ঞাসা করি···'

'হাঁ ভাই, খাওয়া-দাওয়ার জিনিস-পত্তর এখানে পাওয়া যাবে?'

'আরে বেটা কি চোখে দেখিস না? অন্ধ নাকি? মুক্তোর নেকলেস্ খাবার জিনিস নাকি? ঐ ওদিকে এগিয়ে যা···শেঠ কানুমলের বোনের দোকানে···সেখানে পাবি···'

বিরক্ত হয়ে চেঁচিয়ে ওঠে দোকানদার। তার দোকানে তখন একজন কুলি-কামিন্ ঝুটো পাথরের একটা মালা নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল, সেদিকে নজর রাখতে সে তখন ব্যস্ত।

'কি দেখছিস্ কি? যেমন কালা তোর মুখ, তেমনি সফেদ আমার জিনিস, বুঝলি? দূর থেকে দেখ্, হাত লাগাবি না···ময়লা হাতে আমার জিনিস নষ্ট হ'য়ে যাবে···'

ধমকে ওঠে দোকানদার।

'সেদিন এমনি ক'রে এক বেটি এক ছড়া নেকলেস্ সাফাই ক'রে নিয়ে পালিয়েছে।'

বাপের পিছু পিছু লীলাও সেই দোকানের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল কিন্তু লোকটার কথাবার্তা শুনে আর দাঁড়াতে আর সাহস হচ্ছিল না, কি জানি, তাকেও যদি অকারণে ঐ রকম যা-তা শুনিয়ে দেয়!

বুদ্ধু কিন্তু সজনীকে টানতে টানতে একটা দোকানে নিয়ে হাজির করে, সে তার বহু-ঈপ্সিত সেই উলের রঙীন বল দোকানের সাজানো জিনিস-পত্রের মধ্যে দেখতে পেয়েছে।

চীৎকার ক'রে ওঠে : 'বাবা, বাবা, ঐ যে…ঐ…রঙীন বল্‌!'

গঙ্গু এগিয়ে গিয়ে দোকানীকে দাম জিজ্ঞেস করে।

'চার আনা…একটি পাই কম নয়, বুঝলি!'

গঙ্গু অনুনয় করে : 'দু'আনায় দ্যান্‌ মশাই!'

দোকানী ঝংকার দিয়ে ওঠে :

'বললুম না, চার আনার এক পাই কম নয়? যদি নেবার মন থাকে পয়সা বার কর নইলে বিদেয় হ'…মিছে ঝামেলা করবি না…'

বুদ্ধুর হাত ধরে গঙ্গু এগিয়ে চলে। বলে : 'চল্‌, অন্য দোকানে দেখি!'

বুদ্ধু কিন্তু নড়বে না, তার ধারণা সারা জগতে ঐ একটি বলই আছে।

'ঐ বলটাই আমি নেবো…ঐ বল্‌টা…'

গঙ্গু ধমকে ওঠে : 'মেরে হাড় গুঁড়িয়ে দেবো—বল্‌!' টানতে টানতে কয়েক পা দূরে নিয়ে যায়।

বুদ্ধু চলতে চলতে ঘাড় ফিরিয়ে দেখে আর কাঁদে : 'আমি ঐ বল্‌ নেবো…ঐ বল্‌…'

বিরক্ত হয়ে গঙ্গু সজনীকে বলে : 'বলি ও-লীলার মা, যাও…যাও ঐ বল্‌টাই কিনে! তোমাদের যার যা খুশি, তাই করো…আমি ঐ বেনের দোকানের সামনে অপেক্ষা ক'রে থাকবো!'

অগত্যা বুদ্ধুরই জয় হলো। সজনী চার আনা দিয়েই বল্‌টা কিনে দেয়। মেয়ের দিকে চেয়ে বলে : 'লীলা, বল, তোর কি চাই?'

লীলা বিব্রত হয়ে পড়ে। কি চাইবে সে?

'কই মা, সে-রকম তো কোন বালা দেখছি না…সেই যে তোমাকে বলেছিলাম! নাকছাবি…বড্ড বেশী দাম হবে—নেকলেস্‌? সেও তো কম দামে হবে না? থাক্‌…'

মা অবাক হয়ে বলে :

'খুশি তোর হলো কি?' কিনুবি বলে মেলায় এলি, কি হলো তোর?'

'কই, কিছু না তো!' বলার সঙ্গে সঙ্গে লীলা যেখানে গন্নু দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল, সেই দিকে পা বাড়ায়।

অস্বীকার করলে কি হবে, সত্যি লীলার মনে এই অল্প সময়ের মধ্যে একটা পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে। মেলায় এসে, চারিদিকে মনের মতন সেই সব রঙীন জিনিসপত্র দেখে, তার ভীরু মনে কত না আশা জেগে উঠেছিল, কিন্তু বুদ্ধুর জন্যে সেই বল্টা কেনবার সময় হঠাৎ সে বুঝতে পারে, অর্থের অভাবে তার বাবার অন্তর-পীড়া। সেই অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গে তার মনের সব আশা ম্লান হয়ে যায়, ছোট্ট ভীরু পাখী সেই মুহূর্তে তার ডানা গুটিয়ে নেয়। মনে পড়ে, বাড়ী থেকে বেরুবার সময়, দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে তার বাবা যখন জিজ্ঞাসা করেছিল, কত টাকা তাদের সঙ্গে আছে, সেই সময় তার বাবার মুখের ম্লান করুণ চেহারা। তাই এই মেলার মধ্যে দাঁড়িয়ে সে স্পষ্ট উপলব্ধি করে, যে-জিনিসের কোন সাংসারিক দরকার নেই, সে জিনিস কিনে পয়সা নষ্ট করবার অবস্থা তাদের নয়। গরীব বলেই না তারা তাদের জন্ম-ভিটে ছেড়ে এই দূর দেশে এসেছে? গরীব বলেই না তার বাবা, বুটা যা কিছু গল্প করেছে, তাই বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়েছে? আজ বুঝতে পেরেছে তার বাবা, সে-সব মিথ্যা, সে-সব ভুয়ো। তাকে বিশ্বাস ক'রে যে কি বোকামির কাজ করেছে, আজ বুঝতে পেরে তার বাবার লজ্জার অন্ত নেই। কিন্তু বাবা কেন একাই এই কষ্ট বয়ে বেড়াবেন? তাঁর বোঝার ওপর তারা আর কোন বোঝা চাপাবে না। তাঁর সব আশা আজ ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছে। তাই যতক্ষণ না বাবা কিছু জমি-জায়গা যোগাড় করতে পারছেন, ততক্ষণ চুপটি ক'রে আমাদের সব সয়ে চলতে হবে। তার পর হয়ত দিন বদলে যেতে পারে। বদলাক্ আর নাই বদলাক্, আজ তার মনে হয়, সে যদি খানিকটা কাঁদতে পারে···সে কান্না, সুখের কি দুঃখের তা সে জানে না···সুখ আর দুঃখ তার জীবনে এই মুহূর্তে যেন জড়িয়ে এক হয়ে গিয়েছে। তবে এই যে মেলায়

হাজার রঙীন জিনিস-পত্র সে দেখতে পেলো, এই যে চারিদিকে হাসিখুশী মানুষের ভিড়···এই যে তার মা বাবা, ভাই-বোন, তারা সবাই কাছাকাছি পাশাপাশি রয়েছে···এর আনন্দ কম কিসে ?

গঙ্গুর দিকে এগিয়ে যেতে যেতে, হঠাৎ সজনীর নজরে পড়লো, একটা পাহাড়ী গরু গোবর নাদ্‌ছে···তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে মাটি থেকে খানিকটা টাটকা গোবর তুলে নেয়···যেন একটা মস্ত বড় অমূল্য সম্পদ সে হঠাৎ পেয়ে গিয়েছে। এখানে আসা পর্যন্ত সে গোবর দিয়ে ঘর-দোর পরিষ্কার করতে পায় নি, কারণ, তারা যেখানে থাকে, সেখানে গোটাকতক ষাঁড় আছে বটে···গরুর বড়ই অভাব। গোময় তাই দুষ্প্রাপ্য।

বেনের দোকানের সামনে গঙ্গু নিশ্চল হয়ে বসেছিল, মাছি আর পোকার উৎপাতে মাঝে মাঝে শুধু হাতখানা উঠছিল আর নামছিল···তা ছাড়া সারা অবয়বে আর কোন স্পন্দনের লক্ষণ ছিল না। সামনের দোকানে তার চোখের ওপর যে সব দৃশ্য ঘটে যাচ্ছিল, তা দেখতে দেখতে তার মন আতঙ্কে যেন পঙ্গু হয়ে আসছিল। মাথায় বৃহৎ পাগড়ী, গায়ে ময়লা জামা, পরনে ততোধিক ময়লা পাজামা, একটা উঁচু গদীর ওপর শেঠজী বসে। ছোট্টখাট্ট মানুষটি···কিন্তু দেখলেই বোঝা যায় অতি কঠিন মানুষ। দু'ধারে সরু গোঁফ ঝুলে পড়েছে, ছোট ছোট গোল চোখ, লম্বা নাক, পাতলা ঠোঁট, মোটা চিবুকের হাড়, সারা মুখে স্পষ্ট লেখা রয়েছে বিশ্ব-সংসারের ওপর রাগ আর আক্রোশ। হিসেব বুঝে নেবার জন্যে পালা ক'রে এক একজন তিব্বতী খরিদ্দারকে ডাকছে। তারা যেই তার সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে অমনি যেন বোবা হয়ে যাচ্ছে, বড়-জোর কেউ দু'একবার অতি স্বল্প ভাষায় প্রতিবাদ জানাবার চেষ্টা করছে মাত্র কিন্তু সেই প্রতিবাদের ফলে তার মেজাজ আরও রুক্ষ হয়ে উঠছে এবং তখন সে যা হুকুম করছে, তাই বাধ্য হয়ে তারা মেনে নিচ্ছে।

একে একে প্রায় সকলের পালা শেষ হয়ে গিয়েছে। সর্বশেষে যে লোকটি দাঁড়িয়েছিল, মুখ-বিকৃতি ক'রে শেঠজী তাকে ডেকে উঠলো :

'হোই সিপি···কই দেখি কি এনেছিস? মাত্তর এই ক'বস্তা? তা··· এখন বাছাধন, চক্ষুরত্নটি একবার দয়া ক'রে খুলে, মগজের ঢাকনিটি একটু তুলে, ভুতুড়ে ভাষা ছেড়ে মানুষের মতন সোজা ক'রে বল্ দেখি, এই ক'বস্তা গমের বদলে কি চাস্?'

ভিক্ষতী উত্তরে জানায় :

'তা বলছি, কিন্তু তার আগে, শেঠ, হুই সিপি বলে আমাদের ডাকবে না বলে দিচ্ছি··· আমাদের ভাষায় ওটা গালাগাল। আমি যা মাল এনেছি তার বদলে খানিকটা বিলিতী কাপড়, শাদা বিলিতী কাপড় চাই!'

'আমার এখানে শুধু দেশী কাপড় বিক্রি হয়!' শেঠজী জানায়।

'বেশ, তাই দাও!'

শেঠজী দোকানের ভেতর তার কর্মচারীকে ডেকে আদেশ করেন :

'ওহে, লোকটাকে গান্ধী-মার্কা কাপড় খানিকটা দিয়ে দাও।'

তার পর ভিব্বতীর দিকে ফিরে চেয়ে তাকে বোঝাতে চেষ্টা করে :

'শোন, তোর ঐ বস্তায় যা গম আছে, মন পিছু যদি তিন টাকা ক'রে ধরি, তাহলে দাম হয় দু'টাকা। তার বদলে তোকে সমস্ত থানটাই এখন দিয়ে দিচ্ছি··· থানটার দাম, গজ পিছু যদি সাড়ে চার আনাই ধরি, তাহলে কমসে-কম আট টাকা হবে···বুঝলি? কাটাকাটি আর করতে চাই না, পুরো থানটাই তোকে এখন দিয়ে দিচ্ছি, তোকে তো আর অবিশ্বাস করতে পারি-না? বাকি টাকাটা তোর নামে খাতায় লিখে রাখছি···পুরনো ধারের সঙ্গে জুড়ে দেবো'খন···কেমন? সুদ সেই যা দিয়ে থাকিস্ গো, এক টাকা ক'রে। কেমন, রাজী তো?'

সেই অপরিচিত ভাষায় শেঠজী দ্রুত কি বলে গেল, দেনা-পাওনার কি হিসাবই বা দিল, তার এক বর্ণও সে বুঝতে পারলো না···বুঝতে পারলেও, হাঁ

বলা ছাড়া তার আর গত্যন্তর ছিল না, কারণ বেচারা গুনতে পর্যন্ত জানে না।

কিন্তু তাদের দলের মুরুব্বী পেছন দিক্ থেকে চেঁচিয়ে উঠলো : 'ছই! ছই!'

মুরুব্বীর মত নেই বুঝতে পেরে, সে তাড়াতাড়ি তার স্বীকৃতি ফিরিয়ে নিয়ে ঘন ঘন ঘাড় নেড়ে প্রতিবাদ জানায়।

শেঠজী রেগে ওঠে :

'তবে মরগে যা। পেট ভরে হাওয়া খাগে বুঝলি? যে-পথ দিয়ে এসেছিস্, ঐ বস্তা ঘাড়ে ক'রে আবার সেই পথ দিয়ে ফিরে যা! আরে, তুই যদি না বেচিস্ তো হয়েছে কি? আর একজন এক্ষুনি সেধে দিয়ে যাবে। মুখ্যু পাহাড়ে ভূত, ভাল করতে গেলুম,...বুঝবি কি ক'রে বল্? সাধে কি ভগবান তোদের ঐ খুদে খুদে চোখ আর কুচুটে মন দিয়েছেন? বেশ করেছেন, ঠিক করেছেন...তিনি ইচ্ছে করেই তোদের ঐরকম বেয়াড়া ক'রে গড়েছেন...আর সেইজন্যেই তো বছরে বছরে বসন্ত রোগে তোরা গরু-ছাগলের মত মরিস!'

দলের মুরুব্বী এগিয়ে এসে বলে : 'তা শেঠজী, তুমি একটু আগেই আমার কাছ থেকে কুড়ি বস্তা গম নিলে, ছ' টাকা দরে...আর পুরো ধানের দাম ধরলে ছ' টাকা ক'রে...এখন আবার ওর বেলায় দাম বদলাচ্ছো কেন?'

'তাই নাকি? তাহলে তো আমার ভুল হয়ে গিয়েছিল তখন...ভুলে আমি তোকে কম দর বলে ফেলেছি! তা এক কাজ কর...ভুল তো আর হতে দিতে পারি না ব্যবসায়, বাড়তি টাকাটা তোর নামে ধার বলে খাতায় লিখে রাখি?'

বলার সঙ্গে সঙ্গে শেঠ কাহ্নমল ভুল সংশোধন ক'রে নেবার জন্যে গেরুয়া রঙের লম্বা হিসাবের খাতা খুলে বসে...

উলটো ব্যবস্থা হলো দেখে মুরুব্বী চেঁচিয়ে ওঠে : 'না...না...তুমি বরং ফিরিয়ে দাও আমার বস্তা...আমরা তোমাকে বেচবো না...পারি তো অন্য কোথাও বেচবো!'

শেঠ কাহ্নমল ব্যঙ্গের হাসি হেসে ওঠে :

'বেশ, তাই যা বেটা! নে···ষাঁড়ের পিঠে বোঝাই ক'রে বিদায় হ' ভূতের দল। তেজ দেখিয়ে যাবি কোথায়? এখান থেকে বিশ মাইলের মধ্যে, যত দোকান আছে, সব এই শর্মার! প্রাণের আনন্দে যতবার খুশি এই পাহাড়ে বরফের মধ্যে যাতায়াত করতে পারিস্, কর্! বাড়ী ফিরে তোদের দাদাকে জানাস, শেঠ কাহ্নমল হুজুরকে পেন্নাম জানিয়েছে! যা বেটা!'

শেঠ কাহ্নমলের অধিকাংশ কথারই কোন অর্থ-বোধ তারা করতে পারে না। রাগে মুরুব্বীর হলদে মুখ লাল হয়ে ওঠে। দলের লোকদের ডেকে সব বস্তাগুলো ষাঁড়ের পিঠে বোঝাই ক'রে নিতে আদেশ করে।

ভ্রূক্ষেপ না ক'রে শেঠজী নতুন খরিদ্দারের দিকে নজর দেয়। গজু এতক্ষণ দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে নীরবে সব দেখছিল।

'কি রে? কি চাই তোর?' শেঠজী জিজ্ঞেস করে।

'বেশ ভাল মোটা আটা আর কিছু চাল।' গজু জানায়।

শেঠজী জিজ্ঞেস ক'রে ওঠে: 'তুই কোন চা-বাগানে কাজ করিস্? ষ্টিফেনসনের চা-বাগান ছাড়া সব বাগানেই তো আমার দোকান আছে। সেখানে খরিদ না ক'রে এত দূরে আসতে গেলি কেন? এখানে তো খুচরো বিক্রি হয় না!'

'ক'টা কথা জিজ্ঞাসা করবো শেঠজী? ম্যাকফার্সন চা-বাগানের দোকানে যে বসে থাকে, সে কি তোমার ছেলে নাকি? দেখতে ঠিক হুজুরের মতই কিনা।' গজু সভয়ে নিবেদন করে।

শেঠজী যেন একটু বিরক্ত হয়েই জবাব দেয়: 'না, ছেলে নয়, ভাই।'

তার বিরক্ত হবার একটু বিশেষ কারণ ছিল। ইদানীং তার ভাই সাহেব-মহলে বেশ খাতির জমিয়ে তুলেছিল, তার কারণ সে একটু-আধটু ইংরেজী বলতে কইতে পারে এবং পড়াশুনাও কিছুটা জানে।

কি জানি কি ভেবে শেঠজী গন্নুকে আর ফিরিয়ে দিতে চায় না। বলে :

'কি কি চাই বল্ দেখি! পাইকারী ছাড়া আমার দোকানে খুচরো বেচা-কেনা হয় না, তা তোর খাতিরে আমি খুচরোই দিচ্ছি।'

'তা আটার দরটা কি শুনি?' গন্নু জিজ্ঞেস করে।

'তোদের চা-বাগানের যা দর, সেই দরেই পাবি। দরের তফাত আমার কাছে নেই। কেন যে তোরা কাছের দোকান ফেলে এতদূরে খরিদ করতে আসিস্, তা আমার বুঝতে বাকি নেই, বুঝলি বেটা? খালি খুঁজে বেড়াচ্ছিস্ আমার দোকানের চেয়ে কম দরে কোথায় মাল পাওয়া যায়, না?'

গন্নু বিস্মিত হয়ে জবাব দেয় : 'সে কি হুজুর! আমি এমনি এসেছি। আমি কি ক'রে জানবো বলো যে সব দোকানই হুজুরের। তবে হক কথাই বলবো, গরীব লোক, যেখানে সস্তায় পাবো সেখান থেকেই খরিদ করবো।'

তার কথার সুরে সুর মিলিয়ে কাহ্নমল বলে ওঠে : 'আর আমি চেষ্টা করবো সব চেয়ে চড়া দরে বিক্রি করতে!'

এতক্ষণ ধরে মনের মধ্যে যে জ্বালা সে পুষে রেখেছিল, শেঠজীর কথায় সে আর তা চেপে রাখতে পারে না। দাঁতে দাঁত চিবিয়ে সে বলে ওঠে : 'শেঠজী, একেই তোমরা বল ব্যবসা?' এ হলো···চুরি···ডাকাতি···

কিন্তু বহুকষ্টে সে শেষের কথাগুলো গিলে ফেলে। যেদিন থেকে সে বুঝতে পেরেছে যে বুটা তাকে কতখানি ঠকিয়েছে সেইদিন থেকে তার স্বাভাবিক মেঠো বুদ্ধিতে সে সজাগ হয়ে গিয়েছিল, সেদিন থেকে সে প্রতিজ্ঞা করেছিল, যত ভারী বোঝাই তাকে বইতে হোক্ না কেন, সে আর অন্ধ হয়ে নিজেকে ছেড়ে দেবে না···কোন কিছু প্রতিবাদ করবার জন্যেও না, কোন কিছু গ্রহণ করবার জন্যেও না।

গন্নুর কথার ভঙ্গীতে শেঠজী উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। বলে : 'বলি, মাল নিবি তো নে? তোর সঙ্গে তর্ক ক'রে নষ্ট করবার মত সময় আমার নেই!'

'বেশ, দশ সের আটা, পাঁচ সের পাঁচমিশেলী ডাল···দশ সের চাল··· দু'সের চিনি...আর আধ সের মাখন···'

ইতিমধ্যে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ ক'রে, সেই তিব্বতী দলের মুরুব্বী ফিরে এসে জানায় : 'শেঠজী, ফিরে আর নিয়ে যাবো না···এই নাও বস্তাগুলো ···যা দর দিয়েছ, তাতেই বেচবো।'

সুযোগ পেয়ে কান্থমল বক্তৃতা শুরু ক'রে দেয় : 'বলি বেটা ভেড়ার দল, তোদের নিজেদের ভাল বোঝবার বুদ্ধি পর্যন্ত তোদের নেই। তাই নিজেই পুতু তুলে খেতে আবার ফিরে এসেছিস্। আমার উচিত তোদের এখুনি দূর ক'রে দেওয়া কিন্তু এবারের মত মাপ করলাম। ফের যখন আমার সঙ্গে লেন-দেন করতে আসবি, আমি যা দর দেবো মুখ বুজে মেনে নিবি···কোন শালা আমার চেয়ে সুবিধেয় দিতে পারবে না!'

তার পর কর্মচারীকে ডেকে হুকুম করে : 'ওহে, এই কুলিটা যা যা চাইছে ওজন ক'রে দিয়ে দাও, আমি এই দুই সিপিগুলোকে দেখছি।'

শেঠজী আপনার মনে বকে যায়। তিব্বতীরা তার বিশেষ কিছুই বুঝতে পারে না। স্থির, শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে···খুদে খুদে চোখগুলো যেন সাঁঝের অন্ধকারে বুজে আসে···ঠিক এমনি স্থির বদ্ধ দৃষ্টি নিয়ে তারা তাদের গাঁয়ের মঠে নির্বাণের মহাশূন্যের ধ্যানে অদৃশ্য দেবতার কৃপা-বর্ষণের জন্যে অপেক্ষা ক'রে থাকে।

তার নিজের অন্তরের তিক্ত বেদনার ঘন কালো স্তর ভেদ ক'রে শুধু তাদের ভাল ক'রে নিরীক্ষণ ক'রে দেখে···চেষ্টা করে তাদের মনের অচঞ্চলতা ভেদ ক'রে তলিয়ে দেখতে তাদের। দেখতে দেখতে, তাদের ছাড়িয়ে তার মন চলে যায়, দূর পাহাড়ের মধ্যে তাদের গাঁয়ে, স্পষ্ট দেখতে পায়, রোদে হিমে, মাংসপেশীর সমস্ত শক্তি প্রয়োগ ক'রে নিষ্করুণ মাটির বুকে গভীর, গভীর আরও গভীরভাবে লাঙলের ফলা চালিয়ে চলেছে, মুঠো মুঠো বীজ ছড়িয়ে দিয়েছে···কবে ভিজে উঠবে মাটি, এই আশায় বৃষ্টির জলের জন্যে ঊর্ধ্বমুখে

আকাশের দিকে চেয়ে আছে। তার পর একটু একটু ক'রে বেড়ে উঠতে ...তারা, চেয়ে থাকে তারা উৎসুক আগ্রহে, জেগে উঠেছে শীষ, নুয়ে পড়েছে শস্যের ভারে, পেকে উঠেছে ফসল···হাসিতে ভরে ওঠে মুখ··· হিমালয়ের তুষার-গলা সূর্যের আলোর মত সুপ্রশান্ত হাসি। সে জানে, এই পাঁজর-ভাঙা পরিশ্রমের মানে কি, জানে, সেই কঠিন মাটির বুকে লুকিয়ে থাকে য সঞ্জীবনী মন্ত্র; জানে কি গভীর প্রেমে মানুষ দিনের পর দিন নিজেকে ...ন্ন ক'রে চলে, একদিন সব কষ্টের ফল সোনার ফসল হয়ে দেখা দেবে ব'লে। ...নে কি মর্ম-ছেঁড়া যাতনা হয়, যখন পাষাণ-প্রাণ স্বার্থপর, আত্ত-নীচ আর অবুঝ বেনিয়ার দল প্যাঁচ কষে কেনার নামে সেই ফসল নেয় ঠকিয়ে চুরি ক'রে। তার মনে হচ্ছিল, সে যেচে গিয়ে ওদের সঙ্গে আলাপ করে। তার নিজের দুঃখের সঙ্গে তাদের সেই মৌন বেদনা মিশে ... অন্তর যেন একটা তীব্র আক্রোশের ঝড় তোলে। তার নিরুদ্ধ বেগে ... ...ঙ পড়ে তবু তাকে প্রকাশ করতে পারে না। যেন কোন্ দুরন্ত রাগিণীর আক্রান্ত মূর্ছনার মধ্যে সে পথ হারিয়ে ফেলেছে।

সজনী স্বামীর দৃষ্টিকে অনুসরণ ক'রে স্বভাবধর্মে বুঝতে পারে, সেই দৃষ্টির আড়ালে চলেছে দুঃখের কি নিঃশব্দ দহন। তবু তাকে চেয়ে থাকতে হয় সামনে প্রসারিত কাপড়ের দিকে, যেখানে শেঠ কানুমলের কর্মচারী ওজন ক'রে মালগুলো ঢেলে দিচ্ছিল···সজনীকে সতর্ক থাকতে হয়, যাতে চাল-ডাল একসঙ্গে না মিশে যায়।

ইতিমধ্যে বুদ্ধু কোথা থেকে একটা পায়রা ধরেছে···সেটা তখনও তার মুঠোর মধ্যে ভয়ে কাঁপছে আর ডানার ঝাপট দিচ্ছে···বুদ্ধু তাতেই মহা খুশী।

লীলা সেই অসহায় বন্দীর দিকে সকরুণ মমতায় চেয়ে থাকতে থাকতে মিনতি জানায়: 'ছেড়ে দে ওকে, ছেড়ে দে বুদ্ধু!'

কিন্তু ছাড়া সে পায় না, তার ভাগ্যে ছিল যে সে তাদের সঙ্গে তাদের বাড়ীতে যাবে, তাদের ভাঙা দরজার কোটরে কিছুকাল বসবাস করবে।

। ছয় ।

সেদিন গজু যখন বাড়ী ফিরে এলো, তার সর্বাঙ্গ কাঁপছে! সারা পথ স্লেই বোঝা মাথায় ক'রে নিয়ে তাকে আসতে হয়েছে, সেইজন্তে ক্লান্তিতে তার শরীর কাঁপছে, এইটেই তারা স্বামী-স্ত্রীতে অনুমান ক'রে নেয়।

উনুনের কাছে গিয়ে হঁকোটা নিয়ে বসলো। ভাবলে, আগুনের তাতে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করলেই সেরে যাবে।

কিন্তু ক্রমশ শরীর যেন ভারী হয়ে এলো, মাথা ঝিমঝিম করতে লাগলো।

রান্না হয়ে গেল, সজনী খেতে ডাকলে গজু জানালো, তার খাবার ইচ্ছে করছে না, সে শুয়ে পড়বে।

সজনী কাছে এসে দেখে চোখ ছলছল করছে, কপালে হাত দিয়ে দেখে জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে গা। দেখতে দেখতে কাঁপুনি শুরু হয়ে গেল। যা কাঁথাপত্র ছিল, সব এনে গায়ে চাপা দিয়ে দিল। শাক সেদ্ধ ক'রে, তার ঝোলটা শুধু খেতে দিল।

গজুর মনে হলো তার সমস্ত পেশীগুলো কে যেন রবারের মত টেনে ধরেছে এখনি ছিঁড়ে যাবে। হাড়ের ভেতর কনকন করছে, যেন আপনা থেকে ভেঙে পড়বে। সমস্ত মেরুদণ্ডটা যেন ভেঙে দু-টুকরো হয়ে গিয়েছে, পা থেকে মাথা পর্যন্ত সারা গা দিয়ে একটা আগুনের ঝলকা বেরুচ্ছে···অসহ্য যন্ত্রণায় উত্তেজনায় সে গোঙরাতে থাকে। বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ড অতি দ্রুত কাঁপতে থাকে, কপালের দু'ধারের রগ দপ্‌দপ্‌ ক'রে ওঠে, যেন শিখাময় অনির্বাণ আগুনে জ্বলন্ত কাঠ ফেটে পড়ছে। অস্থির হয়ে সে এ-পাশ ফেরে, মনে হয় পাশ ফিরলে বুঝি এই দেহ-ভাঙা দুরন্ত ভার ঘাড় থেকে নেমে যাবে। কিছুতেই স্বস্তি না পেয়ে, স্থির হয়ে পড়ে থাকে; বিকারের ঘোরে অর্ধ-অচৈতন্য অবস্থায় শুধু গোঙাতে থাকে।" সজনী পায়ের কাছে বসে পদসেবা করে, নীলা তেল দিয়ে মাথা টিপে দেয়, দিতে দিতে কখন দু'জনেই

ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ে। কিছুক্ষণ পরে, একটু যেন সুস্থির হয়ে, গঙ্গু আপনার মনে হায় হায় ক'রে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে ঘন দীর্ঘশ্বাস পড়তে থাকে।

বাইরে তখন রাত্রির অন্ধকারের আলিঙ্গনে ঘুমিয়ে পড়েছে আসাম···পর্বতমালার ঊর্ধ্বে অদৃশ্য মেঘলোকে ভীষণ-মৌনতায় মিশে গিয়েছে দিক্‌চক্র রেখা। বাইরে উঠেছে রাত্রির স্নিগ্ধ বায়ু। তার কোমল স্পর্শে সজনী আর লীলা ভয়াতুর ক্লান্তদেহে বুড়োর পাশে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে থাকে। মনে দেবতার কাছে তাদের সবার কল্যাণে জানায় বহু মিনতি।

তাদের ঘুমিয়ে পড়ার পরই, হঠাৎ গঙ্গুর আচ্ছন্নতা ক্ষণিকের জন্য কেটে যায়। কোনরকমে মাথা তুলে জলের জন্যে চীৎকার ক'রে ওঠে।

সজনী তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে। কাঠ দিয়ে উনুন জ্বালাতে বসে। গঙ্গু কোনরকমে দেহটাকে টেনে তুলে, হাতের ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। তারপর, বাইরে ছুটে গিয়ে রাত্রির ঠাণ্ডা হাওয়ায় ছুঁড়ে ফেলে দেবে অন্নটাকে।

লীলা তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে গিয়ে হাত ধরে গঙ্গুকে ভেতরে টেনে নিয়ে এসে আবার শুইয়ে দেয়। ভয়ে নির্বাক হয়ে শায়িত পিতার পাশে বসে থাকে। তার সর্ব অঙ্গ যেন অবশ হয়ে আসে। পিতার সেই বেদনাহত দেহের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে তার মনে হয়, কোন উপায়ে তার বাবার সেই যন্ত্রণা সে নিজের দেহে নিয়ে নিতে পারে না? সজনী গরম জলের গেলাসটা তার হাতে দেয়। পিতার পাশে বসে জল খাওয়াতে খাওয়াতে তার সেই শিশু-সুলভ ভয় নিমেষে যেন দূর হয়ে যায়···সাহসে ভরে ওঠে তার ছোট্ট বুক···মার মত কাছে ঘেঁষে বসে গঙ্গুর···। শিশু হলেও সে মেয়ে। বালিকা যা পারে, বালক তা পারে না!

চুমুক কোনরকমে খেয়ে, চোখ বুজে গেলাসটা ফিরিয়ে দেবার জন্যে অন্ধকারে হাত বাড়িয়ে দেয়। আপনার মনে বলে ওঠে: 'গরম···বড্ড গরম···'

তার পর, হঠাৎ সুর ক'রে দু-লাইন গেয়ে ওঠে:

'ওরে মন, শমন এলো তোর দ্বারে
বরণ ক'রে নে তারে।'

সজনী কাছে ছুটে এসে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলে 'ওগো কি হয়েছে গো? বলি, ও-লীলার বাবা, কি হলো? কি বলছো?'

অর্ধ-অচৈতন্যের মত শম্ভু বলে ওঠে: 'না, না, আমি যাবো না· যাবো না···'

'ওগো, কি হয়েছে? কোথায় যাবে? বল না?' সজনীর কণ্ঠস্ব কান্নায় ভরে আসে।

সে-[illegible] কোন [illegible] দেয় না শম্ভু। তার [illegible] ভীত শিশুর মত [illegible] করে। অন্ধকারে দু'হাত তুলে প্রাণপণ চেষ্টা যেন কোন [illegible] আক্রমণ প্রতিরোধ করে। তার বিকারগ্রস্ত মস্তিষ্কে ে যেন চোখের সামনে দেখছে···বীভৎস এক মৃতদেহ···গা[illegible]র মাংস নেই··· শুধু কঙ্কাল···চোখের কোটর কোথায় কোন্ সুগভীর অন্ধকারে ডুবে গিয়েছে— আর তার ভেতর থেকে যেন আলোর বাণ ঠিকরে পড়ছে···[illegible]র অন্ধকার ঠিক বিড়ালের চোখের মত জ্বলছে। কয়েক মুহূর্ত পরেই ঠকঠক্ ক'রে একবার ভয়ঙ্কর কেঁপে উঠলো, তার পর দাঁতে-দাঁত লেগে গেল। [illegible] বার ক'রে নীচের ঠোঁটটা থুতুতে ভিজিয়ে নিয়ে সজোরে তার ওপর দাঁত বসিয়ে দেয়। তার পর দেখতে দেখতে সমস্ত মুখটা যেন দুমড়ে-মুচড়ে গেল। কপালের ওপর যে সব গভীর ভাগ্যরেখা পড়েছিল, চোখের কোলে-কোলে যে সব কালি জমা হয়ে উঠেছিল, তারা যেন তার সারা জীবনের সব ব্যর্থ আশাকে ভেতর থেকে টেনে বার ক'রে এনে এক কিম্ভূত-কিমাকার মুখ-বিকৃতিতে আজ মুক্তি দিল।

সজনীর মনে হচ্ছিল যদি সে কোনরকমে তার স্বামীর দেহের ভিতরে গিয়ে দেখে আসতে পারে, কি যন্ত্রণা সেখানে হচ্ছে, যদি কোনরকমে তার

যন্ত্রণার খানিকটা অংশ সে নিতে পারতো! অসহায়ভাবে শুধু জিজ্ঞেস স্বরে: 'খুব কষ্ট হচ্ছে বুঝি? ওগো বল না?'

'কি ক'রে বলবে? দেখছো না, কি রকম কষ্ট হচ্ছে।' লীলা বলে ওঠে। পিতার উত্তপ্ত কপালে মুখ রেখে, লীলা চেয়ে থাকে…মুখ না, মুখোশ? ফাটা দরজার ফাঁক দিয়ে যেটুকু আলো আসছিল, তাতে লীলা বিস্ময়ে গজুর মুখের দিকে স্থিরবদ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে দেখে, ছেলেবেলা থেকে যে মুখ সে প্রতিদিন দেখে এসেছে, এতো সে মুখ নয়। সে মুখের কোন ছায়া পর্যন্ত যেন এর মধ্যে নেই। বুকে হাত বোলাতে বোলাতে সে যেন স্পষ্ট দেখতে পায়, প্রতিটি নিঃশ্বাসের উত্থান-পতন…সন্দেহে তারা জানিয়ে দিয়ে যাচ্ছে, সেই ক্লান্ত দেহের ভেতর মৃত্যুর সঙ্গে জীবনের কি [illegible]।

শুধু একবার কয়েক মুহূর্তের জন্যে গজু চোখ মেলে চেয়ে দেখে। [illegible], তার মুখে উপর ঝুঁকে পড়ে আছে, বিষণ্ণ, ম্লান, ছোট্ট একটি মুখ, নিকলুষ মমতার জীবন্ত-ছবি। তার মেয়ে। এই সান্নিধ্যের চেতনায় গজু যেন সজাগ হয়ে ওঠে। ভেতরের কোথা থেকে যেন সঞ্চিত প্রাণ-শক্তির দ্বার খুলে যায়।

'লীলা মা, তুই বুঝি? বুন্ত কোথায়?'

'সে ঘুমিয়ে পড়েছে বাবা!'

'ভাল! আমাকে এক্ষুনি উঠতে হবে…সকাল হয়ে এলো বুঝি…তোরা কেউ একটু জল দেতো আমাকে! বড্ড ঘাম হচ্ছে!'

সজনী তাড়াতাড়ি এক গেলাস জল নিয়ে এসে মুখের কাছে ধরে।

'আঃ, বড় ভাল লাগলো!'

গজুর গায়ের জ্বর সজনীর ওপর ভর করলো।

ভোরবেলা অসংবৃত-বসনে নিত্য যেমন ঘুম থেকে উঠে ঘরকন্নার কাজ তাড়াতাড়ি সেরে নিয়ে, কাজে বেরুবার জন্যে তৈরী হয়, সেদিনও তেমনি

ঘোরা-ফেরা করতে গিয়ে হঠাৎ তার সারা দেহ কেঁপে উঠলো, মনে হলো, সারা অঙ্গ যেন ব্যথায় ভারী হয়ে আসছে। মার অবস্থা দেখে লীলা তাকে কাজ করতে বারণ করে, কিন্তু মেয়ের কথা কানে না তুলে সজনী প্রতিদিনের মত ঘরের কাজ তাড়াতাড়ি সেরে নেয়। তার পর সেজে-গুজে কাজে যাবার জন্মে যেই পা বাড়িয়েছে অমনি হঠাৎ তার মাথাটা যেন ঘুরে গেল···এমন কাঁপুনি ধরলো যেন এইমাত্র বরফ-জলে নেয়ে উঠেছে···মুখ-চোখ লাল হয়ে উঠলো··· দাঁড়িয়ে থাকতে না পেরে কাঁপতে কাঁপতে একেবারে মাটিতে পড়ে গেল।

লীলা তাড়াতাড়ি সেখান থেকে কোনরকমে টানতে টানতে মাকে তার শোবার জায়গায় নিয়ে এসে শুইয়ে দেয়, কাঁথা-কম্বল-মাদুর, পুরনো চটের থলে, যা হাতের কাছে পায় সব টেনে নিয়ে গায়ে চাপিয়ে দেয়। গা-হাত-পা টিপে দিতে দিতে ভয়ে হতভম্ব হয়ে ভাবে, তার মা-বাবা দু'জনেরই কেন এক-সঙ্গে জর হলো?

দেখতে দেখতে সজনী অচৈতন্য হয়ে পড়লো, শুধু অস্পষ্ট মৃদুকণ্ঠে মাঝে মাঝে গুমরে কেঁদে ওঠে: 'হে ঈশ্বর, হে ভগবান···'

লীলা ক্রমশ দেখে, তার মাঁর আর কোন জ্ঞান নেই, কিছুই দেখতে পাচ্ছে না, ভয়ে আর নিজেকে স্থির রাখতে পারে না···কি করবে ভেবে না পেয়ে ঘরের মধ্যে ছটফট ক'রে শুধু ঘুরে বেড়ায়।

তাড়াতাড়ি এক লোটা জল নিয়ে চোখে মুখে দেয়। খাবার জন্মে ঠোঁটের কাছে ধরতেই সজনী থু-থু: ক'রে ফেলে দেয়, দাঁতে দাঁত চেপে কড়মড় ক'রে ওঠে, মুখের দু'পাশ দিয়ে গেঁজলা গড়িয়ে পড়ে। অসহ্য যন্ত্রণায় বিকারের মধ্যে ভুল বকতে আরম্ভ করে, হাতের মুঠো শক্ত কাঠ ক'রে মেঝের ওপর এ-পাশ ও-পাশ গড়াগড়ি দেয়।

গগু এতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিল। হঠাৎ ঘুম ভেঙে সেই দৃশ্য দেখে বিমূঢ় নীরবতায় উঠে তার পাশে গিয়ে বসে। গায়ে হাত দিয়ে দেখে, জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। আপনার মনে বলে ওঠে: 'আমার জ্বর দেখছি ওর ঘাড়ে

চেপেছে—ভয় নেই লীলা, এ শুধু জ্বর আমার গায়ের কাঁথাগুলোও ওর গায়ে চাপিয়ে দে!'

তাড়াতাড়ি আরও কাঁথা এনে মার গায়ে চাপিয়ে দেয়। সজনী তখন গোঙাতে শুরু ক'রে দিয়েছে। সারা দেহের ভেতর যে বিষম যন্ত্রণা চলছিল, তাকে অতিক্রম ক'রে ওঠবার প্রাণান্ত ব্যর্থ চেষ্টায়, সজনীর চোখ-মুখ নিমেষের মধ্যে বিকৃত হয়ে যায়। সে আবার সংজ্ঞাশূন্য হয়ে পড়ে।

গণু উঠে দাঁড়ায়, যেমন ক'রেই হোক, ডাক্তার আনতে হবে। একটা ছেঁড়া কাঁথা গায়ে জড়িয়ে নিয়ে সে যাবার জন্যে পা বাড়ায়।

লীলা বাধা দিয়ে বলে ওঠে: 'সারারাত এই জ্বর ভোগ করার পর, এখন যদি বাইরে বেরোও, তাহলে তুমি আর বাঁচবে না বাবা!'

লীলা ঠিক করে মার কাছে গণুকে বসিয়ে সে নিজেই ডাক্তারের খোঁজে বেরুবে, এমন সময় সৌভাগ্যবশত, ভোরবেলার মুরগীর মত ঘরের বাইরে থেকে নারাণ হেঁকে উঠলো: 'ভোর হয়েছে গো…কাজে চল…'

দরজার কাছে ছুটে গিয়ে মুখ বার ক'রে লীলা বলে ওঠে: 'একবার ভেতরে এসো চাচা, বাবা-মার বড্ড অসুখ…কি রকম করছে…কি করবো ভেবে পাচ্ছি না!'

ঘরের ভেতর আর না ঢুকেই নারাণ চীৎকার ওঠে: 'নিশ্চয়ই তাহলে কলেরা হয়েছে…কলেরা…'

আর কোন দিকে না চেয়ে চীৎকার করতে করতে সে নিজের ডেরার দিকে ছুটতে আরম্ভ করে: 'কলেরা, কলেরা!'

ঘরের বাইরে থেকেই চেঁচিয়ে ডাকে: 'বলি ও বুলুর মা…ও বুলুর মা… ছেলেমেয়েদের নিয়ে বেরিয়ে এসো…শিগ্গীর বেরিয়ে এসো…কলেরা… পাড়ায় কলেরা শুরু হয়ে গিয়েছে…'

গত বছর ঠিক এই রকম সময় সে দেখেছে, কলেরা কি কাণ্ড ক'রে গিয়েছিল কুলি-ধাওড়ায়…চোখের সামনে দেখতে দেখতে এক মাসের মধ্যে

দু'শো কুলি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। সেই আতঙ্ক সেদিন থেকে তার শিরা-উপশিরায় মিশে যায়। কলেরা মানেই মৃত্যু, তাই তার নামেই তারা শিউরে ওঠে।

হঠাৎ নারাণের সেই ভীত-চীৎকার আর তড়িৎ পলায়নে লীলা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। কি করবে ঠিক করতে না পেরে ঘুমন্ত বৃদ্ধকে ঠেলে জোর ক'রে ঘুম থেকে জাগায়, তাকেই ডাক্তারের খোঁজে পাঠাবে। কিন্তু বৃদ্ধ ঘুমের মধ্যে অস্পষ্ট প্রতিবাদ জানিয়ে পাশ ফিরে আবার শুয়ে পড়ে। ধীরে মার পাশে গিয়ে দেখে, ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ছে, যেন উড়ে-যাওয়া পাখীর ডানার শব্দ।

বাইরে ততক্ষণে নারাণের সেই চীৎকারের ফলে চারিদিকে সাড়া পড়ে গিয়েছে। ঘর থেকে লীলা শুনতে পায়, নারাণের চীৎকারের সঙ্গে সঙ্গে পড়শীদের অস্পষ্ট আতঙ্কিত কলরব। ধীরে সে দরজার বাইরে এসে দাঁড়ায়।

নারাণ সারা পাড়াময় চীৎকার ক'রে সকলকে আতঙ্কিত ক'রে তুলেছে, উত্তেজনায় তার সারা গা কাঁপছে, পা টলছে, গা দিয়ে সেই সকালবেলায় ঘাম ঝরে পড়ছে। দেখতে দেখতে সমগ্র কুলি-ধাওড়ায় একটা ভয়াবহ আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়লো। কেউ বলতে পারে না কি হয়েছে, কোথায় অসুখ, কার অসুখ, সবাই কিন্তু ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে। ভয়ে কেউ কারো কাছে আর যায় না, এখানে-সেখানে জটলা পাকিয়ে, শেষকালে সর্দারের কুঠির দিকে অগ্রসর হয়।

সর্দারদের মধ্যে একজন হঠাৎ সেই গোলমালে কাঁচা ঘুম থেকে উঠে মুখ বাড়িয়ে দেখে, তার ডেরার দিকে একদল উত্তেজিত কুলি এগিয়ে আসছে; সে তৎক্ষণাৎ ধরে নিল যে নিশ্চয়ই তার কোন কৃত-অন্যায়ের প্রতিশোধ নেবার জন্যে ক্রুদ্ধ কুলিরা এগিয়ে আসছে···তাই সে ভয়ে জোরে হুইস্‌ল্ বাজাতে আরম্ভ ক'রে দিল।

হুইস্‌ল্‌-এর শব্দ পেয়ে চা-বাগানের সশস্ত্র প্রহরীরা যে-যেখানে ছিল সেখান থেকে বন্দুক উঁচিয়ে ছুটে এসে সামনের কুলিদের ঘেরাও ক'রে ফেললো। হঠাৎ সেইভাবে সৈন্য-বেষ্টিত হয়ে হতভাগ্য ভীত আর্ত কুলির দল রাস্তায় পড়ে কাঁদতে শুরু ক'রে দেয়, যে অপরাধ করে নি তার জন্যে কাতরে ক্ষমা প্রার্থনা করে।

সেই লজ্জাকর অসহায় আর্তনাদের সঙ্গে দেখতে দেখতে মিশে যায়, স্ত্রীলোক, শিশু, বালক-বালিকার রোদন-ধ্বনি; হঠাৎ সেই প্রভাতে পড়শী মানুষের অকারণ চীৎকারধ্বনি শুনে গৃহপালিত জীব-জন্তুরাও দ্বিগুণ জোরে চীৎকার ক'রে ওঠে। সমস্ত মিলে সেই মুহূর্তে মনে হয় যেন নরকের দ্বার হঠাৎ কে যেন খুলে দিয়েছে।

এমন সময়, সেই চীৎকারে আকৃষ্ট হয়ে, লেফ্‌টেন্যান্ট রেগী হার্ট তাঁর সামরিক পোষাকে সুসজ্জিত হয়ে, হাতে রিভলভার তুলে নিয়ে অগ্রসর হয়ে আসে, পেছনে বন্দুক তুলে তাঁর খাস বেয়ারা···মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত নীরব হয়ে যায়···স্থির···নিস্পন্দ···

রেগী হার্ট চীৎকার ক'রে ওঠে: 'হারামজাদা, শুয়োরের দল, ভোর বেলাতেই এসব কি চিড়িয়াখানার চেঁচানি! কি হয়েছে?'

সেই ভীত, কম্পিত, কৃষ্ণ-মাংস-পিণ্ডের দলের ভিতর থেকে, ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে এসে নারাণ জবাব দেয়:

'হুজুর, কলেরা···কলেরা শুরু হয়ে গিয়েছে।'

শুনেই রেগী হার্ট হাতের রিভলভার নামিয়ে নেয়। মুখ-বিকৃতি ক'রে বলে ওঠে:

'ক্রাইস্ট···ব্লাডি ফুল্‌স্‌···তবে অকারণে কেন চীৎকার ক'রে মরছিস্‌?'

পাশেই তখন নিয়োগী-সর্দার সাহেবের সামনে নিজের বীরত্বের দাপট দেখাবার জন্যে কুলিদের দিকে কুকি উঁচিয়ে দাঁড়িয়েছিল। তার দিকে চেয়ে রেগী হুকুম দেয়: 'দেখিস্‌, কেউ যেন না এগোয়!'

এই বলে কুলিদের সামনে দিয়ে স্ত কা। হাডসনের ডিস্পেন্সারীর দিকে রেগী অগ্রসর হলো। ক্রুদ্ধ নীল চোখ তুলে এবং সেই সঙ্গে রিভলভার উঁচিয়ে তবুও পেছন দিকে চেয়ে চেয়ে দেখে, কুলিরা তার পেছনে কেউ তাড়া ক'রে আসছে কি না।

তখন সূর্য উঠে পড়েছে। তার অদৃশ্য উত্তাপে সেই সকাল বেলাতেই সাহেবের মনে হচ্ছিল যেন দম বন্ধ হয়ে আসবার মতন হয়েছে, নিজেকে তাই দুর্বল মনে হচ্ছে কিন্তু সে-অভাব পূরণ ক'রে দিয়েছিল হাতের রিভলভার। এই ধরনের গোলমেলে পরিস্থিতিতে হাতের মুঠোর মধ্যে রিভলভারটা থাকলে রেগী মনে মনে জোর পেতো। কুলি-ধাওড়ার মধ্যে দিয়ে ধুলোয়-ভরা যে রাস্তাটা চলে গিয়েছে, সেটা পার হয়ে রেগী যখন বাঁধানো রাস্তার ওপর এসে দাঁড়ালো, তখন সূর্যদেব রীতিমত প্রখর হয়ে উঠেছেন এবং চোখের সামনে সেই শান-বাঁধানো রাস্তার ওপর তখন উত্তাপ-তরঙ্গ নাচতে শুরু ক'রে দিয়েছে।

• • •

ওধারে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে লীলা বিভ্রান্ত বিস্ময়ে সব লক্ষ্য করছিল, এক-একবার মনে হচ্ছিল ছুটে গিয়ে সেই কোলাহল-মত্ত জনতাকে শান্ত ক'রে আসে, কিন্তু পরক্ষণেই মনে হয়, মার পাশ ছেড়ে চলে গেলে তো চলবে না! বুদ্ধু উঠে এসে, তার আঁচল ধরে দাঁড়িয়ে ভয়ে কাঁদে।

ঘরের ভেতর থেকে গঙ্গু জিজ্ঞেস ক'রে ওঠে: 'কি ব্যাপার রে লীলা?'. কি উত্তর দেবে ঠিক করতে না পেরে লীলা তেমনি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

কিছুক্ষণ পরে দেখে, তাদের কুঠির দিকে, দু'জন সাহেব এগিয়ে আসছে। লীলা শুনতে পেলো, সাহেবদের পেছনে একজন সর্দার বলছে: 'এই সেই কুলি, হুজুর!'

লীলা ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ে।

শোনে, বাইরে দাঁড়িয়ে আংরেজ ডাক্তার বলছে : 'মেয়েমানুষটিকে ডেকে জিজ্ঞেস কর, আমরা ভেতরে যেতে পারি কিনা?'

মিলিটারী বুটের সদর্প পদক্ষেপে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ে সর্দার চীৎকার করে জানায় : 'হুজুর! আসুন!'

ডাক্তার দু'জনে ঘরে ঢোকে।

গঙ্গুর সর্বাঙ্গ তখন ঘামে ভিজে গিয়েছে। বিছানা থেকে মুখ তুলে ডাক্তারদের দিকে কাতর-দৃষ্টিতে চেয়ে দেখে· সে দৃষ্টির মধ্যে ভয় আর আশা একসঙ্গে মিশিয়ে গিয়েছে।

— দরজার গোড়ায় পোষা পায়রাটিকে হাতে নিয়ে ভয়ে ভয়ে বুদ্ধু দাঁড়িয়ে ছিল। তার ভয় দূর করবার জন্যে ড লা হাভর তাকেই জিজ্ঞেস করে : 'কি হয়েছে খোকা?'

বুদ্ধু কোন জবাব না দিয়ে বোকার মতন ফ্যালফ্যাল ক'রে চেয়ে থাকে।

ড লা হাভর আদর ক'রে তার পিঠ চাপড়ে বলে ওঠে : 'ভয় কি?'

লীলা সঙ্কোচে মাথায় কাপড়ের আঁচলটা টেনে দিয়ে তার মা আর বাবার শয্যার দিকে ড লা হাভরের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

ড লা হাভর তার সহকর্মী ডাক্তার চুনীলালকেও সঙ্গে নিয়ে এসেছিল।

রুগীর দিকে এগিয়ে গিয়ে চুনীলালকে ডেকে বলে : 'টেম্পারেচারটা আমিই নিচ্ছি, দেখি।'

সজনীর শয্যার পাশে ঝুঁকে বসে, মুখের ভেতর থার্মোমিটার দিতেই ড লা হাভর দেখে, সজনী চোখ তুলে তার দিকে চেয়ে আছে, নিষ্প্রভ, স্থির-দৃষ্টি। কপালে হাত দিয়ে গায়ের উত্তাপ দেখতে গিয়ে দেখে, উত্তাপের কোন চিহ্ন নেই। নাড়ী পরীক্ষা করে, বুকেতে স্টেথেসকোপ্ বসায়। কিন্তু কোন দিক্ থেকে জীবনের কোন সাড়া নেই।

হঠাৎ তার মাথার ভেতরে জমাট বেঁধে যেন অন্ধকার নেমে আসে। সে-অন্ধকারে এতটুকু একটু আলোর রেখা কোনখানে খুঁজে পায় না।

॥ সাত ॥

ডিনারের পর, চার্লস্ ক্রক্‌টুক অভ্যাসমত তার হাভানা চুরোটটি ঠিক ক'রে ধরিয়ে নিয়ে, চা-বাগানের য়ুরোপীয় ক্লাবের বিশ্রাম-ঘরে তার নির্দিষ্ট লাল চামড়ার বিরাট আরাম-কেদারার মধ্যে গা ঢেলে দিল। পাশের ছোট টেবিল থেকে আলস্যভরে হাত বাড়িয়ে সদ্য-আগত কলকাতার স্টেট্‌স্‌ম্যান পত্রিকাখানি টেনে নেয়। কিন্তু পড়ে না, কোলের ওপর ইচ্ছা ক'রেই খুলে রাখে। তার মুখের চেহারা দেখে তখন সহজেই অনুমান করা যেতো: যে, সে চিন্তিত, মানসিক উত্তেজনায় ক্লান্ত ও পীড়িত।

চা-বাগানের মালিকদের জীবন, বিশেষত সে-মালিক যদি ক্রক্‌টুকের মতন মনে করে যে তার কাজের বাইরে জগতে আর কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই, সত্যই খুব আনন্দপ্রদ নয়। ছুটি নিয়ে ক্রক্‌টুক যখন 'হোমে' যেতো, তখন আত্মীয়-স্বজন পরিবৃত হয়ে সে তার প্রবাসে কর্ম-জীবনের কাহিনী বলতে পঞ্চমুখ হয়ে উঠতো এবং তখন সত্য আর মিথ্যায়, বাস্তবে আর রোমান্সে মিশিয়ে সে যে রঙীন চিত্রটি তুলে ধরতো, তার আসল উদ্দেশ্য হলো শ্রোতাদের বিমুগ্ধচিত্তে রূপকথার নায়কের গৌরব অর্জন করা।

ঘরের মধ্যে আগুনের আঁচ পোয়াতে পোয়াতে রীতিমত মজার ছিল তখন সে বলতো, তোমরা যারা ইংলণ্ডে ঘরের ভেতর আরামে আগুনে পিঠ দিয়ে বসে বিকালবেলা চায়ের কাপ মুখের কাছে তুলে মৌজ কর, তোমরা কল্পনাই করতে পারবে না, সাম্রাজ্যের দূর কোণে, তোমাদের সেই চায়ের আরামটুকু যোগাড়ের জন্তে আমাদের কি কঠোর অবস্থার মধ্যে না চায়ের চাষ করতে হয়, তখন শ্রোতারা রূপকথার নায়কের মত তার দিকে বিস্ময়ে চোখ তুলে চাইতো। তখন সে দ্বিগুণ উৎসাহে শুরু করতো, তাদের প্রবাস জীবনের কাহিনী, শতগুণ বাড়িয়ে, নানা রঙ ফলিয়ে...এক অসম্ভব কঠোর জীবনের চিত্র তুলে ধরতো। তার সেই কাহিনী শুনে মনে হতো, যে এই গ্রহ-তারাময় বিশ্ব-জগৎ তাকে কেন্দ্র ক'রেই যেন নিত্য আবর্তিত হচ্ছে।

তার মতে, চা-বাগানের মালিককে একই দেহে বহু মানবের বহু দায়িত্ব পালন করতে হয়। এক কথায় সে-ই হ'লো সকলের নাটের গুরু। প্রথমত চা-বাগানের ব্যবসা আর কৃষির দিক, তাকেই দেখতে হয়। তার পর ধর, কুলিদের মধ্যে নিত্য নানারকমের ঝগড়া-ঝাঁটি লেগে আছে, ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে তোমাকেই তার বিচার করতে হবে। এই সেবার একটা কুলিদের মেয়ে, প্রেমঘটিত ব্যাপারে এমন কাণ্ড ক'রে বসলো· ক্রক্‌টুকুন্ মৃদু হেসে হঠাৎ থেমে যায়...একটু কেশে গলা ঠিক ক'রে নিয়ে নিজের সঙ্কোচকে ঢাকতে চেষ্টা করে। তার পর আবার বলতে শুরু করে, শুধু কি তাই! কত রকমের মামলা! তার মধ্যে আবার ডাইনীর ব্যাপারও আছে। সময় সময় এই ডাইনীর ব্যাপার নিয়ে সেই সব কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোকদের মধ্যে এমন ভীষণ গণ্ডগোল আর উত্তেজনার সৃষ্টি হয়ে যায় যে দু'-একটা খুন-জখমও হয়ে যায়...কোন ভব্যতা নেই...কোন শৃঙ্খলা মানবার তাগিদ নেই—এইখানে হঠাৎ সে আবার থেমে যায় এবং বাড়ীর বুড়ো-কর্তার মতন বিজ্ঞভাবে ঘাড় নাড়তে শুরু করে।

তার ওপর, যখনি দরকার হবে, কোন্ সময়ে যে কি দরকার হবে, তা কেউ বলতে পারে না, তোমাকে ডাক্তারও হতে হবে। তাতেই কি রেহাই পাবে? তোমাকে দরকার হলে, ইঞ্জিনীয়ারও হতে হবে। রাস্তা তৈরি করতে হবে, তাড়াতাড়ি কাজ চলার মতন সাঁকো তৈরি করতে হবে, এমন কি ঘর-বাড়ী! এসব যে করতে হবে, তা সব তোমার পুঁটলি থেকেই খরচ ক'রে করতে হবে···দান· বিনামূল্যে তাদের দিতে হবে। হঠাৎ কোথাও কিছু নেই, পাশের পাহাড়ের চুড়ো থেকে দলে দলে নেমে এলো সশস্ত্র বুনোর দল···

শ্রোতারা চমকে ওঠে। বাস্তবতার মর্যাদা দেবার জন্যে ঘাড় তুলিয়ে- সে তখন তার সঙ্গে সংযোগ করে, অবশ্য আজকাল এ-ধরনের আক্রমণ ঘটেই না বললে হয়! হবে কি ক'রে? কঠোর শাসন ব্যবস্থা। কিন্তু গোড়ার দিকে বহু চা-বাগানের মালিককে এইসব আক্রমণ প্রতিরোধ করতে গিয়ে, বুনোদের হাত থেকে স্ত্রী-পুত্রকে বাঁচাতে গিয়ে প্রাণ দিতে হয়েছে! দুধের বাচ্চাদের অনেক সময় চুরি ক'রে বুনো অসভ্যরা পাহাড়ের ভেতর নিয়ে যেতো।

ভূতের গল্প শোনার মধ্যে যে ভয় আর আনন্দের শিহরণ একসঙ্গে মিশিয়ে থাকে, রুফ্‌টুকুকের শ্রোতাদের মধ্যে তার স্পষ্ট লক্ষণ দেখা যায়। তাতে রুফ্‌টুকুকের ঝোঁক আরও বেড়ে যায়।

চা-বাগানের চারিদিকে দুর্ভেদ্য সব জঙ্গল। তার মধ্যে ঝিল্লি বাঘার ঘুরে বেড়াচ্ছে রক্তলোভী হিংস্র সব জন্তু। রাত্রিবেলা বাংলোয় ঘুমিয়ে আছো···নিঃশব্দে প্রবেশ করলো বাঘ···বারাণ্ডায় কুকুরটা ঘুমিয়ে পড়েছে··· সেই অবস্থায় তাকে মুখ ক'রে টেনে নিয়ে গেল···বোঝ, ব্যাপারটা কি দাঁড়ায়! সেইজন্যেই অবশ্য, চা-বাগানের মালিকদের বন্দুক-চালানোয় ওস্তাদ হতে হয়···না হয়ে তো উপায় নেই···

মুখ গম্ভীর ক'রে রুফ্‌টুকুক শ্রোতাদের দিকে ফিরে চায়।

এছাড়া, আরও বহু বহু ঘটনা নিত্য ঘটছে···প্রতিদিনের নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। বন্যা আছে···ঘর-দোর বাগান ডুবে গেল···গরু-বাছুর-মানুষ ভেসে চলে গেল···বাগানকে বাগান অদৃশ্য।

এ-সবের ওপর আছে, কুলিদের মধ্যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা। পাশের শহরে যত সব রাজনৈতিক গুণ্ডারা গণ্ডগোল পাকায়, তার ছোঁয়াচ চা-বাগানে এসে লাগে! রাজদ্রোহ···বিপ্লবীদের হত্যাকাণ্ড···মধ্যে মধ্যে লেগেই আছে। অবশ্য সাক্ষাৎভাবে তার কোন হাঙ্গামা তাকে ভুগতে হয় না। তবে পরোক্ষভাবে তার জন্যে তাকে রীতিমত বেগ পেতে হয়!

বার বার এই ধরনের কাহিনী বলতে বলতে সে একজন ওস্তাদ কথক হয়ে উঠেছিল, তাই বাঙ্গের ভঙ্গীতে ওষ্ঠ-দংশন ক'রে এই কাহিনীর পরিশিষ্ট-স্বরূপ ইদানীং একটি নীতিও সে সংযোগ করতে ভুলতো না, শেষ-মেশ এ কথা ঠিক যে, চায়ের জন্যে তোমাদের যে দাম দিতে হয়, তোমরা আশ্বস্ত থাকতে পার যে সে তার ন্যায্য মূল্যই···তবে, যে লোকটা আসল সব দায়িত্ব পালন করলো, তার ভাগে যা জোটে, তা তার পরিশ্রমের অনুপাতে খুবই কম!

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থাকার পর, তার হঠাৎ মনে পড়ে, চিত্রের অন্য দিক্‌টার কথা। তাই শেষ নীতিকথার সঙ্গে এটুকুও জুড়ে দেয়, যাই বলো আর যাই করো না কেন, জীবনটা তো শুধু কাজ আর কাজ নয়: তাই আমাদের চা-বাগানে, মনে ক'রো না যে উৎসব আনন্দের কোন ব্যবস্থা নেই···ক্লাব আছে···ক্লাবের সঙ্গে নানারকমের খেলাধুলোর বন্দোবস্ত আছে···রেসের মাঠ আছে, তাতে রীতিমত রেস্ হয়···সেটা কম সাধনার কথা নয়।

সত্যি, সেটা কম সাধনার কথা নয়! ক্রফ্‌টকুকদের ক্লাব যে বিরাট বাংলোতে ছিল, সেটা পিকিং শহরে চীনা-সম্রাট উ-র প্রাসাদ আর প্যারিসের ভার্সেই প্রাসাদের গঠন-ভঙ্গীর সংমিশ্রণে এক বিচিত্র কায়দায় গড়ে তোলা হয়। ক্লাবের ভেতর বড় বড় হল-ঘর, সেলুন···এক ঘর থেকে আর-এক ঘরে

যাবার সুন্দর ব্যবস্থা। ইংলণ্ডের মফস্বল শহরের বিশ্রাম-নিকেতনের মতন তার আসবাব-পত্র, সাজ-সজ্জা। হল-ঘরের এককোণে পুরনো একটা গ্রাণ্ড পিয়ানো⋯ দেয়ালে ডার্ট খেলবার বোর্ড একটার পর একটা টাঙানো⋯ ঝাপসা-হয়ে-আসা বিলিতী শিকার দৃশ্যের বড় বড় ফটোগ্রাফ⋯হুইস্কীর বিজ্ঞাপনী ক্যালেণ্ডার⋯এবং সর্বোপরি শিকার-প্রতিযোগিতার পুরস্কারস্বরূপ নানা রৌপ্য-নিদর্শন একটা টেবিলের ওপর সযত্নে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। বারাণ্ডায় এসে দাঁড়ালে, নিচে উপত্যকা ভূমিতে চোখে পড়ে, বিরাট সুসজ্জিত পোলোর মাঠ, টেনিস্ আর ক্রোকে খেলবার কোর্ট, বাগান⋯প্রত্যেকটি ঘন বেড়া আর ছায়াতরু দিয়ে চতুর্দিকে বেষ্টিত, যাতে কোনরকমে, ক্ষুধিত গরু-ছাগল, কোন বুনো জন্তু বা কালা-আদমির ঢুকতে না পারে।

এবং জীবন যে শুধু কাজ আর কাজ নয়, ক্লাবের ঘরে বসে ক্রফ্‌ট্‌কুক্ সেই কথাই ভাবে। তবে সম্প্রতি তার একটু উদ্বেগের কারণ ঘটেছে, চা-বাগানের মধ্যে আবার ম্যালেরিয়ার মড়ক দেখা দিয়েছে। কোলের ওপর খবরের কাগজখানা বিছিয়ে রেখে, বাইরের দিকে চেয়ে ভাবে, সেই ডাক্তারটাই বা কি করছে⋯ড না হাভর⋯তার উচিত ছিল তাকে এসে খবর দেওয়া, কুলি-খাওড়ায় সংক্রমণ-নিবারণের প্রতিষেধক কি ব্যবস্থা করেছে। ড না হাভরের কথা ভাবতেই মনে পড়ে বারবারার কথা। মেয়েটা আবার অযথা ডাক্তারটাকে বড় বেশী প্রশ্রয় দেয়। এই হলো তার দুশ্চিন্তার মোটামুটি বিবরণ।

ভাবতে ভাবতে কখন আপনা থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে, 'ও লর্ড!'

কোলের স্টেট্‌স্‌ম্যানখানা তুলে ধরে।

মুক্ত বাতায়নে বারবারা তখন বাইরের সেই ঘনকৃষ্ণ রাত্রির পরিপূর্ণ অন্ধকারে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে দাঁড়িয়ে ছিল। অন্ধকারে পল্লব-মর্মরে, কচিৎ ভেকের চকিত চীৎকারে, অবিরাম ঝিল্লী ধ্বনিতে, নিশীথ-ধরণী তখনও রয়েছে সজীব। ঊর্ধ্বে নক্ষত্র-ভরা আকাশ আর নিচে অন্ধকারে একাকার ঘন

সবুজের বুক থেকে উঠছে রাত্রির অপরূপ সুবাস। বাবুর্চিরা অপেক্ষা ক'রে আছে ডিনার হাতয়ের জন্যে।

যৌন আশঙ্কায় কাঁপে তার কুমারী হৃদয়। যদি কুলি-খাওড়ায় এতক্ষণ ধরে ঘোরাঘুরির ফলে ডিনার হাতয় ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়! হঠাৎ ঘরের ভেতর পিতার অঙ্গ-সঞ্চালনের শব্দে সে সেই দিকে ফিরে চায়।

ক্রুক্‌টুকুক্ তখন পার্শ্ব-পরিবর্তন ক'রে খবরের কাগজখানা পড়বার জন্যে সবে চোখের সামনে তুলে ধরেছে, এমন সময় প্রবেশ করলেন, মিসেস্ ক্রুক্‌টু-কুক্। শুভ্রায়মান কেশগুচ্ছকে সেই প্রৌঢ়া নারী আজ সযত্নে সোনালী রঙে রঞ্জিয়েছেন, টাটকা রঙ দিবা বোঝা যাচ্ছে···সারা মুখ এবং দেহের যে-অংশটুকু ধূলায়-অবলুণ্ঠিত রঙীন সান্ধ্য-পোষাকের বাইরে স্বেচ্ছায় অনাবৃত ক'রে রাখা হয়েছিল, তাতে রীতিমত পুরু করে পাউডার মাখানো হয়েছে।

ঘরে ঢুকেই তিনি স্বামীকে জিজ্ঞেস করলেন: 'চার্লস্, হিচকক্ কোথায়, জান?'

'না,' ক্রুক্‌টুকুক্ উদাসীন গাম্ভীর্যে জানায়।

মাঝখানের দরজায় মিসেস্ ক্রুক্‌টুকুক্ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে পড়লেন। স্বামীর সেই একাক্ষর উদাসীন উত্তরে একটু যে বিচলিত হন নি, তা নয়, তবে ইদানীং তাঁর অধিকাংশ প্রশ্নের উত্তরই স্বামীর কাছ থেকে এইরকম উদাসীন এক-অক্ষরের উত্তর পেতে পেতে তিনি অভ্যস্ত হয়েই উঠেছিলেন। তা ছাড়া, তাঁর সঙ্কীর্ণ আটপৌরে মনে যে কোন সূক্ষ্ম অনুভূতির চেতনা আছে সে-সম্বন্ধে কেউই সন্দেহ করে না। ছুটির সময় মাঝে মাঝে 'হোমে' গিয়ে ইয়র্কশায়ারে তাঁর আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে বাস করা ছাড়া, মিসেস্ ক্রুক্‌টুকুকের জীবনে কোন সত্যিকারের সম্বন্ধ-বোধ ছিল না। ক্রুক্‌টুকুক্ তার কাজ নিয়েই এত ব্যস্ত থাকতো যে স্ত্রীর অন্তরচর্চা করার মত সময় তার জুটতো না। গোড়ায় গোড়ায় সেই জন্যে মিসেস্ ক্রুক্‌টুকুক্ স্বামীর অফিস-সংক্রান্ত কাজে স্বামীকে সাহায্য করবার সরল উৎসাহে মাথা গলাতে গিয়েছিলেন কিন্তু ক্রুক্‌টুকুক

প্রত্যেকবারই তাঁর সেই সাধু প্রচেষ্টাকে সযত্নে এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করে এবং শেষকালে একদিন স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয় যে তার অফিসের কাজে বাইরের অন্য কারুর এইরকম অকারণ ঔৎসুক্য-প্রকাশ সে আদৌ পছন্দ করে না। তার ফলে, মিসেস্ ক্রফ্‌টকুককে সাম্রাজ্যের এই উপান্ত প্রদেশে, সাধারণ ইঙ্গ-ভারতীয় রমণীর সঙ্গীহীন নির্জন জীবনই যাপন করতে বাধ্য হতে হয়। চা-বাগানের অন্য সব ইংরেজ কর্মচারী এবং ম্যানেজারদের বাংলো বহু দূরে দূরে বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মত ছড়িয়ে পড়ে আছে। তাই ঘন ঘন সামাজিক যাতায়াতের তেমন কোন সুযোগ বা সুবিধাও ছিল না। তাই এডওয়ার্ড নবলকের 'পেনী' উপন্যাস পড়ে, একা একা পেসেন্স খেলে অথবা বারবারা যখন ছোট ছিল, তাকে পিয়ানো বাজানো শিখিয়ে তাঁকে সময় কাটাতে হতো। কিশোরী-কালে যে সব গান শিখেছিলেন, তার মধ্যে যা তখনও পর্যন্ত বিস্মৃত হন নি, মাঝে মাঝে গাইতে চেষ্টা করতেন। তাও যখন ইচ্ছা যেতো না, তখন ঘুমিয়ে আসামের সেই দীর্ঘ দিন কাটিয়ে দিতেন। এইভাবে শনি-রবিবার ছাড়া সপ্তাহের অন্য দিনগুলো কাটতো। তাই শনি-রবিবার এলে, অন্য পাঁচদিনের এই মানসিক উপবাসকে তিনি পুরোমাত্রায় পুষিয়ে নিতে চেষ্টা করতেন। স্বভাবত বেশ বলিষ্ঠ-দেহই তাঁর ছিল, সেদিক্ থেকে অনুযোগ করবার বিশেষ কিছুই ছিল না। তা ছাড়া, জাগতিক জীবন-যাত্রার সূক্ষ্ম সব সমস্যা সম্বন্ধে সচেতন হবার মতন তাঁর মানসিক গঠন ছিল না, সেদিক্ থেকে তাঁর মনের কোন বালাই ছিল না। তাঁর অস্তিত্বের মর্যাদা সম্পর্কে তাঁর স্বামীর যথাযোগ্য চেতনার অভাব ছাড়া তাঁর ক্ষুব্ধ হবার আর-একটি মাত্র কারণ ছিল, একটি পুত্র-সন্তানের অভাব। নতুবা ক্লাব আর বাড়ী আর মাঝে-মধ্যে ছুটির সময় কলকাতায় যাওয়া, এরই মধ্যে তিনি একটা শান্ত জীবন ধারাকেই বরণ ক'রে নিয়েছিলেন।

প্রায় বছর দশেক আগে, একবার চার্লসের জ্যেষ্ঠভাই, লেস্‌লী, 'হোমে' সে ফটোগ্রাফারের কাজ করতো, সে তাঁর স্ত্রীকে জানে বলেছিল, তাঁর

ভালবাসার প্রতিদানে চার্লস্ তাঁকে রীতিমত ঠকিয়েছে। এবং এই কথা শুনতে শুনতে ক্রমশ তিনি সেই ছোট ভায়ের বন্ধুত্বের কাছে নিজেকে প্রায় সমর্পণ করতে প্রস্তুত হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে সে লোভ সংবরণ ক'রে নিয়ে তিনি জীবনের স্বল্প-পরিসর সোজা পথেই চলে আসতে পেরেছিলেন। আজ অবশ্য সে-ঘটনার কোন স্মৃতি তাঁর মনে নেই। কিন্তু সেই ঘটনার পর থেকে, কেমন যেন তিনি অনুভব ক'রে আসছেন, চার্লস্ আর তাঁর মাঝের দূরত্ব ক্রমেই বেড়ে চলেছে। তবে এই অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সেই সংগোপন পুত্র-কামনাও এতটুকু কমে নি। হিচকক্ যদিও দেখতে রীতিমত দীর্ঘাকৃতি, কিন্তু তার মুখের দিকে চেয়ে তাঁর মনে হতো, মুখটা যেন ছেলেমানুষীতে মাখানো। বড় সাধ যেতো, তাকে হাঁটুর ওপর বসিয়ে আদর করেন, তার চুলে হাত বুলিয়ে দেন, হায়! যদি সে দেখতে একটু ছোট হতো!

ডাইনিং হলে যাবার সময়, তাঁর পাশ দিয়ে চলে যেতে যেতে ম্যাকেরা হেসে তাঁর কথার উত্তরে জানিয়ে দিয়ে যায়, হিচকক্ পিঙ্‌পঙ্‌ খেলতে গিয়েছে!

ম্যাকেরা হলো ষ্টিফেনসন্ চা-বাগানের ম্যানেজার। তার পেছনেই তার স্ত্রী ম্যাবেল ঘরে ঢোকে এবং মিসেস্ ক্রফ্‌টকুককে দেখতে পেয়েই বলে ওঠে: 'মারগারেট্ ডিয়ার, একটা বড় দরকারী কথা আছে তোমার সঙ্গে···তোমার শোবার ঘরে, ওঃ ডিয়ার, কি সুন্দর পর্দা তৈরি করিয়েছ! সত্যি ডিয়ার, বল না, তোমার দরজী কত দিনে তৈরি ক'রে দিয়েছে? কত দাম নিয়েছে? জানো ডিয়ার, আমার দরজীটা ভাই, আট আ—না রোজ চাইছে···খুব বেশী চাইছে, না ডিয়ার?'

হিচককের পশ্চাদনুসরণের আশা ত্যাগ ক'রে, মিসেস্ ক্রফ্‌টকুক জোর গলাতেই তার উত্তর দেন: 'মাইডিয়ার, ডাকাতি···স্রেফ ডাকাতি ক'রে নিচ্ছে তোমার দরজী!'

সেইসঙ্গে প্রশ্নকারিণীকে উপলক্ষ্য ক'রে ক্ষুদ্র ভাষণে ছোটখাটো একটি বক্তৃতা দিয়ে ফেলেন, তার মর্ম হলো, এই চা-বাগানে যারা 'হোম' থেকে নবাগতা, তারা এই দেশের কোন কিছুই জানে না, তারাই আশকারা দিয়ে দেশী চাকর-বাকরগুলোর মাথা খায়।

'গেল শীতে, মিসেস্ টুইটি, সেই যে গো নটিংহামের সেই পাতলা মেয়েটা ...যখন এখানে এলো...'

দম নেবার জন্যে একটু থামতেই, সেই ফাঁকে মেজর বব্ ম্যাকেরা সহসা তাঁদের দু'জনের মাঝখানে এসে আমন্ত্রণ জানায়, সে আর মারগারেট ব্রীজ্ খেলায় তাদের সঙ্গে যোগদান করবে কি না?

মারগারেটকে হাত ধরে ঘরের কোণে একটা সোফার কাছে নিয়ে যেতে যেতে ম্যাবেল বলে: 'বেশ তো, একটু পরেই আমরা যাচ্ছি ডিয়ার!'

মুচকে হেসে বব্ বলে: 'দু'জন স্ত্রীলোক একত্র হলে যে কি কথাবার্তা হয় তা আমরা জানি!'

'বেয়ারা!' চীৎকার ক'রে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে ম্যাকেরা ক্রক্‌টুকের সামনে বসে পড়ে।

সঙ্গে সঙ্গে শাদা পোষাকে সজ্জিত বেয়ারা বারাণ্ডার দিকে দরজার বাইরে এসে দাঁড়ায়।

'দোঠো বড়া পেগ্, চার্লস্, কি বল, তোমার তো একটা চাই?'

এক নিঃশ্বাসে সে বলে ফেলে।

ক্রক্‌টুক্ ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায় এবং কাগজখানা বন্ধ ক'রে রেখে দেয়। তার মনের ভেতর তখন স্টেট্‌স্‌ম্যানের পাতার ভেতর থেকে প্রবেশ করছে দুর্দান্ত বিক্ষোভ।

ক্লান্ত দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে ব'লে ওঠে: 'আবার পাজীরা কলকাতায় শুরু ক'রে দিয়েছে।'

স্টেট্‌স্‌ম্যান কাগজখানা তুলে পড়তে আরম্ভ করে:

"কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন-উৎসব উপলক্ষ্যে যে মেয়েটি স্টুয়ার্ট জ্যাক্সনের উপর গুলিবর্ষণ করে, তাহার তদারক করিতে গিয়া পুলিস একটি বিরাট ষড়যন্ত্রের সন্ধান পাইয়াছে।"

ম্যাকেন্না মাথা দিয়ে ওঠে : 'এ নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কি হবে? ও তো লেগেই আছে!'

আজ আর রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করতে তার মন চাইছিল না।

বাবুর্চি কাছেই দাঁড়িয়েছিল এবং ম্যাকেন্নার উত্তর সে শুনতেও পেয়েছিল। সে বেশ ভালরকমই জানতো, যদি ম্যাকেন্নার মেজাজ ভাল থাকতো, তাহলে এই ব্যাপার সম্পর্কে সে কি মন্তব্য প্রকাশ করতো। ড লা হাভরের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হবার পর থেকে, সে এইসব আত্মসর্বস্ব ইংরেজ-ভদ্রলোকদের সাম্রাজ্য-গঠনদম্ভ সম্পর্কে সমস্ত যুক্তি-তর্কের অসারতা মর্মে মর্মে অনুভব করেছিল। তাই প্রতিদিন সেই সব একঘেয়ে বাঁধাধরা পুরনো বুলি শুনতে শুনতে তার আর কোন নতুনত্বই লাগতো না···সেই সব মূল্যহীন দম্ভ-উক্তি বার বার একইভাবে এবং একই ভাষায় উল্লেখিত হওয়ার দরুন আপনা থেকেই যেন পচে গিয়েছিল।

'যত সব ব্লাডি ফুলের দল···ন্যাশানালিষ্ট! অকারণে গভর্নমেন্টকে সব সময়ই গালাগাল দেওয়া হলো তাদের একমাত্র কাজ···গভর্নমেন্ট শুধু বসে বসে দেশের রক্ত শোষণ করছে! আরে মূর্খ, তারা ভেবে দেখে না, আমরা আসবার আগে, তাদের কি অবস্থা ছিল? রাত দিন এ-ওর গলা কেটে বেড়াচ্ছে, একদল আর-এক দলকে উচ্ছেদ করবার জন্যে ছোরা তুলেই আছে। কে আনলো এই অনাচারের মধ্যে আইন আর শৃঙ্খলা? সুসভ্য গভর্নমেন্টের মর্যাদা! আমরা যে মুহূর্তে চলে যাব সেই মুহূর্তেই জাপ আর জার্মানরা এদের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বে না? তার পর, ব্যবসা বাণিজ্য? চোখ যদি থাকে তাদের, দেখুক, এই চায়ের ব্যবসায় কি উন্নতি করেছি আমরা। দেশের লোকের অবস্থা না ফিরলে বছরে বছরে জনসংখ্যা বাড়ছে কি ক'রে? এই তো আমাদের

চা-বাগানের, পথে ঘাটে ছোট ছেলেতে ভর্তি···সমস্ত আসামকে আমরা মৌচাকের মত মধুতে ভরে দিয়েছি।

ক্লাবের আত্ম-স্ফীত এইসব সভ্যদের উন্মত্ত মূর্খতা স্মরণ ক'রে বারবারা অন্তরে পীড়িত হয়ে ওঠে। একথা মনে করতে সে লজ্জিত হয়ে পড়ে যে, একদা সে নিজে এই সব শূন্যগর্ভ কথায় তার দেশবাসী অন্য সকলের মতনই বিশ্বাস স্থাপন করেছিল। বিশেষ ক'রে যখন মনে পড়ে, প্রথম যখন সে এখানে আসে, ডু লা হাভরের তিক্ত সমালোচনা আর ব্যঙ্গ শুনে সে কিরকম ক্ষিপ্ত উত্তেজিত হয়ে উঠতো···তার উদ্ধত আত্মবিশ্বাসে ডু লা হাভরকে প্রতি-আক্রমণ করতো এবং তার প্রত্যুত্তরে মনে পড়ে ডু লা হাভর তার শাণিত বিদ্রূপ বাণে কিরকমভাবে তাকে বিপর্যস্ত ক'রে তুলতো। তার পর একদিন, আজও তার স্পষ্ট মনে পড়ে, তারা দু'জনে ঘোড়ায় চড়ে দূর-পর্বত পথে স্বচ্ছ-সলিল গিরি-নির্ঝরিণী দেখতে গিয়েছিল, সেদিন ডু লা হাভর তার মনের সামনে তুলে ধরে এইসব নিপীড়িত মানুষের অন্তরের শত ব্যথা-বেদনা, যা কোনদিন তারা নিজেরা মুখ ফুটে প্রকাশ করে না। তাদের দীর্ণ অন্তরের নিভৃত কন্দরে সমাহিত সেই অব্যক্ত, অস্পষ্ট আশা-আকাঙ্ক্ষা সেদিন সেই প্রথম সে স্পষ্ট অনুভব করে। সহসা সেদিন সে অন্তর থেকে উপলব্ধি করে, যে সহজ সত্যকে সে ধারণার মধ্যেই আনতো না, যে তারই মতন তারাও মানুষ, তারই মতন এই পৃথিবীর আনন্দ-উৎসবে তাদেরও আছে নিমন্ত্রণ। এর পূর্বে সে, এইসব কুলিদের গরীব, ভাগ্যাহত মানুষ তাদের বিবেচনার বাইরে বলেই ধরে নিয়েছিল। ধরে নিয়েছিল যে, তারা শুধু 'বেবী অস্টিনে' চড়ে হাওয়া খেয়ে বেড়াবে আর কাজ যা কিছু আছে তা ওরাই করবে, এই হলো স্বয়ং বিধাতার বিধান। এখন যে তার কোন ব্যবহারিক পরিবর্তন ঘটেছে তা নয়। এখনও সেই আগের মতনই, সব জিনিস সে শুধু মনে মনে স্বীকার ক'রে নিয়েছে মাত্র। অতীতে একদিন তাদের সম্বন্ধে বিরূপ ছিলাম বলে, আজ সেই ভুল সংশোধন করতে গিয়ে সহসা কি ক'রে এইসব স্বার্থ-

বঞ্চিত শ্রমিকদের আলিঙ্গনে বাঁধতে পারি? তবে সে বুঝেছিল, জ দা হাভর কিন্তু তাই ক'রে চলেছে। তা ছাড়া, নিজের সংগোপনে সে জ দা হাভরের এই কুলি-প্রীতিকে অন্য আর-এক কারণে আজও সহ্য ক'রে উঠতে পারতো না। যে-অনুরাগ তার প্রাপ্য, তাতে কেন ভাগ নিয়ে বসে আছে তারা? সর্বদাই যদি জ দা হাভর তাদের কথা ভাববে, তাদের সমস্যা সমাধানের জন্যে ল্যাবরেটরীতে আবদ্ধ থাকবে, তাহলে তার জন্যে এতটুকু সময় সে দিতে পারে? তাই তার এই কুলি-প্রীতি সে সহ্য করতে পারে না··· প্রতিবাদ জানায়। তাছাড়া, সব সময়ই সেই কথা সকলের সামনে এমনভাবে জাহির করারই বা কি দরকার? কিন্তু একটা জিনিস সে বুঝতে পারে না, বাইরে যতই সে তাকে প্রতিবাদ করে, ততই তার অগোচরে মনের ভেতরে সে তারই দিকে ঝুয়ে পড়ে। জ দা হাভর প্রতিনিয়ত তাকে তীব্রভাবে উত্তেজিত করে, তার মনের কথা সাহস ক'রে প্রকাশ করবার জন্যে। কিন্তু শত চেষ্টা সত্বেও সে আত্ম-গোপনতার খোলস ছাড়িয়ে বাইরে বেরুতে পারে না।

তবু জ দা হাভর তাকে বিমুগ্ধ করেছে। অন্তরের যে-শক্তির প্রেরণায় সে শতকর্মের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছে, তার অনাড়ম্বর বলিষ্ঠ প্রকাশ বাবুবারাকে মুগ্ধ করেছে। সব সময় তার ভেতর থেকে যে তীব্র কর্ম-প্রেরণা আপনা থেকে উৎসারিত হয়ে পড়ছে, যে আবেগময় অনুরাগ আলো-বাতাসের মত সহজ হয়ে তার মধ্যে রয়েছে, যে-আবেগের মধ্যে এতটুকু আবিলতা নেই, কোন বাধা যাকে দমন করতে পারে না, বাবুবারাকে তা তীব্রভাবে আকর্ষণ করে। জানলার কাছে সরে গিয়ে আবার সে বাইরের অন্ধকারের দিকে চেয়ে থাকে। অন্ধকারে রেখাহীন সেই ঘন অরণ্য যেন তারই মতন চিন্তা-মৌন স্থির হয়ে আছে। সেই নিবিড় অন্ধকারে তার মন ডুবে যায়। যেন সে শুনতে পায়, তার নিজের অন্তরে, জ দা হাভরের ক্লান্ত কণ্ঠস্বর···বিদ্রূপ আর বেদনায় মেশা তার নিজস্ব ভঙ্গীতে চা-বাগানের করুণ ইতিবৃত্ত সেদিন যা সে বলেছিল···

তাদের চা-বাগান যে-অঞ্চলে, একদিন এইসব অঞ্চল স্বাধীনভাবে পার্বত্য দলপতিরা শাসন করতেন। একদা রবার্ট ব্রুস নামে একজন ইংরেজ কল্চিৎ আহোম-রাজার বিশ্বাস উৎপাদন ক'রে তাঁর রাজধানীতে এসে বসবাস স্থাপন করে। হঠাৎ একদিন ব্রুস খবর পেলো যে, এই রাজ্যের জঙ্গলে বুনো চা-গাছের বন আছে। সেই সংবাদ সে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে জানায় এবং এই বুনো গাছ সম্পর্কে তাঁদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর লোক এসে পরীক্ষা ক'রে দেখলো যে খবরটা সত্য এবং বাজারে তখন একমাত্র চীনের যে চা প্রচলিত ছিল, তার চেয়ে এই চা-পাতা বহুগুণে উৎকৃষ্ট। সেই সময় সেই আহোম-রাজার সঙ্গে তার এক প্রতিবেশী রাজার যুদ্ধ বেধে যায় এবং ব্রুস চেষ্টা-চরিত্র ক'রে এই যুদ্ধে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে তার প্রতিপালক রাজার সাহায্যে উদ্বুদ্ধ করে। জন কোম্পানী আনন্দে সাহায্য করতে স্বীকৃত হলো এবং তাদের স্বভাবসিদ্ধ অতি-সুপরিচিত মধ্যস্থতা করবার নীতি এ-ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করলো। এবং যেহেতু ইংরেজ নিজের ভাগে কি পড়তে পারে তা আগে থাকতে না ঠিক ক'রে কারুর জন্যে কোন কাজে হাত দেয় না, তাই এক্ষেত্রেও তারা মধ্যস্থতা করতে এসে অচিরকালের মধ্যে দু'জন রাজাকেই সিংহাসনচ্যুত করলো এবং সুমীমাংসার উদাহরণ স্বরূপ দু'জনকার রাজ্যই দখল ক'রে নিল। দেখতে দেখতে কোটি স্বর্ণ-মুদ্রার মূলধন নিয়ে ইংলণ্ডে সুবিখ্যাত আসাম চা-কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হলো। দেখতে দেখতে কোম্পানীর শ্রীবৃদ্ধি সাধন হতে লাগলো এবং তার দেখাদেখি অন্যান্য বহু কোম্পানী গজিয়ে উঠলো। বিস্তীর্ণ ভূ-খণ্ড নিয়ে চায়ের চাষ শুরু হয়ে গেল। ভারতবর্ষের মধ্যে তখন দুর্ভিক্ষ বহু প্রদেশে হাহাকার তুলেছে। তারই সুযোগে এইসব কোম্পানী সারা দেশ থেকে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত লোকদের সংগ্রহ করতে লেগে গেল। মৃত্যুর হাত এড়াবার জন্যে দলে দলে লোক আসামের চা-বাগানের দিকে ছুটলো। এবং এইসব বিদেশী ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানদের সাহায্য করবার জন্যে ভারত-গভর্নমেন্ট চা-বাগানের ইংরেজ-পরিচালকদের

হাতে ক্ষমতা দিলেন, চুক্তি-ভঙ্গ-কারী কুলিদের কারারুদ্ধ ক'রে রাখবার এবং প্রয়োজন হলে মৃত্যু-দণ্ড পর্যন্ত দেবার। অর্ধ শতাব্দীর আন্দোলনের ফলে সেই ক্ষমতা চা-বাগানের পরিচালকদের হাত থেকে গভর্নমেণ্ট-নিযুক্ত ম্যাজিস্ট্রেটদের উপর এসে বর্তায়।

এই দীর্ঘ কাহিনীর উপসংহারে, সেদিন গুপ্ত দা হাতভর হেসে বলেছিল, এইসব একচেটিয়া ব্যবসাদারদের সাহায্যে, সকলেই আশা করেছিল যে মহানুভব বৃটিশরাজ চা-বাগানের আশে-পাশে সমস্ত উপজাতি এবং কুলিদের কালক্রমে রীতিমত ভদ্রলোক ক'রে তুলবে এবং চাই কি, তারা দু'দিন পরেই ছেঁড়া কাপড়ের ওপর মাথায় টপ্ হ্যাট চড়িয়ে ঘুরে বেড়াবে!

তা হোক্ আর নাই হোক্, এটা কিন্তু বাবুবারা লক্ষ্য করেছিল যে, চা-বাগানের ইংরেজ-পরিচালকরা রবার্ট ব্রুসের সেই ব্যক্তিগত দুঃসাহসিকতা এবং বীরত্বের কথা ভোলে নি; তারা তাই সগর্বে তা উল্লেখ করতো এবং এত বড় একটা সাম্রাজ্য-গঠনে সেদিনকার ইংরেজরা যে কতখানি মাল-মসলা যুগিয়েছিল, কৃতজ্ঞ অন্তরে তা স্মরণ করতে তারা ভুলতো না। কিন্তু বহু চিন্তা ক'রেও সে কিছুতেই ভেবে ঠিক করতে পারে নি, সেণ্ট এণ্ড্রুর জন্ম-দিন কেন আসামের চা-বাগানে জাতীয় উৎসবের দিন বলে পরিগণিত হয়, কেন জনি-ওয়াকার হলো আসামের উৎসব-পানীয়? তা ছাড়া একথাও সত্য যে, এই সব বঞ্চিত মানুষ যে-নিম্নজগতে বাস করে, বাবুবারা কোন দিন সেই চির-অভাবগ্রস্ত জগতের ধুলো, কাদা, মাটি নিজের চোখে দেখে নি।

আপনার মনে সে আক্ষেপ ক'রে ওঠে, সত্যি, বড় দুঃখের কথা!

কিন্তু সে-সম্পর্কে সে কি করতে পারে? কেন অপরের ভাগ্যের অবিচারের কথা ভেবে নিজের জীবনকে নষ্ট করা? কেন অপরের জন্যে দুশ্চিন্তায় সর্বদা নিজেকে ভারাক্রান্ত ক'রে রাখা? তারা দু'জনে পরম আনন্দে তো জীবন

কাটিয়ে দিতে পারে। কিন্তু স্থ লা হাভয়ের সঙ্গে কোন তর্ক সে করতে পারে না, তার কথার ওপরে নিজের কোন যুক্তিকে ধরে রাখতে পারে না। যখনই সে প্রতিবাদ করতে গিয়েছে, স্থ লা হাভর কথার ঝড়ে তা উড়িয়ে ফেলে দিয়েছে। ফলে, এইটুকু সে বুঝেছে যে, তারই অন্তর শুধু ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যায়···সে আর তার ভালবাসার মাঝখানে পড়ে থাকে তারই ক্ষত-বিক্ষত দীন অন্তর। সেই দীন অন্তর নিয়েই সে আজ অপেক্ষা ক'রে আছে, তারই শুধু দেখা নেই। অন্ধকারে পড়ে আছে নিশীথ ধরণী আর ঘন-অরণ্যের নিষ্প্রাণ নীরবতা।

সহসা নিজের সম্বন্ধে সে সচেতন হয়ে ওঠে···এমনিভাবে নিজের অসহায় দৈন্য সকলের সামনে পরিস্ফুট ক'রে তুলে ধরা তো ঠিক নয়। মা-বাবার সঙ্গে সেই পুরনো যুক্তি-তর্ক তুলে অসহায় বাদ-বিসংবাদ ক'রেই বা কি লাভ? তার চেয়ে বরং মিসেস্ ম্যাকেরার পাশে চুপটি ক'রে বসে থাকাই ভাল!

কফ্‌টকুক্‌দের আলোচনা তখন জোরেই চলছিল। আত্ম-চিন্তার জাল ভেঙে বার্‌বারা ঘরের দিকে যেতেই শোনে তার বাবা বলছে:

'চা-বাগানে একজনের ম্যালেরিয়া হয়েছে।'

ম্যাকেরা তখন আরামে গ্লাসে চুমুক দিচ্ছিল। ভ্রূ-কুঞ্চিত ক'রে আগত-প্রায় তন্দ্রাকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে ম্যাকেরা বলে ওঠে: 'ওহ্!'

বার্‌বারা যখন মিসেস্ ম্যাকেরার প্রায় কাছে এসে পড়েছে তখন তার কানে এলো, ম্যাবেল তার মাকে বলছে:

'ওকে 'হোমে' পাঠিয়ে দিতে পার না?'

হঠাৎ বার্‌বারাকে তাদের দিকে এগিয়ে আসতে দেখে মিসেস্ ম্যাকেরা সঙ্কুচিত হয়ে তাড়াতাড়ি অন্য কথা পাড়ে:

'হাঁ, যা বলছিলাম ডিয়ার, প্রেম যখন আসে তখন হঠাৎ-ই আসে···কোথা থেকে কি ক'রে যে আরম্ভ হয়, কেউ বলতে পারে না। না, ডিয়ার? আমার নিজের কথাই ধর···একটা ইঁদুর···এই যে বার্‌বারা···এসো···এসো···বসো!'

বারবারা মৃদু হেসে, সামনের টেবিল থেকে একটা সিগারেট তুলে নেয়··· ধীরে সিগারেটটা ধরিয়ে আপনার মনে এক পাশে গিয়ে বসে।

ম্যাবেল হঠাৎ জোরে গেঁয়ো হাসি হেসে ওঠে। দু'বৎসর ক্লাবে ঘোরা-ফেরা করা সত্ত্বেও মাঝে-মধ্যে জন্মগত সেই গেঁয়ো-হাসি অতর্কিতে আজও দেখা দেয়। সে আবার বলতে শুরু করে: 'আমার মত কি জান? একটা না একটা বাতিক সকলেরই আছে। এমন কি আমার ম্যাম্···অবশ্য তাঁকে আমি অশ্রদ্ধা দেখাচ্ছি না···কি বলবো ডিয়ার, তাঁর ছিল ইঁদুর দেখলেই··· ব্যাস্! যেই কেউ বলেছে, ইঁদুর, আর অমনি মূর্ছা হয়ে গেল···মার্কালের গাউন যেন গলক্-বল গিলে খেয়ে ফেলেছে···'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও বারবারা হেসে ফেলে। বলে: 'থামুন!'

কিন্তু ম্যাবেল থামে না।

'সে ক্ষেত্রে একবার কল্পনা ক'রে দেখ, ম্যাম্ হঠাৎ রান্নাঘরে ঢুকে দেখতে পেলো, একটা ইঁদুর রান্নাঘরের মেঝেতে বসে দিব্য আরামে গোঁফে তা' দিচ্ছে!'

বারবারা বুঝতে পারে, ম্যাবেলের এই আষাঢ়ে গল্প এখন কিছুতেই থামছে না। তাই সে উঠে পড়ে, 'বড় তেষ্টা পেয়েছে···দেখি···'

এই ধরনের আষাঢ়ে গল্প বলে ম্যাবেল প্রায়ই ক্লাবের মেয়েদের আসর জমাতো। বারবারার যে খারাপ লাগতো তা নয়। কিন্তু আজ কোন কিছুতেই তার মন বসছিল না।

ডিনার-ঘরের দিকে এগিয়ে যেতে দেখে, ঘরের ভেতর থেকে হার্ট, ম্যাক্ ট্রইটি আর হিচকক্ বেরিয়ে আসছে।

হার্টের হাতে পরিপূর্ণ হুইস্কীর পাত্র দেখে বারবারা তাকেই জিজ্ঞেস করে:

'খানসামা আছে তা হলে?'

'আছে···কিন্তু কষ্ট ক'রে তোমাকে আর তার কাছে যেতে হবে না··· তাকেই বাইরে মাল-পত্র নিয়ে আসতে বলেছি···আসছে এক্ষুনি···চল··· আমাদের সঙ্গেই না হয় একটু বসলে!'—হার্ট আবেদন জানায়।

বারবারা হেসে ঘুরে দাঁড়ায়···তাদের আগে আগে এগিয়ে চলে।

ঘরের মাঝামাঝি যে চেয়ারখানা ছিল, সেটায় গদি সব চেয়ে আরামদায়ক ব'লে হার্ট আর র‍্যাল্‌ফ্ দু'জনেই আগে-ভাগে দখল করবার জন্যে ছোটে। হার্টই আগে গিয়ে পৌঁছোয়। তার প্রতিদ্বন্দ্বী র‍্যাল্‌ফ্ চাষীর ঘরের ছেলে বলেই চেহারার দিক থেকে একটু ভারিক্কি ছিল, তাছাড়া সুরার কৃপায় কিঞ্চিৎ বেসামাল হয়েছিল। ছিচকক্ গ্রীস্-প্রতিমূর্তির স্টাইলে ঈষৎ ঘাড় বেঁকিয়ে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে। সুগঠিত, দীর্ঘ দেহ, সুন্দরই বলা চলে এবং সে-সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ সচেতন। তবে স্বভাবতই একটু লাজুক; টুইটি পিয়ানোর কাছে গিয়ে টুলটা টেনে নিয়ে বসে, পাশের স্ট্যাণ্ড থেকে গানের কাগজগুলো তুলে নিয়ে নাড়াচাড়া ক'রে দেখে।

চেয়ারের জন্যে হার্টকে সেইভাবে ছুটতে দেখে, বারবারা তার অবলুণ্ঠিত সান্ধ্য-পোষাকের জন্যে শঙ্কিত হয়ে ওঠে। একথা ভাবতে তার বিরক্ত লাগে যে ছোট ছেলেদের মতন চেয়ার নিয়ে টানাটানি করতে এখনও এদের, এতটুকু লজ্জায় বাধে না। চেয়ার পর্যন্ত না গিয়েই, বারবারা পায়ের ওপর ভর দিয়ে নাচের ভঙ্গীতে ঘুরে দাঁড়ায় এবং ডিনার ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে খানসামাকে ডাকে।

সেখান থেকেই সে শুনতে পায় র‍্যাল্‌ফ্ জিজ্ঞেস করছে, 'কি হয়েছে আজ ওর?' হার্ট কানে কানে কি যেন মৃদুস্বরে জবাব দেয়···বারবারা শুধু শুনতে পায়, 'একদা এক যে ছিল তরুণী, বারবারা যার নাম···'

বারবারার মনে হলো, এক্ষুনি ফিরে গিয়ে লোকটার মুখের ওপর সজোরে চপেটাঘাত করে। কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে হয়, ওদের কথায় কান দিতে গেলে, তারই ক্ষতি হবে, কেননা, সে রাগে নিজেকে সংযত রাখতে পারবে না ···নিজের মর্যাদা নিজেই হারিয়ে ফেলবে। তার সারা দেহের ভেতর দিয়ে নিরুদ্ধ নৈরাশ্যের একটা তরঙ্গ-বিক্ষোভ তাকে নাড়া দিয়ে যায়···দু'চোখ জলে ভরে আসে। মনে হয়, বুকের ওপর যেন একটা পাথর চেপে বসে আছে।

বারাণ্ডার ধারে দরজার কোণে টবের ওপর যে পাম গাছটা ছিল আপনার মনে তার পাতাগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করে। টুইটি তখন সেই পুরনো পিয়ানোটার অঙ্গে আঘাত শুরু ক'রে দিয়েছে এবং তার ভেতর থেকে গমকে গমকে আর্তনাদ জেগে উঠছে। সমস্ত ব্যাপারটাই বারবারার কাছে নিরর্থক কুৎসিত মনে হয়। এবং যতই সে ভাবে, ততই সে নিজের ওপর নিজে রেগে ওঠে, কারণ যাদের মধ্যে তাকে বাস করতে হচ্ছে, তাদের সমস্ত অস্তিত্বের মধ্যে যে বিরাট অন্তসারশূন্যতা আছে, তা মর্মে মর্মে সে উপলব্ধি করছে, অথচ তার এমন সাহস নেই যে তার বিরুদ্ধে সে প্রতিবাদ ক'রে ওঠে, উল্টে তারই সঙ্গে তাল দিয়ে তাকে চলতে হচ্ছে। তাই সে ক্লাবের সভ্যদের নিরর্থক ইতরামির বিরুদ্ধে নিজের নীরব আত্মগ্লানিতেই তার প্রতিবাদ জানাতে চেষ্টা করে।

মাসের পর মাস, প্রত্যেক রবিবার, এই ক্লাবে তারা সকলে, তার মধ্যে সে নিজেও আছে, যে-যার সেরা সান্ধ্য-পোষাকে সুসজ্জিত হ'য়ে নিজেদের জাহির করে, একমাত্র চেষ্টা কোনরকমে নিজেদের যেটুকু সৌন্দর্য আছে তাকে মেজে-ঘষে পরস্পরের নাকের সামনে তুলে ধরা, অভিনেতার মতন সব সময় মুখের ওপর একটা মুখোশ পরে থাকা, ব্যবসা-বাণিজ্য অথবা রাজনীতি নিয়ে না বুঝে বিজ্ঞের মত লম্বা-চওড়া কথা বলা, মাঝে-মধ্যে পুরনো পচা রসিকতার পুনরাবৃত্তি করা এবং যে-কথার সঙ্গে তাদের কোন যোগই নেই অথবা যে-গানের সঙ্গে তাদের মনের কোন সঙ্গতি নেই, সেই সব কথা আর সেই সব গানে খানিকটা কোলাহলের সৃষ্টি করা...এই নিয়েই তাদের ক্লাবের জীবন। সারাক্ষণ শুধু শত-যত্নে নিজের মনের আসল কথাকে চেপে রেখে বাইরে আত্মপ্রবঞ্চনা ক'রে বেড়ানো। হয়ত তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলতে চাইতো কিন্তু যে মুহূর্তে তাদের মনে হতো যে, হয়ত সে-সব কথা শুনে সঙ্গীরা হেসে উঠবে, অমনি তা মনের কোণে চাপা পড়ে যেতো। এবং তার পরিবর্তে তারা অলীক সব চিন্তা, মিথ্যা অনুভূতি সজ্ঞানে সৃষ্টি করতো এবং তাকে

যে তারা নিজেদের আরও হাস্যকর ক'রে তুলতো, সে বিষয়ে তাদের কোন চিন্তাই ছিল না।

আজ সে অন্তত তার মানসিক অভিজ্ঞতার এমন স্তরে এসে পৌছিয়েছে যেখান থেকে সে তাদের এইসব কাণ্ড দেখে হেসে উঠতে পারে। সত্যি সত্যি তার মনে সে যেন অট্টহাস্য ক'রে ওঠে। হয়ত তারা ভাববে, তার মাথার গোলমাল দেখা দিয়েছে। কিন্তু সে তো জানে, মস্তিষ্ক-বিকৃতির কোন কারণই ঘটে নি। সে তার স্বচ্ছ স্ব-প্রকাশ জীবন তাদের নাকের সামনে তুলে ধ'রে তাদের সেই আত্মপ্রবঞ্চনা-সঙ্কুচিত বিড়ম্বিত হীন অস্তিত্বের বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই প্রাণ-খুলে হেসে উঠতে পারে। কেন তারা এই পৃথিবীর সহজ সরল লোকদের মতন সোজা কথা বলতে পারে না? কেন তারা সব সময়েই ভদ্রবেশী ভণ্ড সেজে থাকে? তাদের নোংরা গান আর জঘন্য সব গল্প শুনে তাদের নৈতিক বুদ্ধির স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। কেন তারা স্তু লা হাভরের মতন নিজের মনের কথা অকপটে প্রকাশ করতে পারে না? স্তু লা হাভরকে এই জন্যেই তার এত ভাল লাগে। প্রথম প্রথম তার অকুণ্ঠ আত্ম-প্রকাশে সে রীতিমত বিচলিতই হতো। কিন্তু ক্রমশ সে বুঝতে পারলো, তার সেই অকুণ্ঠ আত্মপ্রকাশের আড়ালে রয়েছে একটা খাঁটি মানুষ···সত্যের জন্যে নির্ভীক অন্তরে, সব আত্মপ্রবঞ্চনার ঊর্ধ্বে উন্মুক্ত তলোয়ারের মত দীপ্ত বলিষ্ঠ ভঙ্গীতে যে নিজেকে তুলে ধরতে পারে। বাবুবারা জানে স্তু লা হাভরের অন্তরের গহন গভীরে আগ্নেয়গিরির অগ্নিস্রাবের মত জ্বলছে অকপট সত্য-অনুভূতি, যে কোন্ মুহূর্তে তা তীব্র শিখায় সমস্ত মিথ্যাকে দগ্ধ ক'রে ভস্মীভূত করতে পারে।

হঠাৎ বাইরে অন্ধকারে শান-বাঁধানো রাস্তায় ঘোড়ার খুরের শব্দ উঠলো।

পাশের ঘর থেকে তখন সুরাসিক্ত কণ্ঠে সম্মিলিত সঙ্গীত-ধ্বনি কানে এসে আঘাত করে···সেই একঘেয়ে "টপ্-হ্যাট" সঙ্গীত। বাবুবারার মনে হয়, সেই মুহূর্তে যেন সে ছুটে বেরিয়ে চলে যায় বহুদূরে যেখানে সেই ধ্বনি কানে এসে

আর আঘাত করবে না। হাতের পাত্রটি নামিয়ে রেখে সে সবেগে বাইরে বেরিয়ে পড়ে।

স্ত লা হাভর তার সহকর্মী চুনীলালকে সঙ্গে নিয়ে বারাণ্ডার দিকে উঠে আসছিল। দু'জনের পরনে একই রকমের পোষাক, মাথায় শোলার আতপ-নিবারক টুপী, গায়ে শার্ট এবং ব্রিচেস্…পায়ে কাদায়-ভরা রাইডিং-বুট…ক্লাবের সেই নৈশ-জীবনের আবহাওয়ার সঙ্গে সেই পোষাককে কোন মতেই মানান বলা যায় না।

বাব্‌বারা আকুলভাবে ডেকে উঠলো : 'হ্যালো!'

স্ত লা হাভর এগিয়ে এসে তার হাতটা মুঠোর মধ্যে নিয়ে জোরে নিপীড়ন করে। সেই মুহূর্তে, সেই অন্ধকার রাত্রির মধ্যে, তার অন্তরের বাধাবন্ধনহারা আকুলতায়, স্ত লা হাভরের মনে হয়, বাব্‌বারা যেন আকাশ-ভ্রষ্ট এক ফালি সূর্যের আলো…আত্ম-চেতনার নামগন্ধহীন স্বভাব-শিশু…বিকাশোন্মুখ কামনার রঙে ঝলমল করছে একটা জীবন্ত সুষমা। মনে পড়ে যে-দিন প্রথম সেই স্বচ্ছ হাসির বিদ্যুৎ-বিভা তার অন্তরকে নিমেষের মধ্যে উদ্ভাসিত ক'রে তুলেছিল, তার চোখের সেই কৌতুক-ভরা অনর্থ তার সমস্ত চেতনাকে সেদিন মদির-সিক্ত করেছিল ; পীনোন্নত বক্ষের সেই রেখাঙ্কিত আমন্ত্রণ, তন্বু-দেহের লীলা-ভঙ্গিমা, সেদিন অনায়াসে তাকে জয় ক'রে নিয়েছিল।

হাত ধরে বাব্‌বারাকে নিয়ে সে বসবার ঘরের দিকে এগোয়…পেছনে চুনীলাল।

তার নিজের চিন্তায় সে যেন মশগুল হ'য়ে ছিল, তাইপারিপার্শ্বিকের প্রতি লক্ষ্য না রেখেই সকলকে অভিবাদন জানায় : 'হ্যালো এভ্‌রিবডি!'

স্ত লা হাভরের ভাগ্য ভাল যে সেই সময় ঘরের অধিকাংশ অধিবাসীই টপ্‌-হ্যাটের কোরাসে মত্ত ছিল, তাই তাদের আগমন ম্যাকেরা আর জক্‌টুকুক ছাড়া অন্য কেউ লক্ষ্য করে নি।

জক্‌টুকুক বলে উঠলো : 'কি ব্যাপার?'

'যে ক'টা বাড়ীতে অসুখ দেখা দিয়েছে, সেগুলোকে আলাদা থাকবার ব্যবস্থা ক'রে কুলি-ধাওড়াটার চারদিকে ডিসেন্‌ফেক্‌ট্যাণ্ট ছড়িয়ে এলাম। কিন্তু মেজর ম্যাকেরার চা-বাগানে একজন ইতিমধ্যে মারা গেল, সেই জন্যেই এখানে আসতে এত দেরি হয়ে গেল।'—ছ লা হাভর জানায়।

রুক্ষ টুকুক্‌ কপাল কুঁচকে বিরক্ত হয়ে বলে ওঠে: 'জানি না কবে এইসব নোংরা কুলির দল স্বাস্থ্যনীতি মেনে চলতে শিখবে!'

ম্যাকেরা নিস্পৃহভাবে বলে ওঠে: 'মরবে না তো কি, প্রতিষেধক ওষুধ ব্যাটারা ব্যবহার করে না কেন?'

ব্যঙ্গের হাসি হেসে ছ লা হাভর উত্তর দেয়: 'যদি তারা ঠিক জানতো যে ম্যালেরিয়ার বীজবাহী মশাটাই তাদের রক্তে জীবাণু মিশিয়ে দিয়ে যায়, তাহলে, আমার বিশ্বাস, তারা হয়ত ডিস্‌পেন্‌সারীতে হেঁটে এসে তেঁতো বড়ি খেয়ে যেতো···এবং তখন হয়ত রক্তে বীজাণুদের বংশ-বৃদ্ধি হবার আগেই ওষুধটা কাজ করতে পারতো কিন্তু তাদের ভাগ্যে ভাল যা কিছু ঘটবার তা সবই আছে ভবিষ্যতের গর্ভে···আর কোনদিন কেউ কষ্ট ক'রে তাদের সেই শিক্ষাটুকু দেবার চেষ্টা করে নি···তা ছাড়া, তাদের ব্যবহারের জন্যে যে একটা মশারী দরকার তার ব্যবস্থাও কেউ করে নি। তাই বলছিলাম, আপাতত যদি তাদের জন্যে একটা ক'রে মশারী···'

ম্যাকেরা তাকে শেষ করতে না দিয়েই হো হো ক'রে হেসে ওঠে:

'আরে, পাগলের মত বলে কি? তারা তো শোয় মাটিতে···মশারী গুঁজবে কোথায়?'

ম্যাকেরা সেই প্রস্তাবের অসম্ভবতায় হেসে ওঠে। কুলিরা মশারী টাঙিয়ে শোবে, ব্যাপারটা তার কাছে নিছক কমিক বলে মনে হয়। তখন হুইস্কীর কৃপায় তার মেজাজ রঙীন হয়েই ছিল। স্থূল মেদবহুল বিধ্যানন নেশায় লাল হয়ে উঠেছে···চোখ দু'টি প্রায় বুজে আসছে, যেন দয়া ক'রে সব জিনিসের ওপর তিনি দৃষ্টি বুলিয়ে চলেছেন। প্রায় সমাধিস্থ।

তাই সেই অপ্রীতিকর প্রসঙ্গকে বাদ দিয়ে বলে ওঠে: 'নিশ্চয়ই তেষ্টা পেয়েছে খুব? একটা পেগ…কেমন?'

কৃতজ্ঞ কণ্ঠে স্থ না হাভর জানায়: 'অসংখ্য ধন্যবাদ! তবে একটা নয়, দুটো…আমার সঙ্গে ডাক্তার চুনীলালও রয়েছেন!'

'বেয়ারা!' হেঁকে ওঠে ম্যাকেরা।

চুনীলাল একপাশে সঙ্কুচিতভাবে দাঁড়িয়েছিল, যেন কোন আদেশের জন্যে অপেক্ষা ক'রে আছে। একটা চেয়ার টেনে দিয়ে স্থ না হাভর তাকে বসতে অনুরোধ জানায় এবং নিজে একটা সোফায় বসে পড়ে।

সঙ্গীত ততক্ষণে থেমে গিয়েছে। যারা গাইছিল, তাদের মধ্যে কেউ কেউ ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে আপনার মনে গুনগুন করছিল, কেউ বা শুষ্ক কণ্ঠ ভেজাবার জন্যে বেয়ারার অনুসন্ধান করছিল।

হঠাৎ চুনীলালের ওপর দৃষ্টি পড়াতে রেগী হার্ট ঈষৎ দোদুল্যমান অবস্থায় তার সামনে এসে বলে উঠলো:

'আমার বিশ্বাস, এই ক্লাবে নিগারদের প্রবেশ নিষেধ!'

স্থ না হাভর বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত চেয়ার থেকে লাফিয়ে ওঠে:

'রেগী, ভুলে যেয়ো না ডাক্তার চুনীলাল আমার অতিথি! আর তুমি…'

রাগে তার মুখ দিয়ে কোন কথা বেরুলো না। নিজেকে আর বুঝি সে ধরে রাখতে পারে না। নিষ্ফল রাগে কম্পান্বিত দেহে দাঁড়িয়ে থাকে।

তাড়াতাড়ি আসন থেকে উঠে ম্যাকেরা রেগীকে টেনে নিয়ে যেতে চেষ্টা করে। অবশ্য রেগীর বক্তব্যের সঙ্গে এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সমাজের অন্য সকলের মতই তারও সম্পূর্ণ সহানুভূতি ছিল…

ইংরেজদের ক্লাবে ভারতীয়দের প্রবেশ নিষেধ, এই হলো সাধারণ নিয়ম। কিন্তু যেভাবে হার্ট সেই কথাটা জানালো, ম্যাকেরার মতে সেটা অন্যভাবেও জানানো যেতো। স্থ না হাভরকে আড়ালে ডেকে সাবধান ক'রে দিলেই চলতো যে, যেন সে আর কোনদিন চুনীলালকে সঙ্গে ক'রে না আসে।

তারপরে চীৎকার ক'রে রেগী হঠাৎ বেয়ারাকে ডেকে উঠলো : 'বেয়ারা!'

বেয়ারা তার আগেই ম্যাকেরার আহ্বানে এসে উপস্থিত হয়েছিল।

'বাবুকো নিকাল্ দেও!' রেগী গর্জন ক'রে ওঠে।

ক্লাব-সুদ্ধ লোক যেন বোবা হয়ে গেল এবং সকলেই একসঙ্গে উদাস দৃষ্টিতে কড়িকাঠের দিকে চেয়ে রইলো।

মহিলারা নিঃশ্বাস রোধ ক'রে রইলেন।

নীরবে চুনীলাল ধীরে ধীরে বেরিয়ে যায়।

রাগে ছ লা হাডরের দেহ কাঁপতে থাকে।

টুইটি তার কাছে এগিয়ে এসে পিঠ চাপড়ে সান্ত্বনা দেয় : 'আরে কিছু মনে ক'রো না···রেগী আজ একটু বেশী খেয়ে ফেলেছে!'

ছ লা হাডর কাঁধের ঝাঁকুনি দিয়ে তার হাত সরিয়ে দেয়। দাঁতে দাঁত চেপে বলে ওঠে : 'গুড বাই!'

তার পর তার সহকর্মীর অনুসরণ করে।

বাবুবারা দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে দেখছিল···পুঞ্জীভূত অন্ধকার আবর্তে এখুনি সেই ছু'টি লোক মিশে অদৃশ্য হয়ে যাবে। আর সব কিছু তার দৃষ্টি থেকে মুছে গিয়েছে তখন। তার মাথার ভেতরে, তার চোখের পাতার ওপর এই ঘৃণার কুৎসিত অত্যাচার, এই দম্ভের জঘন্য নির্মমতা ঘন অন্ধকারের বোঝার মতন চেপে বসেছে···আকাশ-পৃথিবী-জোড়া নিরন্ধ্র অন্ধকার···তার মধ্যে শুধু ক্ষীণ তারার মত জ্বলছে একটি মাত্র ভাবনা।

একদিকে রেগী হাণ্ট···মূর্খ, অসভ্য, অন্যদিকে ম্যালেরিয়ায় মুমূর্ষু অসহায় কুলির দল···মাঝখানে দাঁড়িয়ে ছ লা হাডর। হয়ত এই মুহূর্তে, সেই নিবিড় অন্ধকারে শিশুর মত সে কাঁদছে। বাবুবারা জানে, যদি এই ক্লাবের প্রাণহীন জড়পিণ্ডের দল তাকে আজ সেই অবস্থায় দেখে, তাহলে তারা হাততালি দিয়ে ব'লে উঠবে, মোমের পুতুল! বাবুবারা দেখেছে, প্রায়ই কথা বলতে বলতে তার কণ্ঠরোধ হয়ে আসতো, চোখে অশ্রুর বাষ্প ঘনিয়ে উঠতো···

তার অন্তরের অন্তরতম স্থল থেকে কে যেন কেঁদে বলে ওঠে, হায়, যদি এদের প্রাণ বলে কোন পদার্থ থাকতো, যদি কোন দিন এরা নিজেদের গণ্ডীর বাইরে চেয়ে দেখতে শিখতো···যদি জানতো যে জগতে বহু মানুষ আছে···বহু হতভাগ্য মানুষ···তাদের কুকুরই বল, আর গাধাই বল···তারাও বাঁচতে চায় এবং বাঁচতে পারে না বলেই বেদনা পায়···

অসহ্য অন্তর্দ্বন্দ্বে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায় তার মন। কি ভাবছে হাডসন তার সম্বন্ধে? হয়ত তাকেও ক্লাবের অন্য আর সকলের শামিলই ধরে নিয়েছে···হান্টের এই অনাচারের নির্বাক সমর্থক ব'লে হয়ত তাকেও সে ভুল বুঝছে। অসহ্য লাগে সে কথা ভাবতে। অবশ মূর্ছাতুর হয়ে আসে তার সর্বদেহ। কোনরকমে দরজার ওপর মাথাটা রেখে, বাইরে অন্ধকারের দিকে শুধু চেয়ে থাকে···

॥ আট ॥

সুদূরতম কল্পনায় গজু ভাবতে পারে নি যে এইরকমভাবে সজনী হঠাৎ তাকে ছেড়ে চিরকালের মত চলে যাবে। মৃত্যুকালে তার উন্মীলিত দুই চোখের সেই কঠিন কঠোর বদ্ধ-দৃষ্টি তার সমস্ত চেতনাকে যেন মূহ্যমান ক'রে দিয়ে গেল। চোখের সামনে প্রত্যক্ষ সে যা দেখছে তার স্বরূপ উপলব্ধি করবার মত বোধ তার মৃত্যু-অপহৃত মস্তিষ্কের ঘন-অন্ধকারে যেন হারিয়ে গিয়েছে। প্রতিদিন পাশাপাশি, এত কাছাকাছি থাকার দরুন, মনে হতো, বুঝি চিরকালই এমনি তার পাশে সে থাকবে। সব অনিত্যতার ঊর্ধ্বে সেই নিত্য অন্তরতা, অবোধ মানুষের মনে কখন নিঃশব্দে এনে দেয় অমরত্বের লোভ; তার পর সহসা একদিন যখন মৃত্যু এসে এক নিমেষের মধ্যে ছিন্ন ক'রে দেয় সেই সযত্নে-গড়া ভ্রান্তি, মন কিছুতেই মানতে চায় না, যে ছিল এই কয়েক

মুহূর্ত আগে পাশাপাশি জীবন্ত, সে আজ এখন চির-নিঃশব্দ ধামের অধিবাসী। তন্দ্রাচ্ছন্নের মত কিছুক্ষণ সে বসে থাকে, যেন দূর অজ্ঞাতলোক থেকে, বিচ্ছেদের যে বেদনা আসছে, তারই অপেক্ষায়—এখনি জোয়ারের জলের মত যা তাকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলবে! দুই হাতের ওপর মাথার ভর দিয়ে নীচুর দিকে শুধু চেয়ে থাকবে, সর্ব-অঙ্গের মধ্যে শুধু ঠোঁট দু'টি কাঁপে···মাথার মধ্যে বেদনার প্রদোষালোকের অন্ধকারে বাইরের সব চেতনার সাড়া হারিয়ে যায়।

বহুক্ষণ পরে সেই শায়িত মৃতদেহের দিকে যন্ত্র-চালিতের মত ঝুঁকে পড়তে গিয়ে, সজনীর মুখের ওপর সোজা তার দৃষ্টি গিয়ে পড়ে। মৃত্যু-অধিদেবতার সঙ্গে রূঢ় সংগ্রামের চিহ্ন তখনও তার মুখে স্পষ্ট লেখা রয়েছে··· সুপুষ্ট মাংসল গোল মুখখানি দীর্ঘ হয়ে গিয়েছে···

খোলা মুখের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে সামনের দাঁতগুলো, ক্ষয়ে ক্ষয়ে গিয়েছে···অপরিষ্কার, হলদে। এই মুখই কি গগু এতদিন ধরে দেখে এসেছে? না, তা তো নয়। জীবনের স্পন্দনে তার চেহারা তখন ছিল সম্পূর্ণ আলাদা।

হঠাৎ আবেগভরে গগু সজনীকে আলিঙ্গন করে···কিন্তু নির্বাপিত অগ্নি সেই দেহের হিম-আমন্ত্রণে সচকিত হয়ে ওঠে। কোথায় গেল সেই উত্তাপ? সহসা সেই মুহূর্তে তার সমগ্র চেতনা আলোড়িত ক'রে জাগ্রত হয়ে ওঠে, তার অবশিষ্ট পুরুষ-জীবনের সেই অতি কুৎসিত কঠোর সত্য···মৃত্যু!

সারাটা দিন নিঃসঙ্গ একাকিত্বে, আপনার মনে অতীতের স্মৃতি আর বর্তমানের বেদনায় গ্রন্থির পর গ্রন্থি সৃষ্টি ক'রে চলে। ছেলেদের ঘরের বাইরে বার ক'রে দিয়েছে। ঘরের মধ্যে শুধু সে আর সেই মৃতদেহ। একা বসে বসে শোনে শুধু তার নিজের হৃদ্‌-স্পন্দনের শব্দ। বাড়ীর কাছে প্রতিবেশীদের কারুর আসবার হুকুম নেই, কারণ অফিস থেকে তার বাড়ীকে আলাদা ক'রে দেওয়া হয়েছে, রোগের বিস্তার বন্ধ করবার জন্যে। সম্পূর্ণ একাকী সেই বেদনাকে সহ্য করবার ক্ষমতা হ্রাস হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে সে কাঁদতে শুরু করে। কখনও বা ক্ষিপ্তের মত নিজের অসহায় বেদনায়, আশাহীন ব্যর্থতায়

চীৎকার ক'রে ওঠে। আবার তৎক্ষণাৎ অশ্রু-রুদ্ধ দীর্ঘশ্বাসে স্তব্ধ হয়ে থাকে। জীবনের যত অভিজ্ঞতা,—কোনটা ভগ্ন-কলসীর মত ছিদ্রময় শূন্য, কোনটা হয়ত প্রতিদিনের অভ্যস্ত হাসি-কান্নার স্পর্শে জীবনের গতানুগতিক আনন্দে স্পন্দমান, কিন্তু প্রত্যেকটির উপরই কে যেন এক পোঁচ ক্ষুধার রঙ বুলিয়ে দিয়ে গিয়েছে। আজ তারা সকলে মিলে সেই মুহূর্তে তার দেহের ভিতর, প্রত্যেক অস্থির মধ্যে বহ্নির মত দীপ্যমান হয়ে ওঠে। যে-বহ্নিতে অকস্মাৎ সমগ্র অরণ্যকে দগ্ধ ক'রে দেয়, আজ সেই সর্বগ্রাসী অগ্নি-সমুত্থিত···বেদনার মেঘ-বাষ্প তার রাত্রির আকাশ ছেয়ে দিয়েছে।

পরের দিন সকালবেলা যখন সে উঠতে চেষ্টা করলো, দেখে জ্বরের দরুন দুর্বলতায় এবং সারা রাত্রির দুশ্চিন্তায় সর্ব-অঙ্গ অবশ হয়ে গিয়েছে। সেই সঙ্গে মনে পড়লো, স্ত্রীর পারলৌকিক কাজ করবার মতন অর্থ-সম্পত্তি তার নেই। শ্মশানে দাহের কাঠের অবশ্য অভাব ছিল না, কারণ জঙ্গলে প্রচুর-পরিমাণেই তা পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু শ্রাদ্ধ-কার্যের জন্যে তো অর্থের প্রয়োজন এবং পরলোকগত আত্মার তৃপ্তির জন্যে শ্রাদ্ধ তাকে করতেই হবে। একটা লাল কাপড় কিনতে হবে, নিয়ে যাবার জন্যে একটা খাটিয়াও দরকার। মেলায় বাজার করতে গিয়ে, সেই বাজার করাই হলো তার কাল, তাদের যা কিছু সঞ্চিত ছিল সবই খরচ হয়ে গিয়েছিল। যেদিন সে এখানে আসে, তাদের লাইনে সাহুকারের ভায়ের যে দোকান ছিল, সেখানে সে যায়। সে লোকটা সেদিন তাকে আশ্বাস দিয়েছিল, যদি কোনদিন দরকার হয়, প্রচলিত যা সুদ, তাই নিয়ে সে ধার দিতে রাজী আছে। কিন্তু সেদিন গঙ্গু জোর গলায় তাকে জবাবে জানিয়ে দিয়েছিল, না···

যখন গ্রাম ছেড়ে সে আসে, তখন সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিল, জীবনে যাই ঘটুক না কেন, কোন মহাজনের কাছ থেকে সে আর ঋণ গ্রহণ করবে না। তাদেরই জন্যে তার জীবনের যত বিপত্তি। এবং এই প্রবাস-জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত তাকে সেই ঋণের নিদারুণ অভিশাপের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

কিন্তু এখন সে কি করবে? স্ত্রীর শেষ-কার্য তো তাকে করতেই হবে। সেই বন্ধ-ঘরের মধ্যে সে কি এমনি পচতে থাকবে? তা ছাড়া, ছেলেরাও ভয়ে অনবরত কাঁদছে, ডাক্তার সাহেবও বলে পাঠিয়েছেন, মৃতদেহ এক্ষুনি দাহ না করলে রোগ চারিদিকে আরও ছড়িয়ে পড়বে।

হঠাৎ মনে পড়লো, বুটার কথা, সে তো বলেছিল, ম্যানেজার সাহেব কুলিদের মা-বাপ, বিপদে-আপদে তিনি কুলিদের সব সময়ই টাকা ধার দিয়ে থাকেন। সে ঠিক করলো দফ্তরে গিয়ে বাবুকে বলবে, তাকে সাহেবের কাছে নিয়ে যেতে। বুদ্ধুকে ডাকতে গিয়ে তার কণ্ঠস্বরে যেন একটা নতুন কোমলতা ফুটে উঠলো। তাকে কাছে ডেকে বললো: 'চল্ বাহাদুর, তোর মায়ের শেষ-কাজের যোগাড় ক'রে আসি, চল্!'

আজ তার হঠাৎ মনে হলো, বুদ্ধু যদি ছোট ছেলেটি না হয়ে আজ প্রাপ্তবয়স্ক হতো, তা হলে আজ সে তার সত্যিকারের বন্ধু হতে পারতো, তার বলিষ্ঠ দক্ষিণ-বাহু দিয়ে সে হয়ত বৃদ্ধ ক্লান্ত পিতার স্কন্ধ থেকে জীবনের এই অসহ্য ভারের খানিকটা অংশ অন্তত তুলে নিতে পারতো। বুদ্ধুকে ডেকে সে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে। বুদ্ধু নীরবে পিতাকে অনুসরণ ক'রে চলে।

তখন সূর্য উঠে গিয়েছে; চা-বাগানের কুলিরা সবাই পাতা তুলতে ব্যস্ত; তাদের ঘর্মাক্ত তামাটে মুখের ওপর রোদ যেন পিছলে পড়ছে। আজ আর সে তাদের সঙ্গে কাজ করতে যেতে পারলো না, ভগবান আজকে শুধু তাকেই আলাদা ক'রে রেখে দিলেন, পৃথিবীর যত কিছু দুঃখ আছে তা একা ভোগ করবার জন্যে।

কানে আসে কুলি-কামিন্‌দের পাতা-ছেঁড়ার গান:

'দুটো পাতা একটা কুঁড়ি,
ভরে তুলবো পিঠের ঝুড়ি,
দুটো পাতা একটা কুঁড়ি...'

এক এক দলে আট থেকে বারো জন ক'রে, দল বেঁধে তারা কাজ করে আর গান গায় একই সুরে, একই ভাষায়, দুটো পাতা একটা কুঁড়ি···

সেই গানের সুরে সহসা তার অন্তরের বেদনা যেন উথলে ওঠে। সুরের মধ্যে একটা দোলা আছে, সেই দোলার ছন্দ তাদের কাজে অনুপ্রেরণা যোগায়। সজনী বহু চেষ্টা ক'রে সেই সুর আয়ত্ত ক'রে নিয়েছিল। এই যে সুর তার কানে এসে বাজছে, দু'দিন আগেও তার মধ্যে সজনীর কণ্ঠস্বর ছিল। আজ আর তার চিহ্ন কোথাও নেই। কিন্তু পৃথিবী ঠিক তেমনি আছে, ঠিক তেমনই চলেছে।

চলতে চলতে তার পায়ে পা জড়িয়ে যায়, হোঁচট খেতে খেতে আবার উঠে চলে। পেছনে ফিরে দেখে, বুদ্ধু তখন নর্দমার ধারে একটা ব্যাঙকে তাড়া করছে।

গন্তু ডাকে : 'ছি ছি, ব্যাঙ ধরতে নেই···ব্যাঙের পেচ্ছাপে গায়ে ঘা হয়···এগিয়ে আয় বাবা, আয়···'

আজ আর বুদ্ধু বাপের অবাধ্য হয় না। ব্যাঙের পশ্চাৎ অনুসরণ ছেড়ে ছুটে বাপের কাছে এগিয়ে আসে। গন্তুর মুখ-চোখের সেই থমথমে ভাব, তার মায়ের সেই নিশ্চল শায়িত মূর্তি, তার মনে আপনা থেকেই তার প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাদের জীবনে যে একটা মহা বিপদ দেখা দিয়েছে, তা সে বুঝতে পেরেছে।

বাংলোর কাছাকাছি এসে দেখে, সেই মুহূর্তে কাঠের সাঁকোর ওপর দিয়ে বড় সাহেবের মটরগাড়ী একরাশ ধুলো উড়িয়ে বাংলো থেকে অফিসের কম্পাউণ্ডে ঢুকছে। সমস্ত বাতাস লাল ধুলোয় ভরে উঠেছে। তাড়াতাড়ি কাপড়ের খুঁট দিয়ে নাক বুজিয়ে কিছুক্ষণ সেইখানেই দাঁড়িয়ে থাকে, ধুলোটা একটু নামুক।

প্রবেশ-দ্বারের কাছে এসে বুদ্ধুকে বলে : 'তুই এখানে একটু খেলা কর··· আমি এক্ষুনি আসছি।'

বারাণ্ডায় সিঁড়ি দিয়ে উঠতেই তার দম যেন ফুরিয়ে আসে। বারাণ্ডার পাখা-কুলির পাশেই লাল পোষাক-পরা শিখ চাপরাসী বসে আছে। গজুকে উঠে আসতে দেখে হেঁকে ওঠে: 'কি দরকার?'

সেই দীর্ঘ-শ্মশ্রু-লম্বিত রক্তাবরণভূষিত শিখ মূর্তিকে দেখে ভয়ে আপনা থেকে গজুর দুই হাত সংযুক্ত হয়ে যায়। বলে:

'সর্দারজী, একবার বড় সাহেবের সঙ্গে একটু দেখা করতে চাই!'

একটা বিরাট ঢেকুর তুলে, ডান হাতে দীর্ঘ দাড়িটাকে সস্নেহে আদর করতে করতে সর্দারজী জিজ্ঞেস করে: 'বলি, কি দরকার, তাই শুনি?'

'আমার স্ত্রী, সর্দারজী···' বলতে গিয়ে তার কথা যেন আটকে আসে। কোনরকমে নিজেকে সামলে নিয়ে আবার বলতে শুরু করে: 'আমার স্ত্রী মারা গিয়েছে সর্দারজী!'

অতর্কিতে তার দু'চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। হাত দিয়ে মুছে সে বলতে আরম্ভ করে:

'সেই জন্যে বড় সাহেবের কাছে কিছু ধার চাইবো বলে এসেছি।'

গজুর দিকে করতল প্রসারিত ক'রে সর্দারজী বলে ওঠে:

'কিন্তু আমার নজর কই?'

গজু জানতো, চাপরাসীদের হাতের মুঠোয় কিছু না দিলে তাদের পক্ষে বড় সাহেবের ঘরে প্রবেশ করা অসম্ভব ব্যাপার। তাই সে বলে:

'সর্দারজী, সেটা পরে আমি আপনাকে দেবো। এখন ধার রইলো।'

মৃদু হেসে হামির সিং বলে ওঠে: 'ও-কথা সবাই বলে। কাজ হয়ে গেলে তোরা দিব্যি ভুলে যাস্···আর আমারও ছাই সকলের নাম মনে থাকে না। কি ক'রে মনে রাখবো বল্? এক-আধ জন তো আর নয়! তা বড় সাহেবের কাছে যা পাবি তা থেকে নগদানগদি আমাকে দিয়ে যেতে হবে, কেমন?'

'আচ্ছা, তাই হবে হুজুর!' গজু জানায়।

সেই মুহূর্তে গন্নু যে কোনও শর্ত মেনে নিতে রাজী ছিল। সর্দারজীকে সন্তুষ্ট করবার জন্যে অবশ্য নয়, যে-কোন উপায়েই হোক্ সজনীর শ্মশান-ক্রিয়ার জন্যে তার টাকা চাই-ই।

সর্দারজী ভেতরে প্রবেশ করলো।

তার মিনিট কয়েক পরেই পাতলুনের পকেটে হাত রেখে বাবু শশীভূষণ ভট্টাচার্য অফিসের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো। সামনেই গন্নুকে দেখে বলে উঠলো: 'কি ব্যাপার, কি চাই?'

গন্নু করজোড়ে জানায়: 'বাবুজী বাড়ীর গিন্নী মারা গিয়েছে। দাহ করবার জন্যে বড় সাহেবের কাছে কিছু ধার চাইতে এসেছি।'

চশমার ভেতর থেকে চোখ বার ক'রে বাবুজী জিজ্ঞেস ক'রে ওঠে:

'তোকেই না এবার বুটা নিয়ে এসেছে?'

'জী, হুজুর!'

'হারামজাদা, এখন এসেছ হাত জোড় করতে! কই, যখন কাজ হলো, তখন তো আমাকে কিছু ঠেকাও নি বাছাধন। তুমিও না, আর সেই বেটা পাজী বুটাও না। এখন আমি কেন সাহেবের কাছে নিয়ে যাব শুনি?'

কাতর কণ্ঠে গন্নু জানায়: 'হুজুর, মাত্তর এই হপ্তার শেষের দিকে আমি মাইনে পেয়েছি···তার আগে আমার হাতে একটিও পয়সা ছিল না। তাই হুজুর, আপনাকে বকশিশ পাঠাতে পারি নি। তবে বিশ্বাস করুন, সামনে হোলির দিন নিশ্চয়ই আপনাকে মেঠাই খাওয়াবো···'

শশীভূষণ হুংকার দিয়ে ওঠে: 'তোর ঐ পোড়া মেঠাই খাবার জন্যে আমার তো আর ঘুম হচ্ছে না! তা ছাড়া তোর হাতে মেঠাই নেবো, জাত-বেজাত নেই? ও সব জানি না, আমার নগদ টাকা চাই, বুঝলি!'

গন্নু উত্তরে জানায়: 'বাবুজী, জাতের কথা তুলবেন না, আমি রাজপুত, আমার হাতের মেঠাই যে-কোন বড় জাত আদর ক'রে নেবে। তবে আপনি টাকা চাইছেন, টাকাই দেবো!'

পাত্লুনের ভেতর থেকে হাত বার ক'রে তার সামনে প্রসারিত ক'রে দিয়ে শশীভূষণ বলে : 'কই দেখি!'

গজু বলে : 'বাবুজী, আপনি যদি ইংরেজীতে সাহেবকে সব কথা বুঝিয়ে বলে আমাকে ধার পাইয়ে দিতে পারেন, তাহলে, আমি কথা দিচ্ছি, আমি যা পাবো, তা থেকে আপনাকে কিছু দেবোই! কাল রাতে আমার স্ত্রী মারা গিয়েছে—আমারও সর্বাঙ্গে জ্বর—দয়া করুন বাবুজী!'

ঘৃণায় এবং তাচ্ছিল্যে এক বিচিত্র শব্দ উচ্চারণ ক'রে শশীভূষণ তিরস্কার ক'রে ওঠে : 'যেমন নোংরা হয়ে থাকিস্ ব্যাটারা, তেমনি সাজা পাবি তো!'

বাবুজীর সেই ব্যঙ্গ উক্তিকেই গজু মনে করে, সহানুভূতি।

দুই হাত কপালে ঠেকিয়ে তাই বলে : 'বাবুজী, সব বরাত, বরাত!'

শশীভূষণ পর্দা সরিয়ে তার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যায়।

গজু উৎকণ্ঠিত ব্যাকুলতায় অপেক্ষা ক'রে থাকে। তার দু'টি চোখ সেই পর্দার সঙ্গে যেন বাঁধা পড়ে যায়।

বড় সাহেবের ঘর থেকে কিছুক্ষণ পরে শোনা গেল, শশীভূষণের কণ্ঠস্বর :

'হামির সিং!'

তাড়াতাড়ি টুল থেকে উঠে হামির সিং পর্দা সরিয়ে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে হাতে চুরুট, ক্রুক্‌টুবুক্ বেরিয়ে আসে···দামী চুরুটের সুগন্ধে সমস্ত বারাণ্ডা ভরে ওঠে। এক মুখ ধোঁয়া আলস্যভরে ত্যাগ করতে করতে ক্রুক্‌টুবুক্ ভ্রুভঙ্গী ক'রে সামনে চেয়ে দেখে।

গজু দু'হাত কপালে তুলে সেলাম জানায়।

কয়েক মুহূর্ত কোন সাড়া-শব্দ নেই, সব চুপচাপ্।

তার পর ক্রুক্‌টুবুক্ চুরুটের সঙ্গে চিবিয়ে চিবিয়ে ভাঙা হিন্দুস্থানীতে জিজ্ঞেস করে : 'রুপেয়া ম্যাংগতা?'

'জী হুজুর! হুজুর মাই-বাপ্!'

'কেত্‌না ম্যাংগতা?'

'হুজুর, বিশ্ রুপেয়া।'

সাহেব বলে ওঠে, আসল আর সুদের জন্তে কি বাঁধা রাখতে পারে সে। গয়না আছে?

কুণ্ঠিত হয়ে গজু জানায়: 'না হুজুর! গাঁ থেকে আসবার সময় একটাও গয়না আনতে পারি নি।'

সাহেব বিস্মিত হয়ে জানায়, তাহলে কিসের ভরসায় সে ধার দেবে? সে যে টাকা ফেরত পাবে, তারই বা কি গ্যারান্টি আছে?

অশ্রু-আর্দ্র কণ্ঠে গজু বলে: 'হুজুর, আমি এখানে আপনার চাকরি করি, আমি খেটে আপনার টাকা শোধ ক'রে দেবো। আর তা ছাড়া, বুটা আমাকে বলেছিল, আপনি আমাকে খানিকটা জমি নাকি দেবেন, সেই জমি পেলে আমি রাত-দিন খেটে ফসল তুলে আপনার টাকা শোধ ক'রে দেবো।'

সাহেব সন্দিগ্ধভাবে ঘাড় নেড়ে জানায়: 'সে-সব অনিশ্চিতের কথা। তা কিসের জন্তে তোর এত টাকার দরকার হলো?'

'হুজুর, কাল রাতে হঠাৎ জ্বরে আমার স্ত্রী মারা গিয়েছে!'

সঙ্গে সঙ্গে ক্রুফ্‌টুকুকের মুখের চেহারা বদলে গেল।

চীৎকার ক'রে ওঠে: 'ওহো—সেই ম্যালেরিয়া হয়েছিল যার···?'

সাহেব তার অসুখের খবর আগে থাকতেই রেখেছে দেখে গজু কিঞ্চিৎ আশান্বিত হয়েই জানায়: 'আজ্ঞে, হাঁ হুজুর! আগে আমার জ্বর হয়, তারপর আমার কাছ থেকে সে পায়, আমি বেঁচে রইলাম, সে গেল মরে।'

হঠাৎ ক্রুফ্‌টুকুক রাগে রক্তিম হয়ে গিয়ে, পদাঘাত ক'রে চীৎকার ক'রে ওঠে: 'বেরিয়ে যা, বেরিয়ে যা এখান থেকে শয়তান! ব্লাডি ফুল! এইরকম ক'রে সব জায়গায় অসুখ ছড়িয়ে বেড়াচ্ছিস্, আবার এখানে এসেছিস্ টাকা নিতে? তোকে না আলাদা ক'রে রাখা হয়েছিল? কার হুকুমে এখানে এসেছিস?'

হঠাৎ সেই ভাবের অভিব্যক্তিতে গহু ভয়ে একান্ত দীনভাবে দুই হাত যুক্ত ক'রে কয়েক পা পিছিয়ে আসে; কিন্তু পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে না। রুদ্ধ অপমানে বাক্যহীন ওষ্ঠদ্বয় মৃদু কাঁপতে থাকে। অস্ফুট কণ্ঠে ব'লে ওঠে:

'হুজুর, মাফ করুন, মাফ করুন হুজুর!'

ক্রফ্‌টকুক তেমনি উচ্চকণ্ঠে চীৎকার ক'রে ওঠে: 'বেরিয়ে যা, বেরিয়ে যা পাজী!'

বাবু শশীভূষণ এতক্ষণ পর্দার আড়ালে আত্মগোপন করেছিল। সাহেবের কথা শুনে তার বুঝতে এতটুকু দেরি হলো না যে, একজন মারাত্মক ব্যায়রামী লোকের সঙ্গে সাহেবের সাক্ষাৎকারের বন্দোবস্ত করার দরুন, তার ওপর এইবার বর্ষণ হবে। তাই সে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে রীতিমত আস্ফালন করতে শুরু ক'রে দেয়।

এতক্ষণ হামির সিং চুপ ক'রে ছিল। সে-ও বুঝতে পারে, তার কর্তব্য পালনের এই উপযুক্ত সময়। সামরিক কায়দায় পা ফেলে, দীর্ঘ দক্ষিণ হস্তটি প্রহারের জন্য উদ্যত ক'রে হেঁকে ওঠে: 'বেরিয়ে যা হারামজাদা!'

কথার সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় ধরে গহুকে বার ক'রে দেয়।

নীরবে গহু অফিসের প্রাঙ্গণ থেকে রাস্তায় এসে পড়ে। ক্ষোভে, অপমানে তার ভেতরটা তখন জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে। কিন্তু তবুও সে-মনে জাগে না কোন আক্রোশ, জাগে না কোন প্রতিহিংসা; অন্তর জুড়ে থাকে শুধু ভয়, ঈশ্বরের ভয় এবং তার পাশেই ক্রফ্‌টকুকের ভয়। চলতে চলতে দু' তিনবার আপনা থেকে মাথা তুলে ঊর্ধ্ব আকাশের দিকে চায়, যেন তাকে শাস্তি দেবার জন্যে সর্বশক্তিমান তিনিও বুঝি সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন। তারই মধ্যে চকিতে ঘাড় ফিরিয়ে এক-আধবার দেখে নেয়, চাবুক হস্তে ক্রফ্‌টকুক তার অপরাধের যোগ্য শাস্তি দেবার জন্যে তার পেছনে তাড়া ক'রে আসছে কিনা। সজনীর মৃত্যু এমন আকস্মিক তীব্রভাবে তার সমস্ত চেতনাকে মুহ্যমান ক'রে দিয়েছিল যে, সেখানে আর নতুন কোন বেদনার স্থান ছিল না। তার বিশ্বাস

এই সমস্ত নির্যাতন তার পূর্ব-জন্মের কৃত-পাপেরই ফল,—এ বিষয়ে তার কোন সন্দেহই ছিল না।

স্বয়ং ভগবান তার পাশ থেকে তার স্ত্রীকে সরিয়ে নিয়ে তাকে যে শাস্তি দিয়েছেন, তার কাছে সাহেবের হাতে এ লাঞ্ছনা আর কতটুকু।

তার মনে পড়ে হোসিয়ারপুরে তার এক প্রতিবেশীর সঙ্গে একবার ঝগড়া হয়। সেই সময় তার মনে প্রতিশোধ নেবার দুর্বার বাসনা জেগেছিল। কিন্তু আজ সাহেবের দুর্ব্যবহারের প্রতিশোধ নেবার সাহস তার নেই। রোগ ছড়াবার জন্যে সাহেব তাকে লাথি মেরেছে, হয়ত সাহেবদের বিধানে এটা সত্যিই গুরুতর অন্যায়; হয়ত বাড়ী থেকে বেরুনো নিষিদ্ধ না হলে, সাহেব তাকে টাকা দিয়ে সাহায্য করতো। কপাল থেকে ঘাম মুছে চারদিকে চেয়ে দেখে, বুদ্ধু কোথায় গেল। চোখের সামনে বাড়ন্ত রোদের ঝালর তখন ঝলমল করছে। দেখে, রাস্তার ওপার থেকে বুদ্ধু তার দিকে নাচতে নাচতে ছুটে আসছে।

পিতার কাছে এসে আনন্দে বালক বলে ওঠে:

'বাবা, দেখ, কি পেয়েছি! একটা পেরেক!'

আনন্দে হস্ত প্রসারিত ক'রে দেখায়, হাতের মধ্যে একটা পুরনো জং-ধরা পেরেক।

লখুর মনে পড়লো, সজনী বলতো, সোমবার বাইরে থেকে লোহা আনলে নিশ্চয়ই বিপদ-আপদ ঘটবে। মেয়েলী কুসংস্কার বলে তখন উড়িয়ে দিয়েছে কিন্তু আজ তা বিশ্বাস করতেই তার মন চাইলো। তাই বলে উঠলো:

'ফেলে দে, ফেলে দে শিগগির!'

এমন অমূল্য পদার্থটিকে পিতৃ-আদেশে ফেলে দিতে বুদ্ধুর মন চাইলো না। কেঁদে প্রতিবাদ ক'রে উঠলো।

হাত ধরে টেনে নিয়ে যেতে যেতে লখু তাকে বোঝায়: 'এরকম করতে নেই বাবা! বুঝতে পারছো না, আমাদের কি বিপদ! এখন তাড়াতাড়ি

বাড়ী গিয়ে তোমার মাকে শ্মশানে নিয়ে যেতে হবে।…তোর মা যে মারা গিয়েছে রে, তুই কি তা বুঝিস্ না?'

হঠাৎ বুদ্ধুর কান্না বন্ধ হয়ে যায়। নীরবে পিতার অনুসরণ ক'রে চলে।

কিছুদূর এসে গজু থমকে দাঁড়ায়। অতঃপর সে কি করবে? কোথায় যাবে?

এমন সময় তার অন্ধকার মস্তিষ্কে বুটার মূর্তি রাত্রির অন্ধকারে প্রেতচ্ছায়ার মত ফুটে ওঠে। সে স্থির করে, বুটার কাছেই যাবে, তার কাছেই খাবার চাইবে। তার জন্যেই তো আজ স্বজন-স্বদেশ থেকে দূরে এখানে আসতে বাধ্য হয়েছে…সেই তো তাকে প্রতারিত ক'রে এখানে নিয়ে এসেছে, তবে সে কেন তার এই বিপদে সাহায্য করবে না?…অবশ্য, আমাকে ঠকিয়েছে বলে, তার প্রতি সত্যিকারের কোন আক্রোশ আমার নেই; কিন্তু হাজার হোক্, পুরনো বন্ধুত্বের খাতিরে, এক গাঁয়ের লোক বলেও তো তার উচিত আমাকে সাহায্য করা?

পথের বাঁকে এসে বুদ্ধুকে বলে: 'তুই বাড়ী ফিরে যা, সীতাকে বলবি, আমি তোদের বুটা চাচার সঙ্গে দেখা ক'রে এক্ষুনি আসছি…'

'পেরেকটা নিয়ে যাবো?' পেরেকের কথা বুদ্ধু তখনও ভোলে নি।

অগত্যা গজুকে রাজী হতে হয়।

ফেলে-আসা পেরেকটি কুড়িয়ে নিয়ে বালক ছুটতে আরম্ভ করে।

ভারাক্রান্ত দেহকে কোনরকমে টেনে নিয়ে, গজু বুটার সঙ্গে দে[illegible] করবার জন্যে এগিয়ে চলে। সে জানতো সামনেই যেখানে জঙ্গল কেটে জমি বার করা হয়েছে, সেইখানে বুটা আছে, কুলিদের কাজ তদারক করছে।

বিশ গজটাক যেতে না যেতে হঠাৎ তার আবছা মনে হয়, তার পেছনে কে যেন আসছে, হয়ত সাহেব নিজে বা তার চাপরাসী। তার প্রাপ্য শাস্তির বাকী অংশটুকু পুরিয়ে দেবার জন্যে তারা হয়ত তাকে অনুসরণ ক'রে আসছে। সভয়ে ঘাড় ফিরিয়ে দেখে, কেউ নেই, তারই মনের ভয়।

জঙ্গলের কাছাকাছি আসতেই চোখে পড়ে, কুলিরা কাজ করছে।

সেখানে দাঁড়িয়ে সে চীৎকার ক'রে ডাকে : 'সর্দার বুটারাম!'

বুটা কাছেই একপাশে একটা লাঠির ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। গঙ্গুর গলার আওয়াজ থেকে তার বুঝতে বিলম্ব হলো না, কে ডাকছে, কিন্তু তবুও কোন সাড়া দেবার প্রয়োজন বোধ করলো না। সজনীর মৃত্যুর সংবাদ সে গতকালই শুনেছিল এবং গঙ্গুর এই আকস্মিক বিপদে সে নিজের মনে খানিকটা সঙ্কুচিত এবং বিব্রত হয়ে পড়েছিল, কারণ গঙ্গুর ঘর ছেড়ে এখানে আসার মূলে যে সে আছে, সে-বিষয়ে তার অন্তত কোন সন্দেহ ছিল না। তবে তার যদি কোন বিপদ হয় তার জন্যে বুটা দায়ী হবে কেন?

অধীরভাবে গঙ্গু এবার বিরক্ত হয়েই ডাকে : 'বলি শুনছো, ওহে বুটা!'

'কে, গঙ্গুরাম?' এবার আর সাড়া না দিয়ে পারে না। ভদ্রভাবে ডাকলে এরা সাড়া না দিতেও পারে কিন্তু দাঁত খিঁচিয়ে ডাকলে এরা সাড়া দেবেই। এমনি হয়ে গিয়েছে এদের অভ্যাস।

ধীরে ধীরে সে গঙ্গুর দিকে এগিয়ে আসে। মুখ ভার ক'রে যথাসম্ভব গলাকে ভিজিয়ে নিয়ে বলে :

'সত্যি, বহুর মার হঠাৎ মৃত্যু শুনে বড় দুঃখু হলো।

গঙ্গু সোজা বলে ফেলে :

'পোড়ানোর জন্যে কিছু টাকা তো দরকার, দিতে পার ভাই? আমার হাতে একটাও পয়সা নেই, ওধারে কাল থেকে লাশ বাসি হচ্ছে!'

বুটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে :

'কিন্তু কি বলবো ভাই, এখন তো আমারও হাতে কিছু নেই। যা কিছু সামান্য জমিয়েছি, তা সব ব্যাঙ্কে জমা আছে। সে তো এখন তোলা যাবে না, কেননা তুলতে গেলেই সাহেবের আবার সই চাই, কেরানীবাবুকেও আবার লেখালেখির জন্যে নগদ কিছু দিতে হবে, অনেক গণ্ডগোল।

তা তুমি এক কাজ কর না কেন? সজনীর গয়নাপত্র যা আছে, তা বাঁধা দিয়ে সাহেবের কাছ থেকেই ধার নাও না কেন?'

হতাশ হয়ে গজু বলে : 'সাহেব আমাকে ধার দেবে না···আমি তো সেখান থেকেই আসছি। তুমি তো জান, আমাদের আলাদা ক'রে দেওয়া হয়েছে···আমি ঘর থেকে বেরিয়েছি ব'লে সাহেব আমাকে মারলো। যদি আগে জানতাম, বন্ধু, এখানে এইরকম সব চাল-চলন, তাহলে মরে গেলেও আসতাম না।'

কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে তার দু'চোখ বেয়ে জল উপচে পড়ে।

'তাহলে বাজারে বেনের কাছে যাও!' বুটা সংক্ষেপে জানায়।

কথাটা একটু নেড়া বোধ হওয়াতে, সান্ত্বনা দেবার ছলে তার সঙ্গে যোগ ক'রে দেয় : 'তা কি করবে ভাই, সুদটা কিছু বেশী নেবে, এই যা!'

হাত দিয়ে চোখ মুছে গজু ব'লে ওঠে : 'একদিন শপথ করেছিলাম, আর মহাজনের কাছে ধার নেবো না। তা এখন দেখছি শপথ ভেঙে সেইখানেই হাত পাততে হবে!'

সে জানতো, তার জন্যে বুটার অন্তরে কোথাও এতটুকু সহানুভূতি নেই, থাকতে পারে না, তার সমস্তটাই হলো ছল···তবুও তার সেই ছদ্ম-শোককে সে সত্য বলে বাহ্যত স্বীকার ক'রে নেয় : 'আর কি করবো বল ভাই? বন্ধুর মার দেহ যে শেয়াল-কুকুরে খাবে, তাতো সহ্য করতে পারি না!'

আর বেশীক্ষণ তার সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক হবে না স্থির ক'রে বুটা তাড়াতাড়ি ফিরে দাঁড়ায়। যেতে যেতে বলে : 'আচ্ছা ভাই, কিছু মনে ক'রো না যেন···দেখি, লোকগুলো আবার কি করছে···'

শু লা হাজরের পড়বার ঘরে একটা আরাম-কেদারার ওপর আধ-এলিয়ে থেকে বৌম্বাবা আপনার মনে বলে ওঠে : 'হায়, এখান থেকে যদি আর চলে যেতে না হতো !'

ঘরের মধ্যে চারদিকে সে চেয়ে দেখে, কি আছে এই ঘরের মধ্যে যা তার মগ্ন চেতনাকে বারে বারে এমনি প্রলুব্ধ ক'রে আনে। তাদের নিজেদের অই বিরাট বাড়ী, তার বিচিত্র সব আসবাব-পত্র, তার মধ্যে সে যে প্রাণের স্পর্শ কোন দিন অনুভব করে নি, এই ছোট্ট ঘরটি যেন মনে হয় সেই অপূর্ব প্রাণ-চেতনায় ভরাট হয়ে আছে। বহুবার সে এই ঘরের প্রত্যেকটি জিনিস আলাদা আলাদা ক'রে দেখেছে...আজও আবার দেখতে আরম্ভ করে... কোথায় কার মধ্যে আছে এই বিচিত্র আকর্ষণ !

বই···বই···বই···যে দিকেই চায়, সেই দিকেই তার চোখে পড়ে বই··· শেল্ফের ওপর থাকের পর থাক বই, ঘরের কড়িকাঠে গিয়ে ঠেকেছে··· টেবিলের ওপর চার কোণে চার থাকে সাজানো···মাটিতে মেঝের ওপর স্তূপীকৃত···এখানে, ওখানে, সেখানে। শু লা হাজর বলে, এই হলো ছন্দহীন ছন্দ। দু'পাশে দুটো কাঠের মানুষের মূর্তি একটা ট্রে ধরে আছে, তার ওপর বই ; মুদিলিয়ানির আঁকা একটা রমণী-মুখের ছবি, ঘরের মধ্যে একমাত্র ছবি, তারও তলায় রাশীকৃত বই। তার মনে পড়ে, ঘরের মধ্যে সেই ছবিখানি যেদিন প্রথম তার দৃষ্টিতে পড়ে, তার মনে রীতিমত একটা ঈর্ষা জেগে উঠেছিল।

তন্ন তন্ন ক'রে সমস্ত ঘরটা সে দেখে। আজ অপরাহ্ণে তার মার সমস্ত নিষেধ উপেক্ষা ক'রে কিসের আকর্ষণে সে আবার এই ঘরে ছুটে এসেছে ?

তার সামনেই দেয়ালের গায়ে রাশীকৃত খাতা আর কাগজের ওপর আঁকা দ্বীপের পুতুল-নাচে-প্রচলিত একটা দৈত্যের বীভৎস মুখোশ, যেন তার দিকেই চেয়ে আছে। কি কুৎসিত ঘৃণা মাখানো ওর চাউনি !

মেঝের ওপর যে-সব বই রাশীকৃত পড়েছিল, চেয়ার থেকে উঠে ঝুঁকে গিয়ে হাত দিয়ে দেখে, ধুলো ঝাড়া হয়েছে কি না। কিছুদিন আগে এই ব্যাপার নিয়ে সে স্ত লা হাভয়ের সঙ্গে তুমুল ঝগড়া করেছিল। তার উত্তরে স্ত লা হাভর হেসে বলেছিল, মেয়েরা চায় প্রত্যেক ঘরটা যেন তাদের সাজ-ঘরের মতন হবে, পুরুষ চায় তার ঘর হবে যেন তার কারখানা। যখনই বাবুবারা তার সঙ্গে তর্ক করতে গিয়েছে, তখনই সে কায়দা ক'রে এড়িয়ে পালিয়ে গিয়েছে। আর তা ছাড়া, কি ক'রে কথা বলতে হয়, তা সে জানে! কথা বলতে বলতে তার চেহারা যেন বদলে যেতো···বাবুবারার মনে হতো, সে যেন রক্তমাংসের মানুষ নয়, একটা আধিভৌতিক সত্তা, যাকে ধরা-ছোঁয়া যায় না। তার ঔদ্ধত্য, তার বিদ্রূপ, জগতের সব কিছুর মধ্যে তার ক্ষমাহীন অন্তর্দৃষ্টি তাকে যেন তার কাছ থেকে বহুদূরে টেনে নিয়ে যেতো। তার মুখের মধ্যে সৌন্দর্যের বিশেষ কোন লক্ষণই ছিল না, এমন কি স্থির-চোখে দেখলে কুৎসিতই বলা চলে, কিন্তু যখন সে কথা বলতে আরম্ভ করতো, তখন হঠাৎ কোথা থেকে যেন একটা আলো এসে তাকে নিমেষে পরিবর্তিত ক'রে দিতো। চোখ দুটো থেকে যেন আলো ঠিকরে পড়তো, কপালের রেখাগুলো যেন কোথায় মিলিয়ে যেতো, আবেগের উত্তাপে দুই গণ্ড মৃদু মৃদু কেঁপে উঠতো, চোয়ালের চওড়া হাড়গুলো মনে হতো যেন অন্তরের বলিষ্ঠ প্রতিবাদেরই সাক্ষ্য স্বরূপ দাঁড়িয়ে আছে। তখন তার সমস্ত দেহ, মনে হতো যেন একটা জ্বলন্ত চেতনা···ভেতরের অনির্বাণ আগুনে নিজেকেই যেন নিজে ইন্ধন ক'রে চলেছে। সেই আগুনের পরশমণিই তার দেহ-মনকে নতুন রঙে রাঙিয়ে দিয়েছে। যদিও পুরুষ, তবুও তার অন্তরে ছিল স্নিগ্ধ এক নারীর অনুরাগ···তেমনি তীব্র, তেমনি কোমল। বাঘিনীর স্নেহ। হয়ত, তারই জন্যে তাকে বাবুবারা এতো ভালবাসে। সাধারণত পুরুষদের দীর্ঘায়তন বিপুল দেহ তার কাছে ভয়াবহ এবং কুৎসিত মনে হতো কিন্তু স্ত লা হাভরকে দেখে কোনদিন তার মন ভয়ে সঙ্কুচিত হতো না। যেদিন এই কথা সে স্ত লা হাভরকে জানায়, স্ত লা হাভর

বলেছিল, স্বভাবতই তার নাকি খানিকটা যৌন-ভীতি আছে। সে কথাটার মানে কি, তা আজও পর্যন্ত সে ঠিক ক'রে বুঝতে পারি নি।

কিন্তু সে যাই হোক্, এটা সে নিশ্চিতভাবে জানে, তার জন্যে স্ত লা হাভরের প্রতি তার ভালবাসা এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয় নি। অন্তত স্ত লা হাভর সম্পর্কে তার যে কোন যৌন-ভীতি ছিল না, সে-কথা স্ত লা হাভর অস্বীকার করতে পারতো না। আজও পর্যন্ত সে অনাঘ্রাতা পুষ্পের মত কুমারী অনাস্বাদিতা, ...অকুণ্ঠভাবেই সে তার সেই কুমারী দেহ-মন স্ত লা হাভরের কাছে সম্পূর্ণ নিবেদন ক'রে দিয়েছে। তার জন্যে তার মনে কোন অনুশোচনা ঘটবার কোন কারণও ঘটে নি। তাদের দু'জনের মধ্যে, সে জানতো, কোন দুর্ভাবনার অবকাশ নেই। সেই চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে, সে স্পষ্ট অনুভব করে, তার সারা অঙ্গ ব্যাপে যেন একটা উত্তাপ তরঙ্গ দেহের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে, নতুন রিকেট পোষাকের ছোঁয়া নরদেহে লাগলে যেমন একটা কোমল শিহরণ জাগে, তেমনিধারা এক স্নিগ্ধ শিহরণে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে দেহ।

তাদের দু'জনার এই সম্পর্ক, তার মধ্যে এতটুকু ফাঁক কোথাও ছিল না এবং বাইরের জগতের আর কেউ সে-সম্বন্ধে কিছুই জানতো না। তাই লোকেরা, বিশেষ ক'রে তার নিজের বাড়ীর লোকেরা যখন বলতো, স্ত লা হাভরের সঙ্গে মেলামেশা তার ছেড়ে দেওয়া উচিত, তারা তা বলতেই পারতো, কারণ এই সম্পর্কের গভীরতা সম্বন্ধে তাদের কোন ধারণাই ছিল না। কিন্তু সে তো জানে, সে কিছুতেই তা পারে না যতক্ষণ সে বাবুবারা, আর স্ত লা হাভর—স্ত লা হাভর, যতক্ষণ এই পৃথিবী তাদের দু'জনকে ধরে রাখবে, ততক্ষণ জগতে এমন কিছু নেই যা তাদের দু'জনকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে। কিন্তু সে কোথায়? এখন সে কোথায়? ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে তো শুধু অপেক্ষা ক'রেই আছে।

হঠাৎ কয়েক মুহূর্তের মত আত্ম-সচেতন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে লজ্জিত হয়ে পড়ে। কি এক অজানা আতঙ্ক যেন তাকে পেয়ে বসে। নিজেরই মনের

আগুনে যেন নিজে পুড়ে মরে। কোথায় সে যায় আজ স্পর্শ-কাতর তার অন্তর-বীণা নিঃশব্দে রয়েছে পড়ে? কে তার অতীতে অতীতে যুগ পুঞ্জীভূত মহা-সঙ্গীতকে স্পর্শে তুলবে জাগিয়ে, যে-সঙ্গীতের সুরে ঘুমিয়ে পড়বে—তার সব চেতনা? মহা-সুষুপ্তির আঁধার থেকে সে-বিপুল সঙ্গীত যেন উপচে উঠে তার দেহকে প্লাবিত ক'রে চলে যায়···কিন্তু চারদিকের সেই নীরবতা আর অপেক্ষায় আত্মগ্লানিতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে ওঠে মন। ক্রমশ সে হতাশ হয়ে পড়ে। এই পৃথিবীতে সব কিছুই হয়ত সীমাবদ্ধ, একথা স্বীকার ক'রে নেওয়াই ভাল। বেদনায় ম্লান হয়ে আসে মুখ, স্থির করে, একটা চিঠি লিখে চলে যাবে, আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা ক'রে থাকলে, তার মা নিশ্চয়ই উতলা হয়ে উঠবে।

আরাম-কেদারা থেকে উঠে টেবিলের কাছে এসে লেখবার জন্মে একটা কাগজ খোঁজে। একটা খাতার ওপরে দেখে, হিজিবিজি কি সব লেখা, তার পাঠোদ্ধার করা তার পক্ষে অসম্ভব। ম্লান বিদ্রূপের হাসি তার মুখে ফুটে ওঠে, যত সব অনাসৃষ্টি লেখা, শুনতে গেলে মাথা ধরে যায়। হয়ত যে বইটা সে লিখেছে, তাকে বলেছিল, তারই পাণ্ডুলিপি হবে। অনিচ্ছা সত্বেও সে তুলে নিয়ে পড়তে চেষ্টা করে :

"কেন ভারতবর্ষের এইসব অনশন-ক্লিষ্ট, ক্ষীণ, জীর্ণ, কীটদষ্ট কোটি কোটি প্রাণী এত বেদনা ভোগ করে? কে তার জন্মে দায়ী? এই সূর্য-দগ্ধ মহাদেশের অভ্যন্তরে যে সব অসংখ্য জলাভূমি দুর্ভাগ্যবশত কৃমি-কীটের জন্ম দিয়ে নির্বিবাদে বেড়ে চলেছে, তারাই কি দায়ী? প্রথম প্রথম নিঃসন্দেহাতীতভাবে আমার মনে হয়েছিল যে ভবিতব্যতা আর প্রকৃতি তাদের অসীম খামখেয়ালীতে এই হতভাগ্য লোকদের উচ্ছেদ করবার জন্মেই যেন ষড়যন্ত্র করেছে। মনে হয়েছিল, একটা অতি পুরাতন সভ্যতা আপনার বয়সের ভারে যেন আপনা থেকে শুকিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তার পরে ক্রমশ দেখলাম, একটা অতি কুৎসিত শিক্ষা-পদ্ধতির দরুন এখানকার বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টি পর্যন্ত একান্ত সঙ্কীর্ণ এবং

সীমাবদ্ধ হয়ে আছে এবং অধিকাংশ সরকারী লোকই কতকগুলো বাঁধা-বুলি আর অর্থহীন খোকখাকোর দ্বারা এমনভাবে পরিচালিত হয় যে বনামখ্যাত কর্নেল ব্লিমও তাদের কাছে লজ্জিত হয়ে যাবে। অধিকাংশ ডাক্তারই, দুঃখের বিষয় তাদের মধ্যে বাদ দেওয়া যায় এমন লোক নেই বললেই চলে, মনে হয় যেন একটা আলাদা জাতের লোক; আনন্দে মশগুল রীতিমত জীবন্ত এক শ্রেণীর জীব, সামাজিক, তৃষ্ণার সময় জলের চেয়ে বীয়ারই বেশী ভালবাসেন এবং কোনরকমে অপারেশানটা 'সুন্দর' হলেই খুশী। একটা সুসংবদ্ধ বিশ্ব-সমাজ সৃষ্টি করতে যে-কল্পনা, যে-মননশীলতা, যে-ধৈর্য এবং যে-অন্তর্দৃষ্টির প্রয়োজন, দুঃখের বিষয় তা তাদের মধ্যে নেই বললেই চলে। মানুষকে বাদ দিয়েই তারা ভাবতে শেখে।

"তাদের কাজটুকুর মধ্যে দিয়ে যেটুকু বাইরের জগতের সঙ্গে তাদের, সম্পর্ক, তার মধ্যে তাদের অধিকাংশ কাজ ব'সে বসেই নিষ্পন্ন হয়, তাছাড়া আশে-পাশের মানুষের সঙ্গে তাদের বিশেষ কোন যোগসূত্র থাকে না। তার ফলে মানুষের সঙ্গে ব্যবহারে তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হয়ে যায় উদাসীন আর নিস্পৃহ! হয়ত আমিও সেই অবস্থায় থেকে যেতাম, যদি না ভারতবর্ষে এসে স্বচক্ষে মানুষের এই ভয়াবহ অস্তিত্ব দেখতাম। একথা ভাবতে বিস্ময় লাগে যে, এই ভারতবর্ষ দিয়ে শতশত আই-এম্-এস্ ডাক্তার চলে গিয়েছে। অবশ্য রস্‌কে বাদ দিয়ে। এই সহজ সত্যটা কেন কারুর মনে জাগে না যে, এখানে মানুষের এই বৈষম্য সম্বন্ধে সজাগ হতে হলে কার্ল মার্কস্ পড়বার কোন দরকার করে না? কালো কুলির দল জঙ্গল কেটে পরিষ্কার করবে, তারাই মাটি চষে ফসল তৈরি করবে, তারাই রোদে-জলে পুড়ে ভিজে শস্য তুলবে আর অর্থ-পিশাচ ক্রীতদাস-চালক নিষ্প্রাণ ম্যানেজার আর ডিরেক্টরের দল মোটা মোটা মাইনে নেবে, যা কিছু আয় তাদের সিন্দুকে তুলবে, সমস্ত কেনা-বেচার ব্যবসা তাদেরই একচেটিয়া থাকবে। এজন্যই এদেশে বিপ্লবের প্রয়োজন। একদিকে অসংখ্য জনগণ, হাজার শৃঙ্খলে বাঁধা চিরবন্দীর দল, সব

অন্যে তার লেখা যুগ-যুগান্তের কাহিনী, নত-শির শতাব্দীর বোঝার ভারে, যেন মৃত্যু আর অনশনের জীবন্ত পাণ্ডুলিপি ; অপরদিকে উদ্ধত-শির ধনীর দল আত্ম-প্রসাদ আর কৃপানুগ্রহের উচ্চ-প্রাসাদ-চূড়ে দাঁড়িয়ে একবারও ভেবে দেখে না, তাদের ঐশ্বর্য, শক্তি আর খ্যাতির আদর্শের পেছনে রয়েছে কি হাহাকার···"

বারবারা মনে মনে ব'লে ওঠে, এই হলো ওর আসল চেহারা! সর্বদাই বড় বড় কথা···সেই এক উচ্ছ্বাস! লেখাটার পেছনে যে সুর ছিল, তাতে সে মনে মনে একটু বিরক্তই হয়ে উঠেছিল, তবে একবার যখন সে পড়তে আরম্ভ করেছে, যতটা পারে পড়ে দেখবে। তার কারণ, এটা তারই লেখা এবং তার চেয়েও বড় কথা হলো, এ থেকে বারবারা স্পষ্ট বুঝতে পারবে, তার মন সকলের অজ্ঞাতসারে নিভৃতে কি স্বপ্ন দেখে, কোন্ ছবি আঁকে।

একটার পর একটা কতকগুলো পাতা উল্টে যায়। কোন কোন পাতায় তাড়াতাড়ি ক'রে কি সব নোট লেখা।

"ভারতবর্ষের শ্রমিক সমস্যা সম্পর্কে রিপোর্ট—" এ. এ. পুরসেল্ এবং—দ্বিতীয় নামটির আর পাঠোদ্ধার করতে পারে না।

টেবিলের ওপর যেখানে ছিল, সেইখানেই রেখে দেয়, তার পর কি মনে ক'রে আবার মনঃসংযোগ ক'রে পড়তে চেষ্টা করে। মনে হলো, অপরের লেখা থেকে কতকগুলো কোটেশন তুলেছে, তার মধ্যে মধ্যে নিজেরও মন্তব্য আছে।

আবার পড়তে আরম্ভ করে :

"আসামের চা-বাগানের কুলিদের অবস্থা অনেক দিক্ থেকে উত্তর আমেরিকার দক্ষিণী রাষ্ট্রে প্রচলিত ক্রীতদাসদের অবস্থার মতনই, যাদের কথা হ্যারিয়েট বীচার ষ্টো 'এ্যাংকল্ টমস্ কেবিন'—'টম্ কাকার কুটীর'—বইতে লিখে রেখে গিয়েছেন। যদি কোন পার্থক্য থাকে, আমার মনে হয়, অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে, আমেরিকার সেই নিগ্রো ক্রীতদাসদের চেয়ে এখানকার চা-বাগানের কুলিদের আর্থিক অবস্থা ঢের নিকৃষ্ট।"

বারবারায় মনে পড়ে, তার কাকীমার বান্ধবীদের সঙ্গে একবার ইংলণ্ডে সমুদ্রের ধারে এক শহরে বেড়াতে গিয়েছিল, সেখানে 'এ্যাংকল্ টমস্ কেবিন' পড়তে আরম্ভ করে। খুব ছোট ছোট টাইপে ছাপা বাদামী রঙের একখানি ছোট্ট বই। তার শোবার ঘরের দেয়ালের সঙ্গে লাগানো একটা বুক-কেসের মধ্যে বইখানা ছিল। ওপর থাকে খান ছয়েক বই, একখানা বাইবেল আর গির্জের উপাসনা-সঙ্গীতের একখানা বই ছিল। তাদের মধ্যে এই বইখানাই তার কাছে যা সামান্য আকর্ষীয় বোধ হয়েছিল।

আবার ড লা হাভরের লেখা পড়তে আরম্ভ করে, খুব ঘেঁষাঘেঁষি ক'রে লেখা, তাতে হঠাৎ উইলবার ফোর্সের নামটা চোখে পড়ে গেল। নামটা যেন পরিচিত মনে হলো।

ড লা হাভর লিখেছে :

"বর্তমান এই কুলি-প্রথা শুধু একটা অভিশাপ নয়, সামাজিক পাপ। মানবতার ক্ষেত্রে অতি ভয়াবহ অপরাধ। বহুযুগ আগে উইলবার ফোর্স, ক্যানিং, গ্যারিসন আর লিন্‌কলন ক্রীতদাস-প্রথার লজ্জাকর নির্মমতার বিরুদ্ধে যত কিছু অভিযোগ উত্থাপন করেছিলেন, আজ ভারতবর্ষের চা-বাগান, কফি, রবার ইত্যাদি ব্যবসায়ে কুলি-প্রথা সম্পর্কে তার সব কিছুই প্রয়োগ করা চলে, এমন কি তারও বেশী বহু নতুন অভিযোগ উত্থাপন করা যায়।

"আমাদের চা-বাগানে যত কুলি কাজ করে তার শতকরা পঁচাত্তর জনের চোখের অসুখ, তার কারণ, তাদের খাদ্যের মধ্যে স্নেহজাতীয় পদার্থের একান্ত অভাব।

"ভারতবর্ষের জনসংখ্যার শতকরা পঞ্চাশ জনের দাঁতের অসুখ, কারণ তাদের খাদ্যের মধ্যে দুগ্ধ-জাতীয় কোন জিনিসই থাকে না।

"সেক্ষেত্রে, ভারতবর্ষের এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান এবং উচ্চস্তরের সমাজের লোকদের মধ্যে শতকরা কুড়িজন অতিরিক্ত ভোজনের দরুন মারা যায়...তারা জানে না, এই অতিরিক্ত ভোজনও একটা ব্যাধি, খাদ্যের অপব্যবহার।"

বাবুবাবা পাতা উল্টে যায়। অপর একটা পাতার মার্জিনে কালিতে লেখা ছিল, "গত সত্তর বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষের এই কুলিদের পারিশ্রমিকের হার বদলায় নি। ১৮৭০ সালের একজন কুলির আয় ছিল মাসে পাঁচ টাকা। ১৯২২ সালে আসামের চা-বাগানের একজন কুলির সব চেয়ে বেশী আয় মাসে সাত টাকার বেশী হয় না। এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, অন্তর্বর্তী সময়ের মধ্যে কুলিদের একমাত্র যা খাদ্য, চাল, তার দাম দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছে। একজন কুলি যা রোজগার করে, তার সবটাই খরচ হয়ে যায় চাল কিনতে। তার খরচের হিসাবের মধ্যে কাপড়-চোপড়ের কোন বালাই বিশেষ থাকে না, কাপড় বলতে যা তারা পরে, তাকে ছেঁড়া ময়লা ন্যাকড়াও বলা চলতে পারে।"

সেই পাতার তলায় আর-একটা প্যারাগ্রাফ, বাবুবাবা দেখলো আগাগোড়া মোটা ক'রে কালি দিয়ে চিহ্নিত করে রাখা হয়েছে, "আসামের চা-বাগানে একজন পুরুষ-কুলি সারা দিনে আট ঘণ্টা খেটে আট পেন্স মাত্র পায়, একজন মেয়ে-কুলি পায় ৬ পেন্স, এবং একজন শিশু পায় ৩ পেন্স; চায়ের কারখানাতে যে কোন কুলি দিনে আট ঘণ্টা খেটে ৯ পেন্স পায়। একে তো এই কম মাইনে তার ওপর আছে তাদের ঋণের বোঝা। সাধারণত এই সমস্ত চা বাগানে কর্তৃপক্ষের লোকেরাই দোকান বসায়। সেই সব দোকান থেকেই কুলিরা তাদের দরকারের জিনিস-পত্র কিনতে বাধ্য হয়, কাছে-ভিতে আর কোন দোকানই থাকে না। তাই তারা যে দর চায়, সেই দর দিতেই কুলিরা বাধ্য হয় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে নগদ দামের বদলে তারা ধারেই জিনিস-পত্র নেয়। এবং তার জন্যে আলাদা ক'রে সুদ দিতে হয়। একদিকে এই ধারের বাঁধন, অন্যদিকে এমন জায়গায় এইসব চা-বাগান যে সেখান থেকে মানুষের বসতি বহু দূরে, সুতরাং তারা এক কাজ ছেড়ে যে অন্য কাজ নেবে, তারও কোন সুযোগ পায় না। তার ফলে তাদের সমগ্র জীবন এই নিদারুণ অর্থনৈতিক দাসত্বের শৃঙ্খলে চির-আবদ্ধ থাকে। তার ওপর তারা যে ব্যবহার পায়, তা

মানুষের বোধ্য নয়, সুবিচার বা সহানুভূতি তাদের জীবনে একটা অলীক স্বপ্ন-কথা"—ডাক্তার ডি. এইচ. রাদারফোর্ড।

আপনা থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস তার অন্তর আন্দোলিত ক'রে উঠে আসে—শরীরের ভেতর কেমন যেন একটা অস্বস্তি অনুভব করে। অধীরভাবে ঘাড় কুঁচকে বলে ওঠে : 'কিন্তু সব দিক্‌ থেকে বিচার ক'রে দেখলে—'

সে আর ভাবতে পারে না, অসম্পূর্ণ রয়ে যায় তার চিন্তা।

অধীর ঔৎসুক্যে খাতাটা নিয়ে আবার উল্টে-পাল্টে দেখে, একটা পাতায় হঠাৎ দেখে একটা কবিতা লেখা রয়েছে…কবিতাটির ওপরে আবার কয়েক ছত্র লেখা,

"কবিতা আসলে হলো, কবির মনের একটি মুহূর্তের স্বীকারোক্তি, মনের একটি মুহূর্ত। কেন কবিরা সেই একটি কথা প্রকাশ করতে এত অলংকার আর এত শব্দাড়ম্বর দিয়ে তাকে অকারণে দীর্ঘ আর রহস্যময় ক'রে তোলে? তাদের অন্তরে যে সত্য অনুভূতিটুকু জাগে, কেন তারা সেই অনুভূতির সীমা ছাড়িয়ে যায়? সেই সত্যটুকুর নিরঙ্কুশ, স্বচ্ছ প্রকাশ, সেই তো কবিতা। নইলে কবিতা তো শুধু মাতাল আর পাতাল-এ ছন্দ মেলানোর খেলা…আর না হয়, চালওয়ালা আর ডালওয়ালা আর যারা সাহিত্যিক বেশ্যাবৃত্তি করে তাদের মন-যোগানো ব্যাপার। নীচের কবিতাটা যে খুব একটা ভাল কবিতা তা নয়। তবে বারবারা সম্বন্ধে যখন আর কিছু ভেবে ঠিক করতে পারি নি, তখন এই ক'টা লাইন আপনা থেকেই মনে এসেছিল,

> ভালবাসা পারে না উড়তে,
> যতদূর উড়তে পারে মানুষের চিন্তা,
> মানুষের চিন্তা পারে না নামতে সেই অতলে
> যে অতল গভীরতায় থাকে ভালবাসা,—
> আমাদের ধর্মাধর্ম বুদ্ধির সব ছলনা…"

কবিতাটি অসম্পূর্ণ রয়ে গিয়েছে। পাশে স্ত লা হাডর নিজেই মন্তব্য প্রকাশ করেছে, কাঁচা হাতের লেখা। বাবুবারার যদিও সে শিক্ষা ছিল না, যা দিয়ে সে কবিতার ভাল-মন্দ বিচার করতে পারে, তবে পাশের মন্তব্যটি তার মনে হয় ঠিকই লেখা হয়েছে।

অপর পাতায় একটা কবিতার বিষয়ের নাম শুধু লেখা রয়েছে, কবিতাটি আর লেখা হয় নি,

"ম্যালেরিয়ায় এক কুলি রমণীর মৃত্যুতে"···

বাবুবারা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবে, সমস্ত মন ওর তিক্ত হয়ে উঠেছে। হায়, অপরের কথা না ভেবে, ও যদি নিজের সম্বন্ধে একটু ভাবতো! এইসব গুরু-গম্ভীর মারাত্মক বড় বড় কথা ওকে যেন পেয়ে বসেছে। সব সময়ই যেন একটা চড়া পর্দায় মনকে বেঁধে রেখেছে···সব সময়ই একটা আদর্শবাদিতা···

বাবুবারার কথা হলো, তার নিজের জীবন সে সুন্দর ক'রে ভোগ করতে চায়। এই ভয়াবহ কুৎসিত পৃথিবীকে ভেঙে-চুরে সংস্কার করবার তার কোন বাসনা নেই। কিন্তু, মনে পড়ে, যেদিন প্রথম স্ত লা হাডুরের সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল, সে নিজেই স্বার্থত্যাগের কথা তুলেছিল, বলেছিল, অপরের কল্যাণের জন্য মানুষ কত না ব্যতিব্যস্ত! স্ত লা হাডরই তাকে তীব্র প্রতিবাদ ক'রে বলেছিল, না, না, এ ভুল ধারণা তোমায় কোথা থেকে হলো? মানুষ একান্ত স্বার্থপর, একান্ত নিষ্ঠুর, নির্মম. এই পৃথিবীতে মানুষের উপর মানুষের অত্যাচারের চেয়ে ভয়ঙ্কর জিনিস আর কিছুই নেই।

সেদিন স্ত লা হাডরের মুখে সেই কথা শুনে সে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিল। হায়, তার ইচ্ছে করে, কিন্তু কি যে সে-ইচ্ছার প্রকৃত স্বরূপ তা সে খুঁজে পায় না। আপনার মনে একটা কাগজ টেনে নিয়ে সে লিখতে আরম্ভ করে। লিখতে গিয়ে হাত চলে না, থেমে যায়, খানিকটা লিখে কেটে দেয়, আবার লিখতে আরম্ভ করে, মনে হয় যেন বানান ভুল হয়ে যাচ্ছে···

'হ্যালো!'

হঠাৎ তার লেখার মাঝখানে বারান্দা থেকে ছ না হাভরের কণ্ঠস্বর ভেসে আসে। দেখে, অধীর বালকের মত সে ছুটে আসছে।

অন্য সময়ে হলে বাবুবারা দু'হাত তুলে ছুটতো, কিন্তু আজ সে নিজেকে সংযত ক'রে নিয়ে, ধীর পদক্ষেপে অভিনয়ের ভঙ্গীতে অগ্রসর হয়।

উত্তেজনার আবেগে কাঁপতে কাঁপতে ছ না হাভর তার কাছে এসে দাঁড়ায়: 'ডারলিং, আমার ডারলিং...'

দু'হাতে তাকে বুকে জড়িয়ে ধ'রে চুম্বনের জন্যে নত হতেই, বাবুবারা মুখ সরিয়ে নেয়। আবেগে চাপা-উত্তাপে তার সারা মুখ আরক্ত হয়ে ওঠে। দু'হাতে যেন তার বন্ধন থেকে প্রয়োজন হলে এখনি নিজেকে মুক্ত ক'রে নিতে পারে, এমনি ভঙ্গীতে ব'লে ওঠে:

'আগে বল, তোমার বিপ্লব আগে, না আমি আগে?'

সে-কথার কোন উত্তর না দিয়ে ছ না হাভর বলে ওঠে:

'আগে একটা চুমু দাও, তারপর...'

'না...আগে আমার কথার উত্তর দাও! আমি আগে, না তোমার বিপ্লব আগে...?'

হেসে ছ না হাভর উত্তর দেয়:

'একটাকে না হলে আর-একটা হবে না, এই হলো আমার উত্তর!'

কপট ক্রোধ আর ধ'রে রাখতে না পেরে বাবুবারা হেসে ওঠে।

ছ না হাভর উত্তপ্ত গণ্ডে চুম্বন এঁকে দেয়।

ক্ষুব্ধকণ্ঠে বাবুবারা জিজ্ঞেস করে:

'এতক্ষণ কোথায় ছিলে? কতক্ষণ ধ'রে যে অপেক্ষা ক'রে আছি... ভেবেছিলাম দু'লাইন লিখে ফিরে চলে যাবো...'

'কই, কি লিখছিলে দেখি?'

টেবিলের দিকে ছুটে গিয়ে বাবুবারা বলে ওঠে:

'না, না, দেখতে পাবে না, এখন কিছুতেই দেখতে পাবে না!'

কিন্তু তার আগেই টেবিলের কাছে ছুটে গিয়ে, তার হাত থেকে কাগজখানা টেনে নেয়। দু'হাত ধরে বিছানার ওপর তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কাগজখানা পকেটে পুরে ফেলে।

বাবুবারা ঠোঁট ফুলিয়ে প্রতিবাদ জানায়।

স্ত লা হাভর মৃদু ভর্ৎসনা ক'রে ওঠে: 'দুষ্টু মেয়ে!'

বিছানা থেকে উঠে বসবার চেষ্টা করতেই স্ত লা হাভর হাত দিয়ে ঠেলে দিয়ে তার পাশে ব'সে পড়ে। শায়িত তনু-দেহের ওপর ঝুঁকে প'ড়ে সেই লৌহ-ধূসর নীল নয়নের দিকে বদ্ধদৃষ্টিতে চেয়ে থাকে···আতপ্ত সূর্যকর তার সব-দেহ, তার শিরা-উপশিরায়, তার প্রতি রক্ত-কণিকায় আজ যে প্রাণবহ্নি জাগিয়ে তুলেছে, তার প্রতিবিম্ব যেন সেই দু'টি নয়ন থেকে সে আহরণ ক'রে নেবে।

বাবুবারা ওঠবার আর কোন চেষ্টা করে না, কোমল উপাধান দু'টির ওপর মাথাটা তুলে দিয়ে দেহ সম্পূর্ণ এলিয়ে দেয়···ঈষৎ-উন্মুক্ত বিম্বাধরে ম্লান ভীরু হাসি···রক্তগণ্ডের স্মিত-হাস্যের যেন সহোদরা···

স্ত লা হাভরের রক্তে নেশা ধ'রে যায়, বাবুবারার দেহের তপ্ত সুরভি তার সারা মুখ যেন আচ্ছন্ন ক'রে ফেলে। ভাল লাগে এইভাবে ধীরে ধীরে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে···মধুর বিস্মৃতি। দুই চোখ আপনা থেকে বুজে আসে। তন্দ্রাচ্ছন্ন কাম-দগ্ধ সর্ব-চেতনা যেন দেহ-দ্বারে এসে সংহত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। তার পর ধীরে কখন ক্ষণিকের জন্যে একবার চোখ খুলে চেয়ে দেখে, সামনেই লাজ-রক্ত আননের মধুর আমন্ত্রণ। অতি ধীরে সেদিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়; যেন বাবুবারার সেই অতি-ভীরু পলাতকা লাজ-সৌরভের মত, সে দৃষ্টি দিয়ে সঙ্কুচিত করতে চায় না। সে জানে, সেই তনু-দেহকে ঘিরে আছে স্বর্ণের সৌরভের মত, শীত-দিনের মধ্যে হঠাৎ-আসা যাই-যাই সূর্যকরের মত এমন এক ভীরু কোমলতা, যাকে ছুঁতে গেলে হারিয়ে যায়, ধরতে গেলে পালিয়ে যায়। দু'হাত দিয়ে তার মাথাটা

তুলে ধরে স্পষ্ট বুঝতে পারে সেই দিবালোকেই তার দেহের মধ্যে ঝাঁঝিয়ে উঠার মাদকতায় আচ্ছন্ন হয়ে আসছে তার চেতনা। নিবেদের মধ্যে অস্থি-মূলে জেগে ওঠে মহা-দুর্বলতা···

বলে : 'ডারলিং···কিছু মনে ক'রো না···যদি চুম্বনে-চুম্বনে আজ তোমাকে ডুবিয়ে দিই ?'

আনন্দ-গদ্‌গদ কণ্ঠে বাবুবারা বলে : 'ওগো, দাও, তুমি দেবে বলেই তো আমি এসেছি !'

তার দীর্ঘ ঋজু দেহ সম্পূর্ণভাবে বাবুবারার দেহের সঙ্গে মিলিয়ে দেয়··· অতি সন্তর্পণে চুম্বন করতে গিয়ে সহসা, দশন-পংক্তি মহাভোজের লোভে হিংস্র হয়ে ওঠে···রক্তে জেগে উঠেছে যে কামনার মহাসঙ্গীত, তার রুদ্ধ আবেগের যন্ত্রণায় দুলে ওঠে সারা দেহ। মনে হয়, চিরকাল এমনি থাকবে তার ধরণী, অক্ষত, অখণ্ড, সুন্দর ! এমনি সুখকরে মুক্তা-ফলের মত জ্বলবে সমুদ্র আর পৃথিবী, স্থান আর কাল···

মনের গহনে গভীর থেকে উথলে ওঠে কামনার উন্মাদ তরঙ্গ···চুম্বনে চুম্বনে ভরে দেয় তার কপাল, কপোল, আঁখি, কণ্ঠ, গ্রীবামূল···কামনার লবণাম্বুবেগে সিক্ত পরিপ্লুত হয়ে ওঠে বাবুবারার সারা মুখ। অসহ্য পুলকের উন্মত্ত শিহরণে উঠে দাঁড়ায়, আবার তৎক্ষণাৎ মুখে মুখ দিয়ে দেহের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে···বাহুতে বাহু জড়িয়ে, স্কন্ধে স্কন্ধ মিলিয়ে, মিলিত সমুদ্র-তরঙ্গের মত একই আকাঙ্ক্ষার স্পন্দনে দুলে ওঠে দু'জনার দেহ একই ছন্দে···

সহসা ক্ষণিকের জন্য উৎকণ্ঠ হয়ে ওঠে···বাইরে কাকরের পথে যেন কার পদধ্বনি শোনা গেল। হয়ত পদধ্বনি নয়···তারই আকুল চিত্তের আকাঙ্ক্ষা··· ক্ষণকালের জন্যে শিথিল হয়ে যায় বন্ধন।

স্পষ্ট শুনতে পায় বাবুবারার শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ···মুখ তুলে তার ধূসর-সবুজ নয়নে নয়ন মিলিয়ে চেয়ে থাকে। যেদিন প্রথম সেই নয়নের সঙ্গে তার নয়ন

সহসা মিলেছিল, সেদিনও ঠিক এমনি নীল আলো তাকে প্রলুব্ধ ক'রে তুলেছিল···যে মধুর প্রলোভনের শেষে, তাদের ধর্মে নাকি বলে, নিশ্চিত অপেক্ষায় আছে ভয়াবহ এক খৃষ্টান নরক।

কিন্তু বাইরে সেই পায়ের শব্দ এবার আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মনে হয় কে যেন বাইরে থেকে বারাণ্ডার দিকে এগিয়ে আসছে। বাহু-বন্ধন থেকে বাবুবারাকে মুক্তি দিয়ে সে উঠে দাঁড়ায়।

তখনও সর্ব-অঙ্গ ব্যাপে রয়েছে আলিঙ্গনের উত্তাপ। লজ্জা-কোমল দৃষ্টিতে বাবুবারার দিকে চেয়ে দেখে, দেখে অপূর্ব জীবনানুরাগে আরক্তিম সমগ্র আনন···যেন বতেচেলির আঁকা সুকেশী নন্দন-বালিকা···অনাঘ্রাতা···অপাপবিদ্ধ চিরকুমারী। কিন্তু চোখে তার এই পুরুষ-আক্রমণের প্রতিবাদ। আজকের এই সম্পূর্ণতার পরও, সে কিভাবে চিরকাল চিরকুমারীর মত দুর্লভ দুর্ভেদ্য থাকবে? তার হাত পা, চোখ, ঠোঁট, মাথা, তার দেহের প্রতি অঙ্গ, তার দেহের সঙ্গে এমন নিখুঁতভাবে সে মিলিয়ে মিশিয়ে দিয়েছে যে, সে সুনিশ্চিত জানে, পৃথিবীর সমস্ত শিশু যদি সাময়িক মোহ আর ভ্রান্তির সন্তান হয়, তথাপি তাদের দু'জনার সন্তান কখনই তা হবে না। তার সান্নিধ্য তাকে এমনভাবে উল্লসিত ক'রে তুলেছে অথচ তার চোখে কিসের এ প্রতিবাদ? তার সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, এমন কি ব্যর্থতা, সব একসঙ্গে তাকে কেন্দ্র ক'রে জড়িয়ে গিয়েছে। অর্থহারা কাকলীর মত হারিয়ে যায় তার সব বক্তব্য। সে যে তাকে একান্তভাবে চায়। শিশু যেমন ঠোঁট উলটিয়ে আবদার করে, তেমনিভাবে সহসা বাবুবারা আবার জিজ্ঞেস করে:

'বল, তোমার বিপ্লব আগে, না আমি আগে?'

জ না হাডয়ের ঠোঁটের কোণে মৃদু বিদ্রূপের হাসি ফুটে ওঠে। মাথা তুলে বারাণ্ডার দিকে উঠতে গিয়ে বলে: 'আগে···'

তার পর জানলার কাছে গিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে বলে ওঠে:

'গজু···যে কুলিটার বউ কাল মারা গিয়েছে···'

কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেখান থেকে সরে দরজার কাছে গিয়ে ডাকে: 'এসো গজু, ভেতরে এসো!'

বাইরে থেকেই গজু অভিবাদন জানায়: 'সেলাম হুজুর।' এবং বাইরে রাস্তার ওপরই বসে পড়ে।

'ভেতরে এসো, উঠে এসো···' স্ত লা হাভর ডাকে।

কি করবে সে ঠিক ক'রে উঠতে পারে না, মহাবিব্রত হয়ে পড়ে। আস্তে আস্তে কয়েক ধাপ উঠে এসে বারান্দার ওপরই আবার বসে পড়ে।

স্ত লা হাভর চেঁচিয়ে ওঠে: 'না, না, ওখানে নয়। ঘরে এসো, মিস সাহেবকে সেলাম জানাও···'

সেই অপ্রত্যাশিত ভদ্র-অভ্যর্থনায় সে যেন বিমূঢ় হয়ে যায়। ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। মনে পড়ে, এই সাহেবের সঙ্গে তার যে ক'দিনই দেখা হয়েছে সে অনুরূপ সদয় ব্যবহারই পেয়েছে তার কাছ থেকে। তাই সাহসে ভর করে সে উঠে দাঁড়ায়। কিন্তু চলতে গিয়ে তবুও তার দেহ কাঁপতে থাকে, যেন তার ভগ্ন দেহের পেছনে পড়ে থাকে তার পা, মাথাটা শুধু সামনের দিকে কৃতজ্ঞতায় নত হয়ে পড়ে।

বারবারার দিকে চোখ তুলে না চেয়েই সে বলে ওঠে: 'সেলাম মিস্ সাহেব!' বারবারা ততক্ষণ শয্যা থেকে উঠে তাড়াতাড়ি আয়নার কাছে বিস্রস্ত কেশগুচ্ছ ঠিক ক'রে নিয়ে প্রত্যভিবাদন জানায়: 'সেলাম!'

কষ্টোচ্চারিত হিন্দুস্থানীতে স্ত লা হাভর জিজ্ঞেস করে: 'এখন জ্বর কেমন?'

'ভগবানের দয়ায় একটু ভাল হুজুর!'

'ছেলেমেয়েরা তাদের মার জন্যে কাঁদছে, না?' স্ত লা হাভর জিজ্ঞেস করে।

'হুজুর, তা কাঁদবেই তো! তবে তাঁর যা ইচ্ছা, তা হবেই। আজ কাঁদছে, দু'দিন পরে আবার সব ঠিক হয়ে যাবে।'

স্ত লা হাভর যেন আপনার মনে বলে ওঠে: 'মৃত্যুও দরিদ্রের মুখ চায় না।'

গঞ্জু উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে : 'ঠিক বলেছেন হুজুর, বড় ঠিক কথা। গরীবদের মুখ কেউ চায় না। এখানে সবই হুজুর খোশামোদের ওপর চলে। সর্দারদের বলে মোটা হয়েই চলেছে আর আমরা কুলিরা শুকিয়ে মরছি, হুজুর!'

হঠাৎ গঞ্জু থেমে যায়। তাকে চুপ ক'রে বসে থাকতে দেখে ড লা হাভরের মনে হয়, যেন কি একটা কথা সে বলতে চাইছে, বলতে পারছে না।

তাই তাকে উৎসাহিত ক'রে তোলবার জন্যে সে নিজেই জিজ্ঞেস করে :

'কি ব্যাপার গঞ্জু? বল, তোমার কোন কাজে আসতে পারি কি?'

লজ্জায় মাটির দিকে মুখ নত ক'রে গঞ্জু বলে :

'হাঁ হুজুর, আপনার কাছে একটা আর্জি নিয়েই এসেছি।'

'ভয় কি, কি আর্জি বল?'

গঞ্জু বলতে শুরু করে : 'হুজুর, পাঞ্জাবে হোসিয়ারপুরে আমার বাড়ী। সেখান থেকে বুটা সর্দার আমাকে ভুলিয়ে নিয়ে আসে, বলে এখানে এলে চাষের জমি পাওয়া যাবে। এখানে এসে ম্যানেজার সাহেবের মুখ থেকেই শুনলাম যে, জমি এখন আর নেই। তার পর, আপনি জানেন, আমার স্ত্রী মারা গিয়েছে, তার শেষ কাজ করবার মতন পয়সা আমার ছিল না। তাই বেনিয়ার কাছ থেকে কুড়ি টাকা ধার করি। সুদে আসলে সেই টাকা আমাদের অল্প আয় থেকে শোধ দিতে পারবো ভরসা হয় না। তাই বলছিলাম কি হুজুর, যাতে একটু জমি পাই, তার জন্যে যদি বড় সাহেবের কাছে আমার হয়ে একটু বলে দেন!'

'বলবো, নিশ্চয়ই বলবো', ড লা হাভর জানায় : 'নিশ্চয়ই তোমাকে জমি দিতে এরা বাধ্য। প্রত্যেক কুলির কনট্রাক্টে তা লেখা থাকে। আমি দেখবো, যাতে কনট্রাক্ট মাফিক তোমার জমি তুমি পাও।'

কৃতজ্ঞতায় গঞ্জুর দু'চোখ জলে ভরে আসে। গদগদ কণ্ঠে বলে : 'সেলাম হুজুর, হাজার সেলাম... আপনার দয়া ভুলবো না হুজুর!'

আর বিলম্ব করে না। যাবার জন্যে উঠে দাঁড়ায়।

'দাঁড়াও!' ছ লা হাভর ডাকে। আমার বুক পকেটে টাকা-পয়সা যা ছিল, সব হাতের ওপর বার ক'রে গজুর দিকে অগ্রসর হয়।

'না হজুর, না…না…' গজু প্রতিবাদ ক'রে ওঠে।

ছ লা হাভর হুকুম করে: 'আমি বলছি নাও! ধর…পাঁচ…ছয়…দশ টাকা…আট আনা, ইস, তোমার বরাত দেখছি ভাল। এই থেকে বেনিয়ার ধারের খানিকটা অন্তত শোধ ক'রে দাও,…তার পর দেখছি, তোমার জমির কি করতে পারি…যাও, শরীরের দিকে নজর রেখো, সেলাম—'

কৃতজ্ঞতায় বেপথু দেহ, সেই হতভাগ্য কুলি বিস্ময়-বিমূঢ় কণ্ঠে বলে: 'সেলাম হজুর, সেলাম!'

পেছন না ফিরে, সম্মান দেখাবার জন্যে সামনে মুখ ক'রে পিছু হাটতে গিয়ে বারাণ্ডার একটা থামে ধাক্কা লেগে যায়। ছ লা হাভর চেঁচিয়ে ওঠে: 'সাবধান।'

'সেলাম!' গজু অদৃশ্য হয়ে যায়।

বারাণ্ডা থেকে ঘরের ভেতর এসে বাবুবারাকে বলে: 'এই এমনিধারা চলছে সারাক্ষণ। জান, তোমার বাবা লোকটাকে লাথি মারে?'

বাবুবারা বিশ্বাস করতে পারে না। বলে:

'মেরেছিলেন? না, না, কখ্খনোই নয়।'

ঘরের মধ্যে উত্তেজনায় পায়চারি করতে করতে ছ লা হাভর বলে:

'মেরেছিলেন, এইটেই নিষ্ঠুর সত্য।'

বাবুবারার মুখ থেকে বেরিয়ে পড়ে: 'কি জঘন্য! কি কুৎসিত!'

কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে তার মনে নিদারুণ অনুতাপ জাগে, ছ লা হাভর যে-ভাবে ঐ মানুষটির দুঃখ-বেদনা বোঝে, সে তো সে-রকমভাবে বুঝতে পারে না। যেন সে-বোধই তার নেই। সে পারে শুধু চিরাচরিত প্রথামত বড় জোর একটা সহানুভূতি-সূচক আক্ষেপ জানাতে।

জ লা হাভার বলে ওঠে : 'অথচ বলে কাউকে ঘৃণা করবার কিছু নেই। অথচ মানুষ নয়, অথচ হলো এই সামাজিক ব্যবস্থা। তুমি আর আমি আজ যা হয়েছি, তার মূলে আছে, এদেরই মত কুলির গায়ের ঘাম।'

বাবুয়ারার মনে হলো জ লা হাভারের কণ্ঠস্বরে যেন একটা স্পষ্ট ভর্ৎসনা রয়েছে···ভর্ৎসনাটা যেন তারই বিরুদ্ধে। এবং সেটা শুধু ভর্ৎসনা নয়, একটা প্রচ্ছন্ন অবজ্ঞা, যেন তার বাবার অপরাধের দরুন ঘৃণাটা তারই প্রাপ্য।···

এই চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে একটা লজ্জা, একটা আত্মগ্লানির শিহরণ তার সারা দেহের মধ্যে দিয়ে সে অনুভব করে। যে তাকে এমনি ঘৃণা করে, তার কাছেই এই কয়েক মুহূর্ত আগে, সে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছে, বিলিয়ে দিয়েছে তার দেহ, মন, সর্বস্ব···যে তাকে চায় না, তাকেই সে দিয়েছে তার সব, একি ভয়ঙ্কর ভবিতব্যতা!···

তাদের দু'জনের মধ্যে এক-একটা সময় আসে, যখন তারা পরস্পরের মধ্যে পরস্পরে সম্পূর্ণভাবে হারিয়ে যায়। তখন মনে হয়, তারা যেন নগ্ন-বাস আদিম মানবশিশুর মত, তাদের দু'জনের মধ্যে কোন আবরণ নেই···সহজ, স্বচ্ছ। তাদের দু'জনের বাইরে, তখন জগতে যেন আর কোন প্রাণী থাকে না, থাকে শুধু ঐ দূরের পাহাড়, পায়ের তলায় এই তৃণগুচ্ছ, আর থাকে শুধু তারা দু'জনে। কিন্তু তার মধ্যে কোথা থেকে আবার আসে এই ক্রুর সন্দেহ। দেহ-সান্নিধ্যের বাইরে তারা কেন বিচ্ছিন্ন? হয়ত এই নিয়ম। হয়ত একজন আর একজনকে প্রতিবাদ ক'রেই এগিয়ে চলে। হয়ত একজন শুধু দিয়েই যাবে, আর একজন প্রত্যাখ্যান করবে। হয়ত এই ভুল-বোঝাবুঝি, জীবনের এই ধারা। অথচ কয়েক মুহূর্ত আগেই···ঐ কুলিটা আসবার আগে পর্যন্ত তারা দু'জনে মিলে সম্পূর্ণ এক হয়ে ছিল···আর এখন মনে হচ্ছে, তার সামনে ঘোরাফেরা করা সত্ত্বেও জন্ যেন তার কাছ থেকে বহুদূরে চলে গিয়েছে···

বাবুয়ারা ক্ষুণ্ণ হয়েই জিজ্ঞেস করে: 'সামাজিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে কি বলছিলে?'

তার মনের ভেতর থেকে কে যেন বলছিল, দ্য লা হাভর এখন যা কিছু করছে, তা অভিনয়।

দ্য লা হাভর একটা অর্থহীন শব্দ ক'রে উঠে ঘাড়টা শক্ত ক'রে নেয়। তার পর তিক্তকণ্ঠে বলে ওঠে :

'সমাজ ব্যবস্থা ? বিষাক্ত ! ভ্রান্তি !'

বাবুবারা চীৎকার ক'রে ওঠে : 'জন্ !'

বাবুবারা নিজের কণ্ঠস্বরে নিজেই ভীত হয়ে ওঠে। তার মনে হয়, সেই চীৎকারে তাদের দু'জনকার মধ্যের দূরত্ব যেন সহসা আরও বেড়ে গেল। অতৃপ্ত কামনার আক্রোশে, দ্য লা হাভর সেই ক্রীতদাস-পরিচালক জ্যাক্ টিকুকের অপরাধের শাস্তি তার মেয়ের ওপর দিয়েই চালিয়ে দেবার জন্যে বলে ওঠে :

'একথা নিশ্চয়ই তুমি জান, তোমাদের সেই মহামহিমান্বিত চিরকুমারী ইংলণ্ডেশ্বরী, গুড্ কুইন বেস, চিরকুমারী রানী এলিজাবেথ, তিনি আর যাই হোন, অন্তত তিনি কুমারী মোটেই ছিলেন না। আমেরিকার প্রথম যুগের স্বর্ণলোভীদের যদি সার ক'রে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে সেই দীর্ঘ লাইনের প্রথমে কার থাকা উচিত, জান ? তোমাদের ঐ চিরকুমারী রানী বেসের ! তিনি শুনেছিলেন, হিন্দুস্থানের অতুলন ঐশ্বর্যের কথা…তার মণি-মাণিক্য, হীরা-মুক্তা, তার মসলিন, তার রেশমের কথা…এবং সুবিধা পেলে, যে কোনদিন তিনি তার জন্যে স্পেনের ফিলিপের সঙ্গে যেমন, তেমনি সে-সময়ের বৃদ্ধ মুঘল বাদশাহ্ আকবর বা তাঁর তরুণ ছেলে জেহাঙ্গীরের কাছে বারবনিতার মত আত্মসমর্পণ করতে হয়ত যেতেন…'

বাবুবারা চমকে ওঠে।

ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলে : 'কি হয়েছে, ডারলিং ? পাগল হয়ে গেলে নাকি ?'

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্যে তার সারা দেহ যেন ব্যথাতুর কামনায় ভেঙে পড়ে।

জন হাজার বলে : 'হাঁ, পাগলই হয়েছি। এই ভারতবর্ষের লোকগুলো সব যাচ্ছেতাই বোকা। তারা অতিথিকে দেবতা বলে সম্মান করে। তাই যে-কোন বাইরের লোক এসে তাদের সর্বস্ব লুট ক'রে নিয়ে চলে যায়। জেহাঙ্গীর মদ খেয়ে নেশায় বুঁদ হয়ে থাকে। একটা গানের জন্মে, এক পাত্র সুরার জন্যে, নুরমহলের একটুখানি ভালবাসার জন্যে সে বিকিয়ে দেয় সারা মুঘল সাম্রাজ্য। সাজাহানের মেয়ের অসুখ। একজন ইংরেজ ডাক্তার তাকে সারিয়ে তোলে। তার বদলে সাজাহান দামী দামী সব বচ্ছর বকশিশ দিয়ে দেয়। একজন ইংরেজ কবি বলেছিল, জগতে দুটো মাত্র দেশ আছে, একটা দেশ সোনাকে ধুলো বলে জানে, আর একটা দেশ সোনাকে জগতের সব চেয়ে বড় জিনিস মনে করে। একটা হলো ভারতবর্ষ, আর একটা হলো ইংলণ্ড। এবং জান, সেই কবি তার কারণ কি দেখিয়েছিল? তার মতে তার কারণ হলো, ভারতবাসীরা অসভ্য আর আমরা হলাম সভ্য। আমরা যে কতখানি সভ্য এবং আমাদের সভ্যতার যে কি চেহারা তা জগতের মানচিত্রে খুব বড় ক'রে লেখা আছে। বৃটনরা কোন দিন, কোন দিন কারুর দাস হবে না। কিন্তু তারা এশিয়ার কোটি কোটি মানুষকে ক্রীতদাস ক'রে রাখবে...'

বাবুবাবা বিস্ময়ে তার কথা শোনে। মনে হয় যেন কি একটা দৈত্য তাকে আজ পেয়ে বসেছে। তার সমস্ত কথার মধ্যে মনে হয় যেন একটা তীব্র জ্বালা রয়েছে। বলে : 'কিন্তু তুমিও তো তাদেরই একজন, জন্!'

বাবুবাবা জানতো, এক-একদিন তাকে এমনি উচ্ছ্বাসে পেয়ে বসে। তখ তার কাছ থেকে বাবুবাবা যেন দূরে, বহুদূরে সরে চলে যায়।

বাবুবাবার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কোন প্রয়োজনই সে বোধ করে ন আপনার মনে তার মনের জ্বালা সে উদ্গিরণ ক'রে চলে :

'প্রকাশ্য লুট, ঘুষ আর জুয়াচুরি···তার সঙ্গে কোম্পানীর শেয়ার বাবদ চ মুনাফা···এই দিয়ে তারা তাদের বিপুল ঐশ্বর্য গড়ে তোলে। এবং য

সাম্রাজ্যময় 'মেরী' ইংলণ্ডের ভাণ্ডারে এই লুণ্ঠন-ধন পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠে, তখন বৃটনরা, যারা 'নেভার, নেভার স্থাল্ বি স্লেভ্স্,' তারা পরমানন্দে এই ডাকাতি আর লুটের টাকা দিয়ে ব্রাডফোর্ড আর মাঞ্চেষ্টারের কারখানায় চাকা ঘুরিয়ে চলে। কারখানা চালাবার জন্তে প্রকৃতি অপর্যাপ্ত কয়লা আর লোহা হাতের কাছেই রেখে দিয়েছিল এবং শ্রমিক শ্রেণীর লোকেরও অভাব সেখানে ছিল না। ওয়াট বাষ্প-যন্ত্র আবিষ্কার ক'রে দিল। এবং পুরনো ইংলণ্ডের জলাভূমির নিষ্ফলা কুয়াশার সঙ্গে কারখানার চিমনির ধোঁয়া মিশে বর্তমান সভ্যতার রূপ ফুটিয়ে তুললো! লণ্ডনের 'ফগ্' কেটে গেল। একে উন্নতি বলতে হবে বই কি!'

বাবুরাম নিজের মনের দিকে চেয়ে দেখে, দেখে তার সেই তিক্ততার ভয়ঙ্কর মায়া-চক্রে কখন নিজের অজ্ঞাতসারে সে আবদ্ধ হয়ে গিয়েছে। তার সেই উদ্ধত একাকিত্বের দরুন তাকে ঘৃণা করতে যায়, অথচ তার সেই বলিষ্ঠ দেহায়তনের দিকে চেয়ে, মোহনীয় নারী-সুলভ কোমল কণ্ঠস্বর শুনে, তার সেই নাটকীয় ভঙ্গীর অপূর্বত্ব দেখে নিজের অজ্ঞাতসারেই মুগ্ধ হয়ে যায়।

স্ক লা হাওর বুঝতে পারে, শিকারকে সে জালে বদ্ধ করেছে, বাবুরামার সমস্ত মন তার দিকেই চেয়ে আছে, তাই বলতে আরম্ভ করে :

'ল্যাঙ্কাশায়ারে যখন প্রথম যন্ত্র-বাণিজ্যের শুরু হলো, তখন তার সেই প্রথম যুগের বিভীষিকার কোন তুলনাই থাকতো না, যদি আজকের বম্বে, ক্যালকাটা এবং মাদ্রাজের জন্ম না হতো। হপ্তায় পঁয়ষট্টি ঘণ্টা কাজের দরুন মাত্র একটি ক'রে শিলিং আর ন'বছরেরও কম শিশুরা দিনে দু' টাইম ক'রে কাজ করছে! শ্রমিকরা যখন উপোস দিতে বাধ্য হচ্ছে, তখন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভদ্রলোকেরা ইংলণ্ডের নগর উপকণ্ঠে আনন্দ-নীড় রচনা ক'রে চলেছে!...

'আর ধনপতি সওদাগরেরা, বড় সাহেবের দল, যেখানে গেলো কাঁচা মাল আর সস্তা মজুরীর সন্ধান, সেখানে সশরীরে গিয়ে হাজির হলো, হাজির হলো ভারতবর্ষে। ভারতবর্ষের তখন যে সব তাঁতি তাঁত বুনে দিন চালাতো,

বিলেতের গলা-কাটা প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে না পেরে ছেড়ে দিতে বাধ্য হলো তাদের জাত-ব্যবসা, হয়ে গেল বেকার। বেকার হয়ে নিরুপায়-ভাবে তারা ফিরে চললো আবার মাটির দিকে, লাঙল ধরতে···কিন্তু যারা লাঙল ধরে তখনও পর্যন্ত কোনরকমে বেঁচে ছিল, অতিরিক্ত খাজনা আর নানারকমের দুর্দশায় তারা তখন নিজেরাই নাজেহাল।····

'তাই, বৃটন বলে যারা গর্ব করে, যারা বলে 'বৃটন কখনো হবে না, হবে না কারুর দাস,' তারা দলে দলে এশিয়ায় এসে এশিয়ার সেই কোটি কোটি নিরন্ন লোকদের করলো ক্রীতদাস। নিজেদের জন্যে গড়ে তুললো মেঘচুম্বী গথিক-প্রাসাদ, আর হতভাগ্য তাদের, তাদের কাজ করবার জন্যে, তাদের বাস করবার জন্যে, কোনরকমে তৈরি ক'রে দিল আস্তাবল আর গোয়াল, বড় জোর দু' তিন-তলা টিনের শেড্। নিগারদের জন্যে তাই তারা মনে করলো যথেষ্ট, যথেষ্ট সুখের নিবাস, কারণ সেখানে তাদের পুরে দেখা গেল, তারা তো মরে গেল না। কিংবা তাদের দেখে তো মনে হলো না যে, আলো-বাতাস-নেবার জন্যে তাদের দরকার সাতশো কিউবিক্ ফিট, কিংবা সাধারণ ভদ্রমানুষের থাকবার জন্যে ছত্রিশ ফিট মেঝের তাদেরও আছে দরকার! সাচ্চা বৃটনের মত বুক ফুলিয়ে তারা শপথ ক'রে বলে, হায় ভগবান! বৃথাই এরা চেঁচাচ্ছে? পুঁথি-গতভাবে যতখানি জায়গা দরকার বলে এরা চেঁচায়, খাই 'হোমে' যারা কুলির কাজ করে তারাও তো তা পায় না? আর তা ছাড়া এইসব পুতুল-পুজোর দল, এরা হলো পৃথিবীর আবর্জনা, না মানে স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান, না জানে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা। বৃটিশরা তাদের দেশে যে আইন আর শৃঙ্খলা এনে দিয়েছে, তাতেই তাদের খুশী থাকা উচিত, তারা যা রোজগার করে, তাদের পক্ষে তা অতিরিক্ত, কারণ এক ফার্দিং খরচেই তারা দিন কাটিয়ে দিতে পারে। আরে শোন নি, সিপাহী বিদ্রোহের সময়, তারা নিজেরা কেন খেয়ে টমীদের নিজেদের ভাজের থালা তুলে দিয়েছিল? তার কারণ, কেন খেয়েই তাদের দিন সুখে চলে যায়। তবে, তাদের

এই পুতুল-পুজোর কুসংস্কার ঘুচিয়ে দিয়ে তাদেরও ক্রমশ সভ্য ক'রে নিতে হবে ; তাদেরও শেখাতে হবে যীশুখৃষ্টের বাণী। তাদের সেই সব বাজে দেবতাদের ফেলে দিয়ে, তারা যাতে ক্রমশই যীশুকেই ভজনা করে, তার ব্যবস্থা করতে হবে। অবশ্য পাদরীরা সেদিকে প্রাণপণ চেষ্টা করছে। হাঁ, সেই সঙ্গে, ধীরে ধীরে যথাকালে, তাদের বর্ণ-পরিচয়ও শেখাতে হবে। কিন্তু একটা কথা, বেশী লেখাপড়া শিখলে, মানুষ কিন্তু আবার বেশী চাইতে আরম্ভ করে। তাই তার চেয়ে, 'পুনাই ভাল, সেখানে আমার এই বাতের ব্যথাটা সারতে পারে' কিংবা, 'মেরী, সমুদ্রের দিকে মুখ ক'রে নারকেল গাছের ছায়ায় আমাদের একটা বাড়ী কিনলে ভাল হয় না?' কিংবা, 'এবার, গ্রীষ্মকালে, ডারলিং, আমরা হোমে যাব···সিজন'টা সেখানেই কাটিয়ে আসবো···কি মজা হবে, হার্ ম্যাজেস্টির জুবিলী সেই সময় পড়বে··· রিগেট্টার মেলায় আমরাও একটা পানসি নিয়ে বেড়াবো, কেমন?'

বারবারা তার দিকে অর্ধ-জিজ্ঞাসু নয়নে চেয়ে থাকে, যেন সে জানতে চেষ্টা করছে, ড দ্য হাভরের এই বক্তৃতার মধ্যে কতটা সত্যি আছে, যা সে গ্রহণ করতে পারে, কতটাই বা তার ক্রূর জিহ্বার অকারণ আস্ফালন। আসলে হয়ত ড দ্য হাভরে চেষ্টায় ছিল, তার আহত অন্তরের কাঁচা ক্ষত-স্থানটি বারবারার সামনে তুলে ধরতে। কমল-হাতের কোমল প্রলেপের লোভ। বারবারার অন্তরের অন্তস্থল থেকে কে যেন বলতে চায়, তাই যদি তুমি চাও, তবে কেন আমার এই বাহু-বন্ধনের মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দাও না? কেন তোমার ঐ হিম-একাকিত্ব ভুলে, তোমার ঐ নিষ্ঠুর নির্লিপ্ততা, তোমার ঐ ভয়ঙ্কর ভ্রূকুটি, তোমার ঐ বিশ্ববিহীন একাকিত্ব ত্যাগ ক'রে আমার একান্ত নিকটে এসে দাঁড়াও না? তাহলে তো তোমাকে বুঝতে আমার এতটুকু কষ্ট হয় না, এতটুকু কোথাও বাধে না! সে তার হার-মানা-হার তার গলায় পরিয়ে দিতে উদগ্রীব হ'য়ে ওঠে, এই কিছুক্ষণ আগে সামাজিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে সে যে প্রশ্ন করেছিল, তা প্রত্যাহার ক'রে

নিতে চায়, কিন্তু কথা বলতে গিয়ে, সে কথা আর সে বলতে পারে না। তার বদলে তার মুখ দিয়ে সম্পূর্ণ নিস্পৃহভাবে বেরিয়ে পড়ে : 'বল···থামলে কেন ?' গ্রোমোফোনে দম দেবার মত হাতের ভঙ্গী ক'রে মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

স্ব লা হাভর উত্তেজিত কণ্ঠকে সংযত ক'রে নিয়ে বলে : 'হাঁ···বলছি··· তার পর এলো এডওয়ার্ডের যুগ···সেই যুগের নায়কেরা তাদের পূর্ববর্তীদের কাছ থেকে উত্তরাধিকারস্বরূপ যা পেলো, তার আর উন্নতি করবার কোন চেষ্টা তারা করলো না···তাদের দুঃসাহসিক জন্মদাতারা যে নতুন দেশে নিজেদের নিয়ে গিয়েছিল, তারা আর সেখানে পদার্পণ করলো না। তার বদলে ইংলণ্ডে যখন আসতো বরফ-ঢাকা শীত, সেই শীতের হাত এড়াবার জন্যে তারা দেশের বাইরে রিভিয়েরাতে বেড়াতে যেতো, আবার বসন্ত এলে ফিরে আসতো দেশে। 'হায়! ইংলণ্ডে এখন এসেছে এপ্রিল···এমন এপ্রিলে যদি না রইলাম ইংলণ্ডে ?'—স্যার এ্যালফ্রেড বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কে লিখেছে এই গান ? টেনিসন, না দুরন্ত শেষ-শতকের অন্য কোন ভবঘুরে ? সেই হারামজাদা অস্কার ওয়াইলড্, না ?

বাবুবারা শিউরে ওঠে। স্ব লা হাভরের মুখ দিয়ে এ ধরনের কুৎসিত কথা সে এর আগে আর শোনে নি। মনে হয় যেন, এই মুহূর্তে তাদের দু'জনের মধ্যের ফাঁক সহসা আবার দুর্লঙ্ঘ্য হয়ে উঠলো।

স্ব লা হাভর তেমনি উত্তেজিত হয়ে বলে চলে : 'তার পর এলো জর্জিয়ান যুগ। এ যুগের যে-সব ইংরেজ ভারতীয়-ব্যবসায় টাকা খাটাতে লাগলো, তারা লণ্ডনের বাজারে আর স্টক-এক্সচেঞ্জে 'বুল্' আর 'বিয়ার' নিয়ে যখন ষাঁড়ের-লড়াইএ মেতে উঠতো, তখন তারা একবারও ভাবতো না, তাদের ব্যবসায় মোটা লভ্যাংশ যোগাতে কালো আর তামাটে আর হল্‌দে কুলির দল কি নির্যাতনই না সহ্য করছে!

'তার পর, যুগ-যুগ ধ'রে ভারতের বাজারে একচেটে ব্যবসায় সুখ ভোগ করার পর, বৃটেনের লোকেরা যারা 'হবে না, হবে না কখনো ক্রীতদাস,' সহসা

একদিন বুঝতে পারলো যে ভারতবর্ষে রেল-গাড়ী আর বাষ্প-যন্ত্র নিয়ে গিয়ে তারা নিজেদের পায়ে নিজেরাই কুড়ুল মেরেছে···তাদের দেশের কারখানার সঙ্গে তাদের উপনিবেশের কারখানার শুরু হয়ে গিয়েছে প্রতিদ্বন্দ্বিতা···এবং তার চেয়েও বিপদের কথা, সেই উপনিবেশের টাকাওয়ালা লোকগুলো তাদের নিজের ব্যবসায় তাঁদের অংশ বুঝে নিতে আরম্ভ করেছে···অতএব, জোরসে চালাও ঘানি···সেই হতভাগ্য কুলিদের আরও জোরে জাঁতাকলে পিষে তাদের শেষ রক্ত বিন্দুটি পর্যন্ত চুষে বার ক'রে নেবার প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল···

'এত ক'রেও বড় সাহেবদের মনের তৃপ্তি ঘটলো না। তাঁরা আজ মনে করছেন, এই সাবালক ভারতবর্ষের যে অছিগিরি নিয়েছিল ইংলণ্ড, তার দায়িত্ব আর তেমনভাবে সে পালন করছে না। তার কর্তৃত্বে আঘাত লাগছে। তার জন্যে এদেশের শিক্ষা যেমন দায়ী, বিলেতের লোকগুলোও তেমনি দায়ী, কারণ তারা আজকাল 'সেন্‌টিমেন্‌টাল' হয়ে উঠেছে। এই দেশ থেকেই সে, তার ঐশ্বর্য আহরণ করছে অথচ এদেশের প্রতি একটুকু কৃতজ্ঞতা তার নেই।···তোমার যার কথাই ধর, তাঁর মনে সর্বদাই একটা আতঙ্ক, দেশী লোকগুলো তলোয়ার নিয়ে যেন তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে আছে। এই বুড়ো বয়সে এখনো চুলে কলপ দিয়ে, নাচের আড্ডায় চারদিকে কোমর বেঁকিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন আর বাড়ীতে চাকর-বাকরদের জীবন অতিষ্ঠ ক'রে তুলছেন। দেশী লোকদের মধ্যে যাদের টাকা আছে, তারাও ব্যবসায়ে নিজেদের অংশ বুঝে নিচ্ছে। বাইরে সময়-অসময়ে টপ-হ্যাট প'রে ঘুরে বেড়ায় আর বাড়ীর ভেতর পর্দার আড়ালে অর্ধাঙ্গিনীদের বন্দিনী ক'রে রাখে ···মাঝখান থেকে শুধু হতভাগ্য 'ব্লাডি' কুলির দল, রেপী হার্টের চাবুকের তাড়নায় দিনে চার কাদিং রোজগার করতে ভেতরের রক্ত জল ক'রে ফেলে দিচ্ছে। জয় হোক বৃটেনের লোকদের, বৃটন যাদের নাম, যারা 'হবে না, হবে না ক্রীতদাস,' জয় হোক তাদের! জয় হোক তার, যে গন্ডূর মত বুড়ো

লোককে মিথ্যে অছিলায় আটকে রাখে, কড়া পাহারা বসায় যাতে পালিয়ে না যায়, চুক্তি ক'রেও যে চুক্তিমত একফালি জমি দেয় না। বলবে তো, ক্রীতদাসের সঙ্গে আবার চুক্তি কিসের? একটুকরো কাগজ···তাও নয়! এই হলো তোমাদের সামাজিক-ব্যবস্থা!'

স্থ লা হাতর বক্তৃতা শেষ করবার সঙ্গে সঙ্গে দু'জনেই কিছুক্ষণের মত সহসা নীরব হয়ে যায়···কারুর মুখে আর কোন কথা নেই!

বার্‌বারার মনে হলো, স্থ লা হাতর তার কাছে যেন সম্পূর্ণ অপরিচিত কোন নতুন লোক···যে তাকে ঘষে মুছে ফেলে দিয়েছে, তাকে ভেঙে গুঁড়িয়ে চুরমার ক'রে, তার অস্তিত্বকে তার কাছেই নিরর্থক শূন্য ক'রে দিয়েছে। তার এই উদ্ধত নৈতিকতা বার্‌বারার অসহ্য বোধ হয়। তার মা-বাবা সম্বন্ধে কটু-উক্তি কাঁটার মত বুকে বিঁধতে থাকে। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হয়, তাকেই তো সে জীবনের প্রিয়তম বলে গ্রহণ করেছে, গোপন অন্তরে তাকেই তো নিশিদিন সে অর্ঘ্য দিয়েছে, তাকেই তো অন্তরে অন্তরতম স্থল থেকে কামনা করেছে, এই কিছুক্ষণ আগেও যার দেহের সঙ্গে তার দেহ এক হয়ে মিশে গিয়েছিল। মনে মনে চেষ্টা করে ক্ষমা করতে তার এই ক্রুদ্ধ নৈতিক আস্ফালন, তার এই উন্মাদ আবেগ। হয়ত এখুনি সে তার কাছে এসে তার কোলে ক্লান্ত মাথা রেখে শুয়ে পড়বে। কিন্তু কেন সে দেরি করছে?

উত্তরের উন্মুক্ত আকাশ থেকে বিলম্ব-সূর্যের সুদীর্ঘ রশ্মি-ফলক ঘরের মধ্যে এসে পড়েছে। বাতাসে আসন্ন গোধূলির প্রেত-স্তব্ধতা। জানলার বাইরে একটা গাছের ডাল নত হয়ে এসে পড়েছে। অস্ত-সূর্যের আলোর সামনে তার পাতাগুলো রঙ হারিয়ে ঘন কালো দেখাচ্ছে যেন চীনা-চিত্রকরের আঁকা কোন ছবি।

তখনও ভেতরের উত্তেজনায় চঞ্চল হয়ে স্থ লা হাতর ঘরের মধ্যে পায়চারি ক'রে বেড়ায়। হঠাৎ জানলার কাছে এসে থমকে দাঁড়ায়। দিক্‌-রেখাশ্রিত পর্বতশ্রেণীর অনাহূত ভীম-মৌনতা যেন অন্তর দিয়ে নিরীক্ষণ করে। প্রাণপণ

চেষ্টা করে তার অন্তরের সেই স্বকীয় কোমলতাকে ফিরিয়ে আনতে… বাবুবাযার বুকে ফিরে যেতে। বাবুবাযা কি অমনি একা দাঁড়িয়ে থাকবে? পরাজয় দিয়েই কি ওর সান্নিধ্যকে বরণ করতে হবে? সে তো জানে, তাকে ভালবাসে বলেই, তার অন্তরের সব দ্বার তার কাছে সে খুলে দিয়েছে। কিন্তু ধীরে তার চেতনায় জাগ্রত হয়, হয়ত সহজ হতে গিয়ে সে রূঢ় হয়ে গিয়েছে…

ধীরে সঙ্কুচিত পদক্ষেপে তার দিকে এগিয়ে যায়…প্রস্তর-স্থির আননে সস্নেহে কর-লেপন করে…তার পর সহসা চুম্বনে ভরিয়ে দেয় সারা মুখ…

হঠাৎ বাইরের দরজায় কে কড়া নাড়া দেয়। দু'জনা হাতজ সজাগ হয়ে ওঠে।

রুক্‌ টুকুকের খানসামা ইলাহি বক্‌সের কণ্ঠস্বর…

'হুজুর…মিস্ সাহেবের জন্যে বড় সাহেব এ ডুলা পাঠিয়েছেন…'

॥ দশ ॥

একমাত্র কুড়ুল তাই দিয়েই গজু মাটি কুপিয়ে চলে…তার বলদও নেই, লাঙলও নেই। এখানে চলে আসবার সময়, তার ত্রিশ বছরের হাল বেচে দিতে বাধ্য হয়েছিল; তার নিজের এক-জোড়া বলদ ছিল, আদর ক'রে নাম রেখেছিল, দীনা আর গতি, হালই যখন রইলো না, তখন বলদে আর কি হবে? তাদেরও বেচে দেয়। দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবে, আজ যদি তার সেই হাল আর বলদ থাকতো! হয়ত, তার ঘরের বাইরে খিড়কী পুকুরের ধারে, লাঙলখানা তেমনি পড়ে আছে…সঙ্গে সঙ্গে মনে গেঁয়ো ভিটের সমগ্র ছবিটা একসঙ্গে ভেসে ওঠে। পুরনো দেয়াল এতদিনে হয়ত শ্যাওলায় ভরে গিয়েছে, তার তলায় সুবেদার লছমন সিং-এর মুর্গীর বাচ্চার দল হয়ত কচি কচি শাকের বন মই-মাড়ন ক'রে বেড়াচ্ছে, গাঁয়ের সেই খোকলা কুকুরটা…

তার গ্রাম সে আজও ভোলে নি—ভোলা···সে হয়ত এখন মাঠের মধ্যে দিয়ে বাবুই খরগোসের পেছনে তাড়া ক'রে ছুটছে,···গাঁয়ের গাবুক বউরা রোদে ধান ঝাড়ছে···নতুন ধানের মিষ্টি গন্ধ বাতাসে করছে ভুরভুর।

সেই সুবাস গ্রহণ করবার জন্যে তার নাসিকা আপনা থেকে স্ফীত হয়ে ওঠে, কিন্তু হায়, আসামের জংলী বাতাসে কোথায় সে গন্ধ! এর বাতাস আলাদা, আলাদা এর জলের স্বাদ। সেই বোধের সঙ্গে সঙ্গে দেহের মধ্যে কেমন যেন একটা সুতীক্ষ্ণ অস্বস্তি অনুভব করে, নিজের দুর্বলতায় নিজেরই প্রতি বিরূপ হয়ে ওঠে। আজ যে সে এতদূর অধঃপতনে নিজেকে নিয়ে এসেছে, তার আপন বলতে একটা বলদ বা লাঙল পর্যন্ত নেই, সে-কথা ভাবতে গেলে তার শিরায় মধ্যে রক্ত টগবগ ক'রে ওঠে। অবশ্য তার এই সমস্ত দুর্দশার কারণ হলো বুটা। আর একজন সর্দারের সঙ্গে ভাগে বুটার এক জোড়া বলদ আর লাঙল ঠিকই আছে। এক গাঁয়ের লোক বলে তাকে তো সে অন্তত ধার দিতে পারতো দু'দিনের জন্যে!

কিন্তু গজুর চাওয়া সত্ত্বেও সে তা দেয় নি। দেয় নি যে কেন তা বুঝতে আজ আর গজুর দেরি হয় নি। সে যে-টুকরো জমি এখন কোপাচ্ছে, বুটার অংশ থেকেই সেটুকু ফালি তাকে বার ক'রে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তার জন্যে গজুর মনে কোন ক্ষোভ বা অপরাধ-বোধ ছিল না। তারই প্রাপ্য জমি থেকে এইটুকু যে সে পেয়েছে, ন্যায়-ধর্মের দিক্ থেকে তাতেই সে সন্তুষ্ট. কারণ কন্‌ট্রাক্ট মাফিক তার যে তিন একর জমি পাওয়া উচিত, বুটা ঘুষের সাহায্যে সে-সবই নিজে দখল ক'রে নিয়েছিল।

কিন্তু সেই ধূর্ত শৃগাল এমনভাবে গজুর সঙ্গে কথাবার্তা বলতো যে শুনলে মনে হবে, তার দেশের লোকের জন্যে সে যতটা করবে ভেবেছিল তা ক'রে উঠতে পারে নি বলে, মনে মনে সে যেন একান্ত বেদনাই বোধ করে; তার বাবার বাৎসরিক কাজের দিন, তাই প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ ঠিক করেছে ব্রাহ্মণ-ভোজন করাবে। সজনীর অকাল মৃত্যুতে, হয়ত গজুর সমানই মানসিক কষ্ট

সে পেয়েছে। বলতে বলতে তার দু'চোখ জলে ভিজে আসতো, দু'এক ফোঁটা গড়িয়েও পড়তো। কিন্তু গন্থু জানতো, আজ এই যে একফালি জমি সে পেয়েছে, সে শুধু ডাক্তার সাহেবের কৃপায়।

যেদিন বুটা তাদের আনবার জন্যে গাঁয়ে যায়, সেই দিন থেকে শুরু ক'রে এখানে আসা পর্যন্ত—সারাক্ষণ, সারা পথ, বুটা যে-সব মিঠা মিথ্যা বলে তাকে প্রবঞ্চিত করেছে, তার জন্যে সে ঠিক করেছে, তার সঙ্গে আর কোন সম্পর্ক রাখবে না।

রাগে আপনার মনে গন্থু বলে ওঠে : 'মিথ্যাবাদী! ওর মিথ্যে দিয়েই তো আমার সজনীকে ও মেরে ফেলেছে। যে মুহূর্তে সে এখানকার মাটিতে পা দিয়েছে, তখন থেকেই তার মন ভেঙে গিয়েছে, শুধু আমি কষ্ট পাবো ব'লে কোনদিন তা মুখ ফুটে বলতো না। শেষকালে আমার ব্যাধি নিজে টেনে নিয়ে, বেচারী নিজেই মরলো!'

সজনীর কথা মনে পড়তেই তার গলা যেন ধরে ওঠে, চোখ জলে ভরে আসে। সমস্ত দেহ-মন আত্মগ্লানির নিঃশব্দ আক্রমণে ছেয়ে যায়। চোখের সামনে ফুটে ওঠে নিষ্ঠুর ভবিতব্যতা। সে-ভবিতব্যতার বাহন সে নয়, ঐ বুটা সর্দার।

যেদিন সাহেব ওর জমি থেকে এইটুকু ফালি আমাকে দেবার জন্যে হুকুম করলো, সমস্ত মুখ ওর কি রকম ভার হয়ে গেল! কতটুকুই বা জমি, এক একরের পাঁচ ভাগের দু'ভাগও হবে না…নইলে কি একটা বিকেলের মধ্যেই কুপিয়ে শেষ করতে পারতাম? আর এই কোদাল দিয়ে? যা দিয়ে একটা মেয়ের পিঠ চুলকিয়ে দেওয়া চলে? আর মাত্তর তিনটে আল বাকি আছে… যদি নেমকহারাম কুকুরটা তার লাঙলটা ধার দিতো, আধ ঘণ্টার মধ্যেই কাজ সারা হয়ে যেতো!

মাটি থেকে মাথা তুলে কুলি-ধাওড়ার দিকে চেয়ে দেখতে গিয়ে নজরে পড়ে, বুদ্ধু সমবয়সী পড়শী ছেলেদের সঙ্গে খেলা করছে।

'তুই ভাই ঘোড়া হ', আমি তোর পিঠে চড়ি!'

সে-দৃশ্য গঙ্গুর মনে খানিকটা শান্তি এনে দেয়। ভাবে, তবু ভাল, এইভাবে ও-র মার কথা ভুলে আছে!

গঙ্গু কোদাল তুলে নিয়ে আবার কাজ শুরু ক'রে দেয়···'হুঁম্ হুঁম্··· হো···হুঁম্···'

সেই ভাষাহীন সুরের মধ্যে সে যেন শুনতে পায়, তার নিজেরই বিস্মৃত কণ্ঠস্বর, যখন হোসিয়ারপুরে তার নিজের ক্ষেতে সে লাঙল চালাতে চালাতে গান গাইতো···

কিন্তু আজকের এই 'হুঁম্-হোর' সঙ্গে আপনা থেকে মিশে যায় সম্পূর্ণ বিপরীত আর-একটা সুর···উফ্-উঃ···ক্লান্তির সুর···প্রথম সুর জমে ওঠবার আগেই তাল কেটে যায়···একটা সকরুণ ক্লান্ত দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে, আহ্-উহ্ করতে করতে হঠাৎ থেমে যায়। পিঠটা টনটন ক'রে ওঠে। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম ক'রে নেয়। যদি লীলা এখন এসে, কল্কেটা সেকে দিতো!

কুলি-লাইনে তার ঘরের দিকে মুখ তুলে ভাবে, কে জানে মেয়েটা এখন কি করছে···মুখ ফুটে কোন কথাই তো সে বলে না। ঐ দূর পাহাড়ের চূড়ায় ভোরের প্রথম আলোর মত লাজুক মেয়েটা। বেচারা! তা ছাড়া মা মারা যাওয়ার পর থেকে সংসারের সব কাজই তো তাকে একা করতে হয়। ধোয়া-মোছা, রাঁধা-বাড়া জল-তোলা সব কাজই সে একা করে।

চেয়ে থাকতে থাকতে তার নজরে পড়ে সামনে থাকের পর থাক চায়-ক্ষেতের ওপারে, ঐ তো সে দাঁড়িয়ে। দৃষ্টি বিস্তার ক'রে সে নদীর দিকে চেয়ে দেখলো। দেখে, কোমরে কলসী নিয়ে লীলা চলেছে। যেমন কাজের মেয়ে তেমনি দেখতেও সুন্দর। কলসী নিয়ে ছুটে চলেছে। নদীর ধারে কলসীটা নামিয়ে রেখে স্নান করবার জন্যে জলে নামলো। জলের আওয়াজ থেকে মনে হয় আরও অনেক মেয়ে এখন সেখানে নাইতে নেমেছে। জলেতে তাদের মাতনের শব্দ আসে। গঙ্গু মনে মনে বলে, আহা, ঐ নাইবার

সময়টুকু নদীর জলে যা ওদের ছুটি! তাই পুরুষের চেয়ে নদী ওদের বেশী আপনার।

মনে পড়ে, বহুদিন হলো, নদীর জলে সে সাঁতার কাটে নি। স্নান করতে গিয়েছে বটে কিন্তু কোনরকমে একটা ডুব দিয়েই উঠে পড়েছে। মেয়েদের সঙ্গে, তার মনে হয়, জলের যেন একটা গভীর মিল আছে। সব সময়ই বয়ে চলেছে, এ-দিক না হয় ও-দিক, চির-চঞ্চল তরঙ্গের মত, কখনও বা স্থির গম্ভীর, কখনও বা ঝঞ্ঝা-তাড়িত স্রোতস্বিনীর মত ভয়ঙ্করা, আপনার খেয়ালেই আপনি উন্মত্ত, কখনও বা সূর্যকরোজ্জ্বল হাসিতে টলমল, বিগলিত-করুণা... কিন্তু সব সময়ই তরল...আধার সাপেক্ষ...সব সময়ই স্নিগ্ধ। আপনার মনে তার পিতৃ-হৃদয় মাতৃহীনা কন্যার কল্যাণে ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানায়, আমার ছোট্ট লীলা, তাকে বাঁচিয়ে রেখো ঠাকুর! সে আমার একমাত্র আনন্দ, সজনীর দান। আমাকে দেখবার জন্যে ওকেই তো রেখে গিয়েছে সজনী।

নদী-তীর থেকে দৃষ্টি তুলে নিয়ে সমস্ত উপত্যকা ভূমিকে সে পর্যবেক্ষণ করে দেখে...অদূরে উচ্চভূমির চূড়ায় সাহেবদের বাংলো, তার নীচে থাকের পর থাক সবুজ-আর-সোনালীতে মেশা চায়ের বাগান...তার ওপার কুলি-লাইনে কুলিদের ঘরের টিনের ছাদ...ধূসর ধান-ক্ষেত...নদীর দু'দিকে বুনো ফুলের মেলা আর বাঁশ-বনের ঝাড়...বিদায়-সূর্যের আলো প্রত্যেকের ওপর বুলিয়ে দিয়েছে তার গৈরিক তুলি...

দৃষ্টি-সীমাবদ্ধ এই পৃথিবী সম্বন্ধে সহসা আত্ম-সচেতন হয়ে ওঠে, তার এই ছোট্ট পৃথিবীর মধ্যে যা কিছু আছে, তার প্রত্যেকের জন্যে অশ্রুময় এক অপূর্ব প্রেম তার অন্তরে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। অকম্পিত বজ্র-মুষ্টিতে হাতের কোদাল তুলে ধরে, মহা-আশ্বাসে পায়ের তলায় মাটিতে আঘাত করে, সর্ব-চেতনা দিয়ে অনুভব করে ফলদায়িনী মৃত্তিকার সেই স্নিগ্ধ সজীবতা।

চিত্তের সেই শুভ্র শূন্যতার মধ্যে বিদ্যুতের মত ঝিলিক দিয়ে ওঠে বেঁচে থাকবার উদগ্র উন্মত্ত কামনা। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে মাথাটা জোর ক'রে

একবার নাড়া দেয়, যেন তার মস্তিষ্কের ভেতরে যে ঘন-কালো নিরাশার মেঘ জমে উঠেছিল তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে ফেলে। কালের কঠোর আঘাতে ভেতরে যে-সব পর্দা ছেড়ে হুমড়ে পড়েছিল, সেগুলোকে টেনে সোজা ক'রে নেয়, ব্যথিত সঙ্কুচিত অসহায়তার বোঝা কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেলে দিতে চায়।

কর্ম-অন্তে কোদালটা কাঁধে তুলে বাড়ী ফেরবার মুখে আপনা থেকেই একটা মৃদু উল্লাস অনুভব করে। বিদায়-সূর্যের রক্ত-আলোয় সুন্দরী ধরণীর অবারিত রূপ তার সব দীনতা যেন মুছে দিয়ে যায়, নিজের নম্র-নত দীনতায় যেন খুঁজে পায় অস্তিত্বের চরম সার্থকতা···শত শতাব্দীর নিরুদ্ধ কামনার বেগে ধরণী যেন আজ তার গোপন মৃত্তিকা-কক্ষ তার অনিশ্চিত দৃষ্টির সামনে উদ্‌ঘাটিত ক'রে তুলে ধরেছে···'

কিন্তু নদীর ধারে ছিপ হাতে তখন সাহেব মাছ ধরছিল। তার স্থির ছায়া, সে দেখে, তার মনের মধ্যে যেন এসে পড়েছে···শ্বেত-ভীতির অচল অটল ছায়া।

॥ এগারো ॥

'সাহেব আসছে, সাহেব আসছে!' চীৎকার ক'রে ওঠে বাবু শশীভূষণের বাচ্চা চাকর রামু। বাবুর ছেলেদের সঙ্গে সে রাস্তার ওপর গুলি খেলা করছিল, এমন সময় দেখলো সামনের পথ দিয়ে গু লা হাডর সেই দিকে এগিয়ে আসছে।

সেই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে বাবু শশীভূষণের দরজার চটের পর্দার আড়ালে সজীব চঞ্চলতার লক্ষণ পরিস্ফুট হয়ে উঠলো, পর্দার ছেঁড়া অংশের ফাঁক দিয়ে এক বৃদ্ধা রমণীর অবগুণ্ঠিত মুখের মধ্যে শুধু নাকটুকু দেখা গেল।

গু লা হাডর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে পর্দার আড়ালে সেই ন-রব শশ-ব্যস্ততা অনুমান করলো মাত্র। ছিন্ন পর্দার আড়ালে লজ্জা ঢাকবার সেই

প্রাণান্ত চেষ্টা দেখে তার মুখে আপনা থেকে ম্লান হাসির রেখা ফুটে ওঠে। পাছে খোলা দরজা বা জানলা দিয়ে সামনের সেই অবাধ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য চোখে পড়ে যায় সেই জন্যেই যেন গৃহস্বামী সযত্নে বাড়ীর চারদিকে উঁচু পাচিল তুলে দিয়েছে। যে কোন উপায়ে আবরু রক্ষা করা চাই-ই। এই ব্যাপার সে বহুবার দেখেছে এবং এখন তা সে স্বাভাবিক বলেই স্বীকার ক'রে নিয়েছে। সমতল অঞ্চলের উচ্চস্তরের ভারতীয় গৃহস্থরা পর্দা মেনে চলে, একথা তার অবিদিত ছিল না। এবং যেহেতু বাবু শশীভূষণ কেরানী হয়েও ইংরেজীতে কথা বলতে পারে, ধুতির বদলে পাতলুনও পরে, এবং কড়া ইস্ত্রী-করা শার্ট, কলার এবং নেকটাই দরকার হলে ব্যবহার করে এবং সাহেবদের কাছে তার খানিকটা খাতিরও আছে, সেই জন্যে কুলি আর ওয়ার্ডারদের চেয়ে সে যে উচ্চস্তরের জীব সে-কথা জাহির করতে সে ভোলে না। সে চায়, সাহেবরাও তাকে সেই উচ্চস্তরের প্রাপ্য মর্যাদা দিক। সেই জন্যে তাকে কড়াভাবে পর্দা মেনে চলতে হয়।

ড লা হাভর কোনদিন কোন উচ্চশ্রেণীর ভারতীয়ের বাড়ীর ভেতর দিয়ে সেখানকার প্রকৃত ব্যবস্থা স্বচক্ষে দেখে নি। আই. এম্. এস-এ যে এক বছর সে চাকরি করে, সে-সময় ঝিলাম অঞ্চলে তার আস্তানার গজখানেকের মধ্যেই সুবেদার মেজর খানবাহাদুর ইলমুদ্দীনের বাড়ী ছিল। কিন্তু তাঁর অন্তঃপুরে যাওয়ার সৌভাগ্য তার ঘটে নি। তবে ইলমুদ্দীন মুসলমান, উচ্চশ্রেণীর হোন বা না হোন তাঁকে পর্দা মানতেই হতো এবং তাঁদের পর্দার রহস্য ভেদ করা তার মত বিধর্মীর পক্ষে অসম্ভব ব্যাপারই।

বাবু শশীভূষণ বাঙালী হিন্দু, সুতরাং পর্দা সম্বন্ধে অতখানি কড়া নাও হতে পারে। সেইজন্যে উচ্চশ্রেণীর ভারতীয় লোকের অন্তঃপুর দর্শন করবার এই প্রথম সুযোগের সম্ভাবনায় ড লা হাভর রীতিমত একটা থ্রিল অনুভব করছিল। আজ পর্যন্ত সে শুধু সাহেবদের বাড়ী আর কুলিদের কুটি দেখে এসেছে, পৃথিবীর যেন এ-পিঠ আর ও-পিঠ। উচ্চশ্রেণীর ভারতীয় বলতে

সে শুধু জানে আর-একজনকে, তারই সহকারী ডাক্তার চুনীলাল। সে কিন্তু তারই মতন অবিবাহিত এবং ডিসপেনসারীতে একখানি ঘর নিয়ে বাস করে। সে-ঘর তার পড়বার ঘরেরই মতন, পার্থক্য বলতে শুধু চুনীলালের ঘরের দেয়ালে খানকতক বাঙালী চিত্রকরের আঁকা ছবি টাঙানো আছে, এই যা।

বাবু শশীভূষণের দরজার যে মোটা চটের পর্দাটা ঝোলানো ছিল, বৃষ্টির জলে ভিজে ভারী হতে হতে ক্রমশ তার বাঁধুনী আলগা হ'য়ে এসেছে। ডক্টর হাডর এগিয়ে যেতে, পর্দাটি কে যেন ভিতর থেকে ভাল ক'রে আর একটু টেনে দিল। বাইরে দাঁড়িয়ে সে স্পষ্ট শুনতে পায়, পর্দার আড়ালে চাপা গলায় ফিসফিস ক'রে বিচিত্র ধ্বনি উঠছে—কারা যেন আসছে-যাচ্ছে।

তার আগমন কিভাবে গৃহীত হচ্ছে, তা দেখবার আগ্রহে ডক্টর হাডর ত্বরিত পদে পর্দার কাছে এগিয়ে যায়। শশীভূষণের স্ত্রী গর্ভবতী, অসুস্থ হয়েছেন। তাঁকে দেখবার জন্যেই তাকে ডাকা হয়েছে। ডক্টর হাডরের আগ্রহের অন্ত নেই।

পর্দার একেবারে সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই, ফাঁকের ভেতর দিয়ে যে নাকটি দেখা যাচ্ছিল, হঠাৎ সেই নাকের মালিক, হায়, হায়, রব করতে করতে বাড়ীর ভিতরের দিকে ছুটে পালালো।

সাধারণত ডক্টর হাডর নিজেই পর্দা সরিয়ে নিজের আগমন ঘোষণা করতো কিন্তু পর্দার আড়ালে সেই সব অদৃশ্য গতায়াতের দরুনই সে তা থেকে এতক্ষণ বিরত ছিল।

হঠাৎ সেই চীৎকার-ধ্বনিতে প্রতিহত হয়ে ডক্টর হাডর বিপন্ন হ'য়ে পড়ে। সঙ্কুচিতভাবে পর্দা তুলে চারিদিকে চেয়ে দেখে, বাড়ীর ভেতরে একটা ড্রেনের ধারে হাঁসের রাশীকৃত-মল পড়ে রয়েছে, আর সেই ড্রেনের সমস্ত নোংরা জল বর্ষা শেষের একটা টিনের ক্যানেস্তারাতে এসে জমা হচ্ছে। সেখান থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে সে দূরে চা-বাগানের দিকে, আরও দূরে হিমালয়ের গিরিশ্রেণীর দিকে, আকাশের রক্তিম দিক্-রেখার দিকে সন্নিবেশিত করে।

বাতাসে একটা বিচিত্র শুকনো গ্যাসের গন্ধ নাকে এসে লাগে। রেগেমেগে অস্থিরভাবে পা ঠুকতে ঠুকতে হেঁকে ওঠে: 'কোই হ্যায়?'

ভেতরে উঁচু পর্দায় কারা যেন বাদ-প্রতিবাদ করছে, তার ভেতর থেকে বাবু শশীভূষণের কণ্ঠস্বরই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কয়েক মুহূর্ত পরেই বাবু শশীভূষণের সশরীরে প্রবেশ।

একান্ত নম্রভাবে মুখ-চোখ বেঁকিয়ে, হাত রগড়াতে রগড়াতে বাবুজী বলে উঠলেন: 'গুড ইভ্‌নিং স্যার! সরি স্যার, বয় এখুনি চেয়ার আনছে!'

বলতে না বলতে বাবু একটা চেয়ার মাথায় ক'রে নিয়ে হাজির হয়।

শশীভূষণের অবস্থা দেখে ছ লা হাভর বুঝতে পারে, লোকটা সর্বান্তঃকরণে চাইছে তাকে খাতির ক'রে খুশী করতে কিন্তু সে জানে যে সে-সামর্থ্য তার নেই, তার ফলে বিভ্রান্ত আকুলতায় নিজেকে আরও বিপন্ন ক'রে তুলছে। তাই ছ লা হাভর সোজা কাজের কথা তোলে:

'তোমার স্ত্রী কেমন আছেন এখন?'

বাবু শশীভূষণ জানায়: 'দাই স্যার বলছে যে, দু'তিন ঘণ্টার মধ্যেই প্রসব হবে, রুগীর পাশেই বসে আছে দাই।'

ছ লা হাভর জিজ্ঞেস করে: 'সে কি পাশ-করা নার্স?'

তা যদি না হয়, ছ লা হাভর জানে, হয় শশীভূষণ না হয় তার স্ত্রী কিংবা সেই দাই, অথবা সেই স্ত্রীলোক দু'জনেই তার উপস্থিতিতে আপত্তি করবে। ছ লা হাভর অনুমান করে, সেইজন্তেই বাড়ীর ভেতর থেকে আসতে শশীভূষণের এত দেরি হয়েছিল। এবং এখনও পর্যন্ত বাড়ীর ভেতরে যে চেঁচামেচি, ফিসফিস, ফুসফাস হচ্ছে তা তার পক্ষে নিরর্থক নয়। সে শুনেছিল, বড় ঘরের য়ুরোপীয় মহিলাদের মত, বড় ঘরের ভারতীয় মহিলারাও পুরুষ ডাক্তারের হাতে প্রসূত হতে চান না।

বাবু শশীভূষণ একটু ভেবে নিয়ে উত্তর দেয়: 'হাঁ স্যার! আমার আর দু'টি সন্তানের সময় ঐ দাই-ই উপস্থিত ছিল কিনা।'

ড লা হাভর বুঝতে পারে না এক্ষেত্রে সে কি করবে, রুগীকে দেখতে যাবে, না তাদের জানায় প্রত্যাবর্তন করবে! তবে শশীভূষণের উত্তর থেকে তার বুঝতে দেরি হয় না যে, তাকে তারা চায় না। হয়ত এইসব গেঁয়ো দাই, তাদের বিরুদ্ধে লোকে যাই বলুক না কেন, তারা অভ্যাসবশতঃ নিজেদের কাজ ভালরকমই জানে। কিন্তু তবুও ডাক্তার হিসেবে তার একটা কর্তব্য এবং কৌতূহল আছে। রুগীকে অন্তত একবার চোখে দেখে যাওয়া উচিত।

'বসবেন না স্যার? একটু চা করছে, আর বাড়ীতে কিছু মিষ্টি তৈরি হয়েছে···আমাদের প্রথা স্যার, আজকের দিনে একটু মিষ্টি-মুখ করানো!'

সে-কথায় কর্ণপাত না ক'রে ড লা হাভর বলে: 'সে না হয় আমি পরে খাবো'খন কিন্তু মিসেস্ ভট্টাচার্যকে আমি একবার পরীক্ষা ক'রে দেখতে চাই!'

বাবু শশীভূষণ মহাবিপন্ন হয়ে পড়ে। প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে সাহেবের খর-দৃষ্টির সামনে সম্মতিই জানিয়ে ফেলে। বহুদিন সাহেবদের সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করার ফলে তার মনে যেটুকু ভব্যতার জ্ঞান হয়েছে, তাতে তার গৃহে-আগত ডাক্তারের এই আবেদন সে অগ্রাহ্য ক'রে উঠতে পারে না। বাড়ীর ভেতরে ঢোকবার দরজায় যে পর্দা টাঙানো ছিল, সেটা তুলে ধরে।

সঙ্গে সঙ্গে ভেতর থেকে একটা মর্মান্তিক চীৎকার-ধ্বনি জেগে ওঠে। ড লা হাভর একান্ত কুণ্ঠিত হয়ে পড়ে, যেন সে কোন ঘোরতর অন্যায় ক'রে ফেলেছে। ড লা হাভর ভাবে, যদি কোন ভাল নাই করতে পারি, এ অবস্থায় রুগীকে অকারণে উত্তেজিত ক'রে হয়ত তার ক্ষতিই করবো!

কিন্তু ফিরতে গিয়ে সে দেখতে পেলো, চীৎকার করছে সেই দাইটা। ঘরের ভেতর থেকে বাইরে রান্নাঘরের বারাণ্ডায় এসে দাইটা হাত নেড়ে নেড়ে বাংলা ভাষায় কি সব বলছে।

ড লা হাভর বুঝলো, শশীভূষণ তাকে ভর্ৎসনা ক'রে সরিয়ে দিল। আর কালবিলম্ব না ক'রে ড লা হাভর রান্নাঘরের বারাণ্ডার ওপর দিয়েই রুগীর ঘরের

দিকে অগ্রসর হলো। রান্নাঘরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে মনে মনে সে বুঝলো, আজ এদের রান্নাঘর সে অপবিত্র ক'রে দিয়ে গেল কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটা তাকে স্বচক্ষে দেখতে হবে, সেইটাই তার কাছে এখন প্রধান কর্তব্যের বিষয়।

ঘরের ভেতর ঢুকতেই দেখে রাশীকৃত ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘরের মধ্যে ঘুরছে। যেন কি একটা ওষুধ পোড়ানো হচ্ছে, ধোঁয়ায় তারই তীব্র গন্ধ।

জ লা হাভরকে দেখে শশীভূষণের সব চেয়ে ছোট ছেলেটি ভয়ে চীৎকার ক'রে কেঁদে উঠলো, আর দু'টি ইঁদুরের মত ছুটে পালালো।

ধোঁয়ার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সাহেবকে ওয়াকিবহাল করাবার জন্যে শশীভূষণ বলে ওঠে: 'এটা স্যার পবিত্র ধূপ···আমাদের সব অনুষ্ঠানে পোড়ানো হয়। বুড়ী দাইটা আবার ভয়ানক কুসংস্কারাচ্ছন্ন কিনা। তার মতেই অবশ্য এটা জ্বালানো হয়েছে।'

জ লা হাভরের মনে পড়ে, একবার থিয়সফিক্যাল সোসাইটির সভ্যা লেডী লুতিয়েনস্-এর বাড়ীতে এক অভ্যর্থনা-সভায় এই ধরনের ধোঁয়া আর গন্ধের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটে কিন্তু সে-ধোঁয়ায় তো এ-রকম নাক জ্বালা করতো না? মাথা থেকে টুপিটি খুলে হাতে নিয়ে, দরজার কাছে দাঁড়িয়ে, সেই ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মধ্যে দিয়েই রুগীর অনুসন্ধানে দৃষ্টিকে পরিচালনা করে, কিন্তু বিছানার যে অংশটা তার চোখে পড়লো, তাতে কিন্তু কেউ নেই···খালি।

পেছন দিক্ থেকে শশীভূষণ বলে ওঠে: 'আমার স্ত্রী, বুঝলেন কি না স্যার, বড্ড লাজুক!'

জ লা হাভরের মনে হলো যেন সে চীৎকার ক'রে অভিশাপ দিয়ে ওঠে। কিন্তু হঠাৎ বিছানার অপর প্রান্তে তার নজরে পড়লো, সর্বাঙ্গ বস্ত্রে সু-আবৃত এক নারী-মূর্তি বসে আছে, সেই আবছায়ার মধ্যে শুধু তার ঈষৎ-উন্মুক্ত মুখের খানিকটা ম্লান রেখা দেখা যাচ্ছে। তাকে দেখে, জ লা হাভরের মনে পড়ে, অরণ্যের ভীতা হরিণী, স্থির, শান্ত, সুদূর অথচ সন্নিকট। সে যেন স্পষ্ট দেখতে পায় তার প্রত্যেকটি নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস, দেখতে পায় ম্লান কুঞ্চিত অঙ্গবাসের

আড়ালে কম্পান্বিত দেহের সংগোপন-ভীতি, যে-ভীতির জন্যে দায়ী পুরুষরাই এবং যা আজ নিদারুণ লজ্জায় আত্মঘাতী হীনতায় তাকে সঙ্কুচিত ক'রে ফেলেছে। ঝ লা হাভরের মন সহসা বিরক্তিতে ভরে ওঠে। প্রাণপণ চেষ্টা করে মন থেকে সে-চিন্তা দূর করতে, কিন্তু কিছুতেই পারে না। এই-ভাবে একরকম জোর ক'রে এখানে নিজেকে নিয়ে আসার দরুন নিজেরই ওপর রাগ হয় এবং তার চেয়েও বেশী রাগ হয়, এইসব অর্থহীন লোকাচারের বিরুদ্ধে। পেছনে ফিরে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে।

বাইরে এসে বলে ওঠে: 'ওঁকে আর কষ্ট দিও না···বিশ্রাম করতে দাও··· যদি কোন বিপদ-আপদ হয় তখন আমাকে খবর পাঠিয়ো। কিংবা যখন দেখবে যে ব্যথা উঠেছে, তখন একটা খবর দিও, আমি কাছেই থাকবো··· যদি কোন দরকার লাগে···'

শশীভূষণ হাঁফ ছেড়ে বলে: 'হাঁ, স্যার, তাই হবে স্যার!'

তার পরেই চুপ ক'রে যায়, যেন ঠোঁটে হঠাৎ তালা-কুলুপ কে লাগিয়ে দিল। আর কিছুতেই এখন সে-কুলুপ খুলছে না। এই ব্যাপারটা ঝ লা হাভর বুঝে উঠতে পারে না। এদেশের সাধারণ লোকদের কথা-বলতে-বলতে হঠাৎ এই মুখ-বন্ধ-ক'রে-থাকা তার অসহ্য লাগে। অনর্গল বাজে বকতে বকতে হঠাৎ কখন তারা একেবারে মুখ বন্ধ ক'রে ফেলে, তা কেউ বুঝতে পারে না। এইজন্যেই শশীভূষণের ওপর ঝ লা হাভরের সব চেয়ে বেশী রাগ ধরে।

দরজার কাছাকাছি আসতেই, কোনরকমে পর্দাটা তুলে ধরে, সেই অভিশপ্ত পুরী থেকে ছুটে পালিয়ে যাবার জন্যে সে ব্যস্ত হ'য়ে পড়ে।

'আচ্ছা তাহলে আসি, সেলাম!' ঝ লা হাভর বেরিয়ে পড়ে।

মাথার উপরে আকাশে দিক্-রেখার দূর অদৃশ্য-লোকে তখন রাত্রি এসে মিশছে দিবসের সঙ্গে, সমস্ত উপত্যকা-ভূমিকে অনুরণিত ক'রে উঠছে ঝিঁঝির একঘেয়া ক্লান্ত ধ্বনি।

পথ চলতে চলতে আপনার মনে ভাবে, কুসংস্কার মরেও মরে না। সমস্ত জগৎ যেন সেই মুহূর্তে তার কাছে বিস্বাদ বলে বোধ হয়। নিজের অজ্ঞাতসারে কখন সে শুরু ক'রে দেয় নিজেরই সঙ্গে তর্ক। এই যে ধূপ জ্বালানো, এও কি শুধুই কুসংস্কার? এর মধ্যে কি কোন বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য নেই? মধ্যযুগের অন্ধকার পেরিয়ে যে-সব কুসংস্কার আজও বেঁচে আছে, অনুসন্ধান করলে দেখা যায় যে, তাদের অধিকাংশের মূলে একটা না একটা কিছু তাৎপর্য ছিল। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, সেকালে লোকে বুটের ফিতে খুলে আবার ফিতে লাগাতো, উদ্দেশ্য ছিল, ঠাণ্ডার হাত থেকে আত্মরক্ষা করা। যে-সব জীবাণুর দরুন ঠাণ্ডা লাগতো, এইভাবে ফিতে খোলা আর পরার দরুন, সেই সব জায়গায় রক্ত-চলাচলের সাহায্য হতো। কিন্তু সে যাই হোক, কুসংস্কার মাত্রকেই সে ঘৃণা করে, বিশেষ ক'রে, এই ভারতবর্ষের যতসব কুৎসিত কুসংস্কার। এরই জন্যে তো ইংরেজরা আঙুল বাড়িয়ে ভারতবাসীদের তাচ্ছিল্য করবার সুযোগ পায়। আর এরই জন্যে সে তাদের পক্ষ সমর্থন করতে চাইলেও, মনের উপযুক্ত জোর পায় না।

অবশ্য শশীভূষণকে দেখে সকলকে বিচার করা ঠিক নয়। সে দেখেছে, অধিকাংশ কুলি স্বচ্ছন্দ সহজ জীবন-যাপন করে এবং তাদের সব দীনতার মধ্যেও একটা বিস্ময়কর স্বাভাবিক আত্মমর্যাদাবোধ আছে, যার প্রেরণায় তারা মাথা তুলে থাকতে পারে। কিন্তু এই বাবু শ্রেণীর লোকেরা, সর্বদাই দণ্ডবৎ দুমড়ে চলাফেরা করতে করতে এক-শ্রেণীর ঘৃণ্য জীব হয়ে উঠেছে।

ইংরেজরা এদেশে এসে অনায়াসেই ধরে নেয় যে, এদেশের লোকদের মুক্তি নির্ভর করছে একমাত্র ইংরেজদের চোখে যোগ্য হওয়ার ওপর। ডাক্তার দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিজের মনেই বলে ওঠে: 'হায়! যদি ইংরেজরা গোড়া থেকেই এদেশের লোকদের মানুষ হিসেবে তাদের সমান মর্যাদার চোখে দেখতো!' কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, ইংরেজরা তাদের চরিত্রের যেটা ত্রুটি সেইটেকেই এখানে

সব চেয়ে বড় ক'রে তুলে ধরলো, আর ভারতবাসীদের মধ্যে যেদিকটা ছিল দুর্বল, তাকেই সব চেয়ে বেশী আকর্ষণ ক'রে নিয়ে এলো বাইরে।

কি ক'রে যে এই মানসিক বিপর্যয় ঘটলো, নিজের মনের সূক্ষ্ম বিচারে তা সে বুঝতে পারে। ইংলণ্ডে, সাধারণ নাগরিকরা নানাধরনের মতবাদের মধ্যে দিয়ে, এ কথাটা সহজ সত্যরূপে স্বীকার ক'রে নিয়েছিল যে, জগতে মানুষে মানুষে যে চরিত্রগত ভেদ, তার মধ্যে ছোট-বড়র কোন স্থান নেই। কিন্তু সেই সব লোকই যখন, 'হোম্' পরিত্যাগ ক'রে বিদেশে এলো, দেখলো সাত-সমুদ্রের জলে তাদেরই জাহাজ পণ্য নিয়ে ঘোরাফেরা করছে, তাদেরই দেশের লোক অপর দেশ শাসন করছে, তখন তাদের মনে জেগে উঠলো, তাদের পূর্ববর্তী দুঃসাহসিক অগ্রগামীদের কথা, যারা সমুদ্রের তরঙ্গ উল্লঙ্ঘন ক'রে, বাধা-বিপদ তুচ্ছ ক'রে, তাদের জন্যে জয় ক'রে রেখে গিয়েছিল পৃথিবীর দূর-দূরান্ত প্রদেশ। ইংলণ্ডের মহিমার স্বপ্নে আচ্ছন্ন হয়ে গেল তাদের মন। তার আগেই টি. ই. লরেন্স, কিপলিঙ্ আর বয়েজ-ওন্-পেপার পড়ে শৈশব থেকেই সেই মন নিজের জাতির গর্বে ভরপুর হয়েছিল। সেই গোপন গর্বের উর্বর ক্ষেত্রে ইংরেজ-জাতির এই আত্মবিস্তারের স্বপ্ন দেখতে দেখতে আত্ম-শ্লাঘার মহীরুহরূপে আকাশের দিকে মাথা তুলে উঠলো। স্বদেশে যে ছিল দয়া-প্রবণ, শান্ত, নির্বিরোধ, পক্ষপাতহীন, স্নিগ্ধ ও নমনীয়, বাইরের জগতে এসে সে-ই ক্রমশ হয়ে উঠলো কঠোর, কঠিন, আত্মসর্বস্ব...। মানুষ মাত্রই সমান মর্যাদার যোগ্য, সে-মতবাদের তখন তারাই অন্য ব্যাখ্যা দিতে শুরু করলো।

তখন ইংলণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়ে জনকয়েক ভারতবর্ষীয় ছাত্র উচ্চশিক্ষার জন্যে গিয়েছিল। অতিথি হিসাবে তাদের স্বীকার ক'রে নেওয়া হয়, এমন কি নিগ্রোদের চেয়ে তারা উচ্চশ্রেণীর জীব, এরকম একটা ধারণাও তাদের মনে হয়, কারণ নিগ্রোদের মতন এত কালো তো তারা ছিল না। কিন্তু স্বীকার ক'রে নেওয়া হলেও, তাদের যথাসম্ভব স্বতন্ত্র ক'রেই রেখে দেওয়া হয়। আতিথ্য-ধর্মের উৎসাহে এবং কৌতূহলের প্রেরণায় তাদের মাঝে-মধ্যে

পিঠ-চাপড়ে বাহবাও দেওয়া হতো। বাহবা তারা দিতে পেরেছিল, তার কারণ তারা বুঝেছিল, এরা নিরীহ, এদের কাছ থেকে কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নেই, এরা কর্মক্ষেত্রে তাদের প্রতিযোগী নয়। কিন্তু যে-মুহূর্তে প্রতিযোগিতার কথা উঠলো, সে-মুহূর্তে সব বদলে গেল। ক্রমশ যখন কালো ভারতবর্ষীয় ডাক্তারেরা একজন দু'জন ক'রে আই. এম্. এস্-এ স্থান পেতে শুরু করলো, তখন জেনারেল মেডিক্যাল কাউন্সিল দেখলো, বিশেষ প্রতিবন্ধক তৈরি করার প্রয়োজন। ইংরেজ তার সমকক্ষ প্রতিযোগীরূপে কাউকেই স্বীকার করতে চায় না, তা সে ফরাসীই হোক স্পেনিয়ার্ডই হোক, অথবা 'ডার্টি' য়িহুদী হোক। তবুও 'হোমে' সকলের জন্যে সমানভাবে সব দ্বার মুক্ত, কার্যত না হোক কথার দিক্ দিয়ে এটা অন্তত চলিত ছিল···খেলতে এসে খেলার নিয়ম মেনে চলা, বিচার করতে বসে সকলকে আইনের সমান দৃষ্টিতে দেখা, ন্যায়-ধর্ম আর সুবিচার এই হলো ইংলণ্ডের সনাতন ধর্ম। কিন্তু পি এণ্ড ও কোম্পানীর স্টিমার বম্বের ঘাটে লাগবার আগে থাকতেই ইংরেজরা বুঝলো যে নেটিভদের তাদের সমকক্ষ হিসাবে দেখার মধ্যে অনেক অসুবিধা রয়েছে।

তারা হলো একটা শক্তিশালী জাতির প্রতিনিধি, বহুদিনের ব্যবহারে সিদ্ধ তাদের স্বতন্ত্র আচার-অনুষ্ঠান, স্বতন্ত্র পরিমাপ। তারা কি ক'রে এই বৃহৎ মহাদেশের শতশত বিভিন্ন জাতি, উপজাতির সঙ্গে নিজেদের এক ক'রে মিলিয়ে মিশিয়ে দিতে পারে? এদের না আছে কল্পনা, না আছে কোন আদর্শ, আছে শুধু কতকগুলো ধারণা, আসলে যা হলো শুধুই কুসংস্কার। অবশ্য, একথা তারা অস্বীকার করে না যে, এদেরও স্বতন্ত্র আচার-অনুষ্ঠান আছে···তবে এইসব নেটিভদের আচার-অনুষ্ঠানও সম্পূর্ণ আলাদা, তাদের সঙ্গে কোন মিলই নেই তাদের মনের।

এই আপাত-বিরূপতার সামঞ্জস্য বিধানের কোন চেষ্টাই তারা করলো না। দরকার হলে, ইণ্ডিয়ানরা তাদের অনুকরণ করতে পারে কিন্তু তারা মরে

সেজেও অন্ত কারোর কাছ থেকে কোন বিধি-বিধান নিতে প্রস্তুত নয়, তাদের মাথায় বাজ ভেঙে পড়বে, যদি নেটিভদের সঙ্গে আপসে তাদেরও নেটিভ হতে হয়।

আজ ফ্র লা হাভর জানে জাতিচ্যুত হওয়া মানে কি। সে মর্মে মর্মে জানে ইংরেজ-জাতির অনমনীয় জাত্যাভিমান. একদিন তার নিজেরও ছিল। কিন্তু আজ সে জাতিচ্যুত, একঘরে। তার কারণ, সে তাদের সেই অপরিবর্তনীয় দেবত্বকে তুচ্ছ করেছে; যে-জগতে আচারের শৃঙ্খলে বাঁধা থেকেই মানুষ সুখ পায়, সে সেখানে আচারের শৃঙ্খল ভাঙবার দুর্বুদ্ধি পোষণ করে।

অন্ধকারে কোথা থেকে স্নিগ্ধ মৃদু বাতাস এসে তার কপালের ঘাম যেন মুছিয়ে দিয়ে যায়। কিন্তু ঘাড় না তুলেই সে যেমন চলছিল, তেমনি এগিয়ে চলে, ভাবে, শশীভূষণের এই চরিত্রগত ভীরুতার পেছনে কতখানি আছে জন্ ট্রুকের বাঁদামি। এদের জগতের ধারাই হলো, মানুষকে রিক্ত সর্বহারা ক'রে তার নিজের কাছে তাকে ছোট ক'রে এনে, তার পর তাকেই নোংরা বলে, হীন বলে গালাগাল দেওয়া।

কিন্তু তবুও নিজের মনকে সে বুঝিয়ে সন্তুষ্ট করতে পারে না। ম্যাকেরা একদিন বলেছিল: 'বাঙালীদের বিশ্বাস করা চলে না। যখন সুসময় থাকে তখন তারা খুব অমায়িক, খুব বন্ধু-প্রিয় কিন্তু দুঃসময়ে তারা প্যাকাটির মত ভেঙে যায়।' ফ্র লা হাভর বিচার ক'রে দেখে, এই উক্তির পিছনে রয়েছে সেই জাত্যাভিমান। 'বাঙালীদের বিশ্বাস করা যায় না, তবুও ইংরেজরাই পারে তাদের বিশ্বাস করতে।'

মনে পড়ে, একবার এই ভারতবর্ষেই রেলে যেতে যেতে একজন ইংরেজ অধ্যাপকের সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছিল, চার্লস ভেভী, তিনিও বলেছিলেন, এদেশের লোকদের জন-মজুরতা সম্বন্ধে। ফ্র লা হাভর তাঁকে প্রতিবাদ করেছিল, বলেছিল, পাঞ্জাবের বলিষ্ঠ চাষীদের দিকে চেয়ে সে-কথা কেউ

বলতে পারে না। তর্ক উঠেছিল, আর্যামি সম্বন্ধে···ইংরেজ অধ্যাপক বলেছিলেন, তাঁরা হলেন আর্যরক্তের উত্তরাধিকারী। ম্ল না হাভর, শরীর-বিজ্ঞান থেকে তাঁকে প্রতিবাদ ক'রে বোঝাতে চেয়েছিল, বর্তমান জগতের এই আর্যামি, এটা হলো একটা নিছক আত্মবিলাস। বিশুদ্ধ একজাতির আজ জগতে কোথাও নেই, তারা প্রত্যেকেই কোন না কোন বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণফল। কিন্তু কেন যে তার মতে সেই ইংরেজ অধ্যাপক সায় দিতে পারেন নি, তা বুঝতে ম্ল না হাভরের দেরি হয় নি। ইংরেজরা যে একটা স্বতন্ত্র শ্রেষ্ঠ জাতির প্রতিনিধি, জ্ঞান-বুদ্ধি এবং ন্যায়ধর্ম যাদের একচেটিয়া সম্পদ, এই মতবাদের মূলে প্রত্যহ জলসেচন না করলে, ভারতে ইংরেজ-আধিপত্যের কল্পতরুটিকে জীইয়ে রাখা যাবে না। বিপ্লবের সম্ভাবনার বিরুদ্ধে এইটেই হলো তাদের রক্ষা-কবচ।

এই সমস্ত যুক্তি-তর্কের বাইরে, একটা মস্ত বড় কথা হলো, ভারতবর্ষে ইংরেজরা বাইরে যাই দেখাক না কেন, ভেতরে ভেতরে একান্ত ভীত থাকে, তার কারণ, চারিদিকের লক্ষ লক্ষ লোকের জনতার মধ্যে তারা নিজেদের বিচ্ছিন্ন, একক মনে করে। তাই তারা মনে মনে ভয় পায়···সেইটাই হলো আসল সত্য। এবং এই ভয়ই রূপান্তরিত হয়ে শিং নেড়ে গুঁতোতে আসে।

হঠাৎ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে উপলব্ধি করে যে, এতক্ষণে ঠিক সমাধানের সন্ধান সে বার করতে পেরেছে। আপনার মনে বলে ওঠে: 'ভাবতে আশ্চর্য লাগলেও এই হলো আসল সত্য, এই হলো এদেশের ইংরেজদের প্রকৃত মানসিক বিশ্লেষণ। এই জাত্যভিমান, এই স্বদেশের স্বাতন্ত্র্যের গর্ব, 'হোম' সম্পর্কে আত্যন্তিকতা, এ সকলের মূলে রয়েছে অর্থনৈতিক প্রভুত্বের লোভ। এবং সর্বরকম মানবীয়তা, মানুষের মন নিয়ে মানুষকে দেখার কণতম মধুর চেষ্টা, সব বিসর্জন দিয়েই অর্জন করতে হয়েছে এই অর্থনৈতিক প্রভুত্ব।' এই চিন্তার বিদ্যুৎ-স্পর্শে তার ভেতরটা যেন জলে পুড়ে যায়···সে অধীর চঞ্চল হয়ে ওঠে। জীবনে বহুবার সে এই নিয়ে

ভেবেছে, এবং প্রত্যেক বারই সে এই এক সিদ্ধান্তে এসেছে। কিন্তু আজ তার এই চিন্তায় তারে সে যেন নিজে ক্লান্ত হয়ে ছুয়ে পড়ে।

কিন্তু হঠাৎ তার মনের ভেতরে কোন্ অস্পষ্ট বিস্ময়ের পাথরে ধাক্কা লেগে সে সচকিত হয়ে ওঠে, শশীভূষণকে সমর্থন করবার তার এই মানসিক চেষ্টায় সে কি সত্যি সফল হয়েছে?

হঠাৎ পেছন দিক্ থেকে ভারী ভাঙা গলায় কে যেন ডেকে উঠলো: 'সাহেব! সাহেব!'

থেমে পিছন ফিরে দেখে, হাতে একটা হারিকেন লণ্ঠন নিয়ে শশীভূষণ ছুটতে ছুটতে আসছে···আর চীৎকার ক'রে ডাকছে: 'সাহেব, সাহেব··· ছেলের মাথা দেখা দিয়েছে···'

গুলা হাডর বিরক্ত হয়ে ধাবু শশীভূষণের বাড়ীর দিকে এগিয়ে চলে।

॥ বার ॥

'মাগো, ওমা,
মা-জননী আমার,
যখনি মনে পড়ে তোর কথা,
হঠাৎ মাগো পাই বড় ব্যথা···'

বনের মধ্যে শুকনো ডাল-পালা কুড়তে কুড়তে আপনার মনে নীলা গান গায়। বাড়ী থেকে বেরুবার সময় আপনার মনে অস্ত গানের টুকরে টুকরো কথা, যা মনে আসছিল, তাই গাইছিল। ছেলেবেলায় তাদের গাঁয়ে যে সব গান শুনেছিল···তারই টুকরো টুকরো স্মৃতি। হঠাৎ এক-একটা লাইন মনে আসে···আবার হঠাৎ ছেড়ে দেয়। কিন্তু সব কথার আড়ালে একটা সুর তার মনকে আচ্ছন্ন ক'রে থাকে। কোন যাত্রার আসরে

কোন্ মাতৃহারা শিশু পেয়েছিল···সব কথা আজ আর মনে পড়ে না। শুধু তার স্বরটা মন উপচে উঠে গলার কাছে এসে অনবরত পাক খায়, যেন তার শ্বাসরোধ হয়ে আসে। তাই বারে বারে শুধু গুনগুনিয়ে ওঠে, 'মা, ওগো মা···'সেই টুকরো কথার মধ্যে যে সহজ আন্তরিকতা ছিল, তার অন্তরকে তা অভিভূত ক'রে ফেলে···তার নিজের মা সম্বন্ধে ভাবতে গেলেই তার ঐ কথাই মনে পড়ে।

সজনী যেদিন মারা গেল, সে পাগলের মত শুধু কেঁদেছে। দিনের পর দিন, সংসারের সব কাজ করতে করতে, সে শুধু কেঁদেছে। সংসারের প্রতিটি খুঁটিনাটি কাজ তাকেই করতে হয়েছে এবং করতে গিয়েই তার মনে হয়েছে, একাজ তার মা-ই করতো। প্রত্যেকটি কাজ তাকে মনে করিয়ে দিয়েছে, আজ আর তার মা নেই। যে সব জিনিসের সঙ্গে তার মার স্মৃতি জড়িয়েছিল, ক্রমশ তারা একে একে তার চোখের সামনে থেকে সরে গেল··· কিন্তু মনের মধ্যে একটা ফাঁক, তা আর ভরাট হলো না। কি একটা অস্পষ্ট অভাব বাণীহীন হয়ে সেই শূন্য মনের আকাশে ঘুরে বেড়ায়, তাকে সে রূপ দিতে পারে না। তাই মন বারে বারে শুধু সেই একটি কথায় ভেঙে পড়ে, '[illegible]'

বার বার সেই এক কথা একই সুরে গেয়ে চলে। কাজ করে আর আনমনে গায়। চেয়ে থাকে কিন্তু দেখতে পায় না। ঘাস, শুকনো ঝোপ, গাছের শেকড়, মরে যাওয়া লতা, যা কিছু অগ্নির খাদ্য, দাও দিয়ে কেটে কেটে চলে।

কোন্ অন্ধকার মাটির গর্তের ভিতর থেকে, নানা জাতীয় কীট-পতঙ্গ, অরণ্যবাসী অদৃশ্য নানা ক্ষুদ্র প্রাণী প্রত্যেকে তাদের বিচিত্র কণ্ঠস্বরে অনবরত চীৎকার ক'রে চলেছে। চোখ তুলে যেদিকে চায়, সেই দিকেই চোখে পড়ে শুধু থাকের পর থাক, স্তরের পর স্তর, শেষহীন ঘন-সবুজের বিস্তার···দুর্ভেদ্য, দুর্বোধ্য···ভয়াল···সমস্ত মিলে একটা প্রবল অত্যাচারের মতন তার মনের

ওপর আধিপত্য বিস্তার করে। তার ফলে, ভয়কে প্রতিরোধ করবার মত যেটুকু মানসিক শক্তি সংগ্রহ করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল, তাও সুদূরপরাহত হয়ে যায়। অরণ্য তার অন্তরের আতঙ্ককে আরও নিবিড় ক'রে তোলে।

ভয়ে তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে ওঠে। সমস্ত মুখ ম্লান হয়ে যেন কাঠের মত শক্ত হয়ে আসে। হাতের কাস্তের শব্দে, প্রাণপণ চেষ্টা করে, নিজের মনকে সংযত ক'রে রাখতে, কোনরকমে ভয়কে ভুলে থাকতে। এবং তারই জন্যে সে ভুলে-যাওয়া আর-একটা গানের দু'একটা কলি গেয়ে ওঠে :

> 'কত কথা মনে ছিল, তাকে বলবো ব'লে,
> কিন্তু হায়, তার সামনে সবই গেলাম ভুলে।
> সখিরে,
> মনের কথা মনেই রয়ে গেল, বলা হলো না আর···'

ভুলে-যাওয়া ভালবাসার গানের প্রথম কলিটুকু···তার পর আর কোন কথাই মনে নেই। কিন্তু গান শেষ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আশে-পাশের নীরবতা, তার মনে হয়, যেন আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। তাই তাড়াতাড়ি কাস্তেটা তুলে নিয়ে, একটা ডুমুর গাছের তলায় যে শুকনো ঝোপটা ছিল, তা থেকে লতা-পাতা কাটতে শুরু ক'রে দেয়।

কাস্তে চালাতে চালাতে কখন আবার অন্যমনস্ক হয়ে যায়, শব্দ-ভরা স্বপ্নময় অন্ধকারে যেন তার বাহ্যিক চেতনা হারিয়ে যায়।

ক্ষণিকের জন্যে তার চিত্তাকাশে জন্মভূমির বিরল-শস্য পর্বত মালার মাথার ওপরে একটা ছোট্ট তারা ফুটে ওঠে···ক্ষণিকের জন্যে তার মস্তিষ্কে একটুখানি আলোর রেখা জ্বালিয়ে তুলে আবার অদৃশ্য হয়ে যায়। তার পর,

পর্দার ওপরে যেমন ছবি ভেসে চলে যায়, তেমনি বহু মুখের আবছা ছায়া একটার পর একটা ভেসে চলে যায়···শ্রমবারি-সিক্ত রুক্ষ-কোমল যেমলা সব মুখ···তার জীবনের আশে-পাশে রোজ যাদের দেখেছে···

তার পর কখন বিস্মৃতির ঘন কুজ্ঝটিকায় ভরে ওঠে মন···তার মধ্য থেকে আপাতলুপ্তমান এই লতাগুল্মকে খুঁজে বার করতে রীতিমত বেগ পেতে হয় তাকে।

কিন্তু এই সব কিছুর অন্তরালে, নিঃশব্দে ধীরে জেগে উঠেছিল সুখময়, শান্তিময় উদার এক আবির্ভাব···তার জননীর মূর্তি। যেন তার পাশে জননীর স্নেহাঞ্চলের স্পর্শ তার গায়ে এসে লাগে, তার স্নিগ্ধ উষ্ণ সান্নিধ্যে পুলকিত হয়ে ওঠে দেহ-মন।

ধীরে স্মৃতির অস্পষ্ট আবছায়া থেকে যেন তা স্পষ্ট মূর্তি ধরে সে-প্রেম দৃষ্টি দিয়ে তাকে অবলেহন করে, লীলা যেন স্পষ্ট শুনতে পায় তার মা তাকে ডেকে বলছে : 'ওরে আমার সোনা মেয়ে, দুঃখ করিস্ না···আমি বলছি তুই সুখী হবি···তোর বাবাকে আমি বলেছি তোর বিয়ে দিতে···শীগগিরই তোর বিয়ে হবে· স্বামীর ঘর করতে যাবি। কিন্তু আমি এখন আর নেই··· বুড়ো বাপ আর ছোট ভাইকে দেখাশুনা করতে যেন ভুলিস না···

লীলা সাহস ক'রে সামনে চোখ তুলে চাইতে পারে না·· মনে হয় যেন চোখ তুলে চেয়ে দেখলেই হয়ত দেখতে পাবে সে-মুখ ইতিমধ্যেই পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে···হিম-কঠিন, সুদূর···কিন্তু তবুও সে যেন স্পষ্ট অনুভব করে, শেষ-বিদায়ের জন্ত তার মা যেন তাকে বুকে জড়িয়ে চেপে ধরেছে···

সজোরে নিজেকে একবার নাড়া দিয়ে, নিঃশ্বাস রোধ ক'রে সে সোজা সামনে চেয়ে দেখে, ছায়া-মূর্তি মিলিয়ে গিয়েছে ঘন-সবুজের অরণ্যে।

এতক্ষণ ধরে যে সব ডাল-পালা কেটে জড় করেছে, সেগুলো এক জায়গায় নিয়ে একটা দড়ি দিয়ে বাঁধে। দড়িটা বাড়ী থেকে সঙ্গে ক'রেই এনেছিল।

কাঠের বোঝাটা তুলে নিতে গিয়ে দেখে, কাছেই একটা ডুমুর গাছে তলায় একটা মস্ত বড় ডাল ভেঙে পড়ে আছে। একটা ডালেই সারাদিন চলবে···ফুঁ দিয়ে আর চোখ ব্যথা করতে হবে না। তাই সেটাও সঙ্গে নেবার জন্যে সেদিকে অগ্রসর হয়।

হঠাৎ বুনো গোলাপের গন্ধে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে, কোথায় কোন্ ঝোপে ফুটেছে ফুল চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখে।

একটা ঝোপের কাছে গিয়ে ঝুঁকে প'ড়ে ফুল তুলতে যাবে, এমন সময় দেখে এক বৃহৎ অজগর সাপ নিমেষের মধ্যে তাকে জড়িয়ে ধরেছে।

ভয়ে তার কণ্ঠরোধ হয়ে যায়। কপাল থেকে ঘাম ঝরে সারা গা বেয়ে পড়ে···অমোঘ ভবিতব্যতার অকস্মাৎ আঘাতে বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ড সজোরে দুলতে থাকে···তার স্পষ্ট ধারণা হলো যে সে মরে যাচ্ছে।

কয়েক মুহূর্তের মত তার শ্বাস-প্রশ্বাস যেন একেবারে বন্ধ হয়ে যায় তার পর বহুকষ্টে যখন আবার নিঃশ্বাস নিতে পারলো, বুঝলো সে এখনো মরে নি। তবে সারা দেহ কাঁপছে···অসহ্য ব্যথায় টনটন ক'রে উঠছে।

অচল অনড় অবস্থায় কিছুক্ষণ থাকার পর, হঠাৎ তার ভেতর থেকে আত্মরক্ষার একটা তীব্র চেষ্টা জেগে উঠলো···যেমন ক'রে হোক এই বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করতেই হবে। কিছুতেই সে মরবে না। মনের সমস্ত শক্তি সংহত ক'রে ছাড়াবার জন্যে সে হাত-পা ছুঁড়তে থাকে। এধারে তখ নিঃশব্দ ধারায় সন্ধ্যার অন্ধকার স্তরে স্তরে দ্রুত নেমে আসছে। সে ঘনায়মান অন্ধকারে অসহায় ব্যর্থ চেষ্টায় তার সমস্ত দেহ দুমড়ে মুষড়ে যা ···কিন্তু কোন মতেই সে-বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারে না। নাগ পাশ-বন্ধনের চাপে ক্রমশ অনুভব করে, দেহের সমস্ত রক্ত ছুটে মাথা দিকে উঠছে···অসহায় হতাশায় বুঝতে পারে সে-মৃত্যু-আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করার শক্তি তার নেই···সে চীৎকার ক'রে কেঁদে ওঠে। কাঁদতে গিয়ে দেখে, চোখ দিয়ে জল পড়ে না, গলা দিয়ে কথা বেরোয় না।

অসহ্য দেহের যন্ত্রণা, মর্মান্তিক ভীতি আর মৃত্যুর আতঙ্ক, সমস্ত মিলে যেন ক্ষুরধার তরবারির মত তার মাথার উপর উদ্যত হয়েছে, এখুনি শেষ হয়ে যাবে জীবন···সেই মহা-অনিবার্যতার কাছে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে দিয়ে সে শুধু মুহূর্ত গুণে চলে। কাছাকাছি কোথাও, তার দৃষ্টির বাইরে অজগরটার দমকে দমকে বিষ-গর্জন তার কানে এসে বিঁধতে থাকে···মৃত্যুদূতের সুনিশ্চিত পদধ্বনির মত সেই বিষাক্ত শব্দ তার অবশিষ্ট চেতনাকে যেন বিলুপ্ত ক'রে দেয়।

উন্মাদের মত লীলা অন্তিম চীৎকার ক'রে ওঠে। মনে হয়, সেই লৌহ-নিষ্পেষণে তার বাঁচবার শেষ ইচ্ছাটুকুও যেন বিমর্দিত হয়ে যাচ্ছে। দু'চোখের পাতা মৃত্যু-আবেশে ভারী হয়ে আসে। আপনা থেকে দু'চোখ বুজে শেষ-নিদ্রার ঘন-অন্ধকারের মধ্যে নিজেকে ছেড়ে দেয়।

সহসা সেই শেষ-মুহূর্তে তার মনে হলো, ডান হাতটা যেন সাপটার গায়ের ওপর এসে পড়েছে। তখনও তার হাতের মুঠোতে কাস্তেটা রয়েছে। যন্ত্রচালিতের মত কাস্তেটা তার দেহের মধ্যে চালিয়ে দেয়···ভেতরকার কোন্ নিগূঢ় শক্তির আত্ম-প্রকাশের চরম প্রয়াস। কিন্তু আঘাত পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাপটা আরও জোরে জড়িয়ে ধরে।

হঠাৎ পায়ের ওপর গরম কি যেন এসে পড়লো···ঘাড় ফিরিয়ে দেখে, রক্ত···সঙ্গে সঙ্গে কাস্তেটা তুলে সজোরে আর-একবার তার দেহের মধ্যে চালিয়ে দিল···দু'টুকরো হয়ে সাপটা পড়ে গেল···

দু'হাত দিয়ে বেষ্টিত অংশটা সজোরে পা থেকে খুলে ফেলে ছুটতে আরম্ভ করলো। মনে পড়লো, সংগৃহীত কাঠের বোঝা···খালি হাতে বাড়ী ফিরলে চলবে না···ফিরে এসে সেটা কাঁধে তুলে নিল···

শুধু তার নিজের হৃদ্-স্পন্দনের শব্দ প্রত্যেক পদক্ষেপের সঙ্গে সে শুনতে পায়···অন্য সব শব্দ তার তলায় চাপা পড়ে যায়···

বনের বাইরে গাঁয়ের পথে যখন এসে উপস্থিত হলো, তখন শোনে, তার পায়ের তলায় শুকনো-পাতা মাড়িয়ে-যাওয়ার আওয়াজ উঠছে···

ঘরের দরজার সামনে আসতেই দেখে গজু দাঁড়িয়ে। ক্রুদ্ধ কণ্ঠে গজু বলে ওঠে: 'একি! তোর কাপড়ে রক্ত মাখানো কেন? কোথায় এতক্ষণ ছিলি [illegible]? রক্তখাকী হারামজাদী…'

পাগলা গজুর মুখ থেকে সেই বিচিত্র সম্ভাষণ-বাণী শুনে, লীলা স্তব্ধ বিস্ময়ে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকে…মনে হয়, যেন বহু দূর থেকে অন্য আর-এক [illegible] দেখছে…

মাথার ভেতর কি যেন দুলে ওঠে…জ্ঞানহারা সেইখানে লুটিয়ে পড়ে যায়।

॥ ভের ॥

রাত্রির খাওয়া-দাওয়া সেরে নারাণ তার প্রতিবেশী গজুর দরজায় এসে ডাকে: 'বলি, ও গজু ভায়া, ঘুমুলে নাকি?'

ঘরের ভেতর একটা ছোট চার-পায়ার ওপর বসে গজু তখন হুঁকো টানছিল…বুধু তার পাশে শুয়ে নাক ডাকাচ্ছিল। এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে জবাব দেয়: 'না, ভাই!'

সজনীর মৃত্যুর পর সে বড় একটা কারুর সঙ্গে বেশী কথাবার্তা বলতো না, তার ওপর সেদিন অজগরের হাতে পড়ে লীলার নাকালের কথা শুনে, সে আরও যেন চুপচাপ হয়ে গিয়েছিল। তাছাড়া, গরমও পড়েছে অত্যধিক। মাঝ-গ্রীষ্মের নিবাত রাত্রির গুমোট যেন মগজকে পর্যন্ত গলিয়ে গুলিয়ে দেয়। আকাশ আর পৃথিবীর মাঝখানে মহাশূন্য পরিব্যাপ্ত ক'রে আছে একটা নিরর্থক ক্লান্তির বর্ণহীন বাষ্প…ওপরে আকাশ-ভরা অসংখ্য তারা জমাট-বাঁধা অন্ধকারে দল-বেঁধে অকারণ অপচয় ক'রে চলেছে তাদের দীপ্তি।

নারাণই কথা পাড়ে।

'কাল যে তেঁতুলের চাটনিটা পাঠিয়েছিলে, বড় ভাল লেগেছিল আমাদের! তোমাদের উত্তুরে দেশে ভাত দিয়ে রোজ চাটনি খাওয়া রেওয়াজ নাকি?'

'হাঁ, বাবা! জিনিসটা খুব উপকারী···পিত্তি নাশ করে···' গনু জবাব দেয়।

তার পর দু'জনেই কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকে। বাইরে রাত্রির অন্ধকারে অরণ্য জেগে ওঠে তার সহস্র নিশ্বাসে।

চার-পায়ার এক কোণে বসে নারাণ বলে:

'আজকে জঙ্গলে ভূতেরা রাত জাগতে আসবে···মহাদেবকে নিয়ে যাবার জন্যে···মহাদেব গো···চেনো না তাকে? আমাদের দলেরই একজন কুলি··· দু'নম্বর লাইনে থাকতো····'

নারাণ ব'লে চলে: 'যেখানে তোমার বউ আর মেয়ে কাজ করতো, সেই যে খালি জায়গাটা···হঠাৎ সেখানে দেখা গেল যে তার মৃতদেহ পড়ে রয়েছে। তার কাছেই যে গাছটা আছে, দেখেছ তো? লোকে বলে সেই গাছের ডালের সঙ্গে নিজের কাপড়ের ফাঁস গলায় লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছে। কিন্তু আমার বিশ্বাস, মা কালী রুষ্ট হয়ে টেনে নিয়েছেন।'

গনু ব'লে ওঠে:

'কিন্তু পরশু দিনই তো তাকে দেখেছি দিব্যি সুস্থ দেহে ঘুরে বেড়াচ্ছে?'

'আরে, তোমার বউ যেদিন মারা যায়, তার আগের দিন তো সেও দিব্যি সুস্থ ছিল! আর, আমার কাছ থেকে শোন, যে জন্যে মহাদেব মারা গেল, তোমার বউও ঠিক সেইজন্যেই মারা গিয়েছে। ঐ খালি জায়গাটায় যে পা দেবে, সে মরবে। এমন কি সাহেবরা পর্যন্ত, সেইজন্যে ও-জায়গাটায় চাষ না করিয়ে খালি রেখে দিয়েছিল।'

বিশ্বাস না করলেও, কৌতূহলবশত গনু জিজ্ঞেস করে:

'কিন্তু কেন এমন হয়?'

নারাণ সুযোগ পেয়ে সবিস্তারে বলতে আরম্ভ করে : 'তার কারণ আছে, নিশ্চয়ই। আমি এখানে আসার পর নিজের চোখে দেখেছি, সাহেবরা পাঁচ পাঁচবার চেষ্টা করে ঐ জায়গাটায় ফসল বুনতে···পাঁচ পাঁচবারই চারা গাছ শুকিয়ে মরে গেল। ফসল আর হয় না। লোকে বলে, সেকালে যখন আসামের রাজারা এখানে রাজত্ব করতো, ঐখানটায় মা-কালীর একটা বড় বড় মন্দির ছিল। আগাগোড়া সোনার তৈরী মূর্তি···পেটের বদলে ও-জায়গাটায় ছিল একটা মস্ত বড় গর্ত। ঐ যে খালি জায়গাটা···ঐখানেই মার বলি হতো। নিত্য বলির ব্যবস্থা ছিল···ছাগল···ভেড়া···এমন কি মানুষ পর্যন্ত।···সাহেবরা যখন এদেশে এলো, তারা রাজাকে বলি-দেওয়ার প্রথা তুলে দিতে বললো। শেষকালে রাজাকে সাহেবদের কথা স্বীকার করতে হলো এবং মার বলি বন্ধ হয়ে গেল। একদিন মার মন্দিরের পুরোহিতকে মা স্বপ্নে দেখা দিয়ে বললেন, আমার খিদে পেয়েছে···আমার খিদে মেটা···আমার রক্ত চাই।···

'তার পর আসামের রাজাদের তাড়িয়ে সাহেবরাই এদেশ দখল ক'রে নিল। তখন তারা বন-জঙ্গল কেটে চায়ের আবাদ শুরু ক'রে দিল। কিন্তু ঐ খালি জায়গাটুকুতে যতবার তারা চাষ করেছে, ততবারই হেরে গিয়েছে। যে ঐ জায়গা মাড়িয়েছে, সেই মারা গিয়েছে।···

'লোকে বলে প্রত্যেক বছর দুর্গাপূজার সময়, রাত্রিতে দেবীর আবির্ভাব হয়···ডাকিনী-যোগিনীদের নিয়ে অভিশাপ দিয়ে ঘুরে বেড়ান··· সঙ্গে তুমুল ঝড়বৃষ্টি শুরু হয়···আর যতক্ষণ না কেউ বজ্রাঘাতে মারা যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত দেবীর রাগ পড়ে না।···'

গজু বলে : 'কিন্তু মহাদেব তো দুর্গাপূজার সময় মারা যায় নি? আর আমার বউ-তো দুর্গাপূজার একমাস আগেই মারা যায়!'

নারাণ পাকা অভিনেতার মতন হঠাৎ গলার স্বর নীচু পর্দায় এনে জবাব দেয় : 'তাঁর লীলার কথা কে বলতে পারে? কখন কার ওপর ভর করবে

কোথায় ভর করবেন, সে তাঁরই ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে। কে বলতে পারে কিসে কি হয়?'

কিন্তু পচু জানে, কিসে কি হয়েছে...অন্তত মহাদেবের ক্ষেত্রে। গোস্বামীর বউ-এর সঙ্গে মহাদেবের যে-ঝগড়া হয়েছিল, পচু নিজের চোখে তা দেখেছে এবং স্বকর্ণে তা শুনেছে।

গোস্বামীর বউ মহাদেবকে ডেকে শুনিয়ে দেয়: 'তোমার ছেলেটা আস্ত চোর...আজ হাতে-নাতে তাকে আমি ধরে ফেলেছি...আমাদের মুরগীর ছানা চুরি ক'রে পালাচ্ছিল!'

এই নিয়ে মহাদেবের সঙ্গে তার তুমুল ঝগড়া বেধে যায়। মহাদেব ছেলেটিকে খুব ভালবাসতো...তার দোষ সম্বন্ধে একেবারে অন্ধ ছিল। তাই গোস্বামিনীর অভিযোগের উত্তরে মহাদেব তাকে অকথ্য ভাষায় গালাগাল দেয়। বলে, তার নাকি একটির জায়গায় একশো-একটি গোস্বামী এবং তার জন্মের ঠিক নেই।

ক্রমশ পত্নীর কাছ থেকে ব্যাপারটা স্বামীর কাছে গিয়ে পৌঁছোয় এবং পত্নীর চারিত্রিক মর্যাদা রক্ষা করবার জন্যে গোস্বামী মহাদেবকে প্রহার করে। গোলমালে সর্দাররা এসে পড়ে এবং দু'জনকেই সাহেবের কাছে ধরে নিয়ে যায়। সাক্ষী-সাবুদ নিয়ে এসে গোস্বামী প্রমাণ ক'রে দেয় যে, তার স্ত্রী যা বলেছে, তা সত্যি এবং সাহেব রায় দেয় যে, মহাদেবকে মুরগীর ছানার দাম গোস্বামীকে দিতে হবে।

মহাদেব সে দাম চুকিয়ে দেয় বটে কিন্তু তার ছেলে যে চোর প্রমাণিত হয়ে গেল, তার পিতৃ-স্নেহ তা সহ্য করতে পারলো না এবং সেই লজ্জায় সে আত্মহত্যা করে।

সুতরাং নারাণের কথায় কোন প্রতিবাদ সে করে না। কুলিদের আড্ডায় এমনি ধরনের নানারকমের কথা সে শোনে। তারা তামাক খায়, হাসে, কাঁদে, আর অনর্গল বকে চলে। শুনতে শুনতে পচুর মন

কেমন যেন ক্লান্ত হয়ে আসে। সমর্থন বা প্রতিবাদ কোন কিছুই সে করে না।

নারাণ শুনতে পায় এমনিধারা, অস্ফুট-কণ্ঠে আপনার মনেই সে বলে ওঠে: 'যে-যার নিজের সুখ-দুঃখ নিয়েই ব্যস্ত। আমার কি জ্বালা, সে শুধু আমিই জানি।'

পাছে নারাণ কিছু মনে করে, সেই জন্যে সে নিজেকে ব্যাখ্যা করবার জন্যে বলে ওঠে: 'অবশ্য এ থেকে মনে ক'রো না ভাই, যে আমি শুধু নিজেকে নিয়েই থাকতে চাই!'

হঠাৎ কানের পাশ দিয়ে একটা মশা সশব্দে চলে যায়। তাকে শেষ করবার জন্যে গজু অন্ধকারে হাত তোলে কিন্তু এক ফাঁক দিয়ে তার হাতের আক্রমণ এড়িয়ে তারই নাকের ডগার ওপর দংশন ক'রে পালিয়ে যায়।

নারাণ বুঝতে পারে, গজু তার কথা বিশ্বাস করছে না। মনে মনে তাতে বিরক্তই হয়, তবে মুখ ফুটে কিছু প্রকাশ করে না। বিচার ক'রে দেখলো একটা সদ্য শোকের দরুন তার মন এখনও ভার হয়ে আছে। সুতরাং আগে যেমন তার গল্প মন দিয়ে শুনতো, এখন যদি তা না শোনে, তা হলে তাকে বিশেষ দোষ দেওয়া চলে না। যতই বকবক করুক না কেন, নারাণের একটা মস্ত বড় গুণ ছিল, অপরের ভাবনা সে ভাবতে জানতো, আর তা ছাড়া তার কথার পেছনে কোন মতলব থাকতো না।

কথার প্রসঙ্গ বদলাবার জন্যে সে জিজ্ঞেস ক'রে ওঠে:

'থাক্‌গে, এবার মাঠে কাজ আরম্ভ করেছ তো?'

গজু বুঝতে পারে তার নিজের দুঃখ কষ্টটাকেই সে হয়ত বড় ক'রে তুলে ধরেছে। সে লজ্জিত হয়। সহজভাবেই তাই উত্তর দিতে চেষ্টা করে: 'শুরু তো করেছি ভাই! তবে ভরসা, বৃষ্টির ওপর। ভরসা করলেই তো বৃষ্টি পড়ে না। ইচ্ছে থাকলেই তো আর রাজা হওয়া যায় না···তাহলে তো কেউ আর গরু চরাতো না, সবাই রাজা হয়ে সিংহাসনে বসে থাকতো।'

এতক্ষণ ধরে তার সম্পর্কেই কথাবার্তা হচ্ছে; গজু বুঝতে পারে, এটা ঠিক হচ্ছে না। তাই সে নিজেই এবার জিজ্ঞেস করে:

'আজ সারাদিন তুমি কি করলে, তাই বল দাদা, শুনি!'

কিঞ্চিৎ ব্যথিত সুরেই নারাণ বলতে শুরু করে: 'সে-কথা আর জিজ্ঞাসা কর কেন ভাই? সেই ভোর ছ'টা না বাজতেই কাজে বেরিয়েছিলাম··· নতুন রাস্তা তৈরি হচ্ছে কি না? দুপুর পর্যন্ত খেটে রোজগার হলো মাত্র চার আনা। তার পর একটু বিশ্রাম ক'রে, আবার কাজ করতে ছুটলাম··· সেই সন্ধ্যে পর্যন্ত···আর চার আনা পাওয়া গেল। সারাদিন খেটে আট আনা মাত্র···তাও একটু জিরবার উপায় নেই···তক্ষুনি সর্দার জরিমানা করবে। তাও যদি নগদ পেতাম তা হলে না হয় একরকম হতো, পাবো সেই মাসকাবারে। তার ওপর গিন্নী এক কাণ্ড ক'রে বসেছেন, সামান্য যা কিছু সংসার খরচের পয়সা পড়েছিল তা দিয়ে দামী একটা জামা কিনে নিয়ে এসেছে। এখন সর্দারের কাছে হাত পাতা ছাড়া উপায় নেই। সর্দারের আবার মন-মেজাজ-ভাল নেই। জামালপুর থেকে যে কুলিটা এসেছে··· সোলেমান গো···সে নাকি ঠাট্টা ক'রে সর্দারের বন্ধু ইব্রাহিমকে কি কড়া কথা দু'একটা বলে···তার জন্যে আজ সর্দার রেগে সোলেমানকে খুব ঠেঙিয়েছে।'

মার-ধোরের কথা শুনেই গজু আপনা থেকে চোখ বুজে ফেলে। ম্যানেজার সাহেবের সেই লাথি, সে আজও ভুলতে পারে নি। তার সমস্ত আত্মমর্যাদাবোধ ধুলোয় লুটিয়ে ধুলো হয়ে গিয়েছে। সে-কথা আর সে মনে আনতে চায় না, কারণ তার দেহের ভেতর যে-রাজপুত রক্ত বইছে, অপমানিত হয়ে অপমানের প্রতিশোধ না নিয়ে সে-রক্ত ঠাণ্ডা হয় না। কিন্তু ঠিক সেই সময় তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু হওয়ার দরুন সে-সম্পর্কে আর কিছুই করতে পারে নি। যদিও সোলেমানকে চেনে না তবুও সে তার জন্যে মনে মনে দুঃখ পায়। সে জানে এই ধরনের প্রহারের মধ্যে যে অপমান থাকে,

আঘাতের ব্যথার চেয়ে শতগুণ বেশী তার জ্বালা। একটা লাথির মধ্যে যে লাঞ্ছনা থাকে, জগতের সমস্ত গালাগাল তার কাছে তুচ্ছ। রোদে-জলে-হিমে তাদের গা পাথরের মত শক্ত হয়ে গিয়েছে। সেই পাথুরে গায়ে লাথিতে হয়ত একটু আঁচড়ও পড়ে না কিন্তু লাথি যে মারলো, তার চোখের সঙ্গে চোখ মিলিয়ে সে আর চাইতে পারবে না, এ অপমানের জ্বালা পাথরেও ফাটল ধরিয়ে দেয়। জিজ্ঞেস করে :

'শুধু পড়ে মারই খেল সোলেমান? দু'ঘা ফিরিয়ে দিতে পারে নি?'

'না, সে কি সম্ভব? এখানে সর্দাররাই হলো সর্বেসর্বা। তাদের কথাই হলো এখানে আইন। দেখো, আমি এখানে বহু বহু বছর ধরে আছি, সেই কবে বিকানীর থেকে এসেছি, আর একবারও ফিরে যাই নি। এইখানেই পড়ে আছি। আমার চোখের সামনে দেখলাম, কত সর্দার খালি হাতে এলো, জায়গা-জমি নিয়ে আসর জমিয়ে বসলো। আর আমি যেমন ছিলাম, ঠিক তেমনি আছি। এক হাতও জমি নেই আমার। আমাদের মাইনে ম্যানেজার সাহেব সর্দারদের হাতেই দেয়, সর্দাররা তাদের খুশি মত আমাদের দেয়। আমি চাইলাম জমি। কিন্তু জোর ক'রে তো তা আদায় করতে পারি না? ম্যানেজার সর্দারকেই দেয় জমি ভাগ ক'রে দিতে, কিন্তু সর্দার দেয় না আমাদের। সর্দার, বাবু, চাপরাসী, চৌকিদার প্রত্যেকেই জমি পায়। বলতে পারো, চৌকিদাররা কিসের জন্যে জমি পাবে? কিসের জন্যে নিয়োগী সর্দারের জমির পর জমি বেড়ে চলেছে? এই রেমিজও পাঁচ একর জমি পেলো, কেন?'

'তা তো জানি না!' গম্ভু বলে।

তার সম্মার্জনী-গুম্ফের বিরাট অন্তরাল থেকে অতি মৃদু কণ্ঠস্বরে বেরিয়ে আসে : 'তার কারণ হলো, আসিস্টান্ট সাহেবের সঙ্গে নিয়োগীর বউ-এর…'

গম্ভু নিজের মনে সচকিত এবং সঙ্কুচিত হয়ে ওঠে। ইদানীং সেও তো পেয়েছে এক টুকরো জমি। নারাণ কি তার ক্ষেত্রেও এই জাতীয় কারণ

থাকার সম্ভাবনা আছে মনে করেছে? নিজের সুন্দরী কন্যা সম্বন্ধে সে সচেতন হয়ে ওঠে।

গজুর মুখের দিকে চেয়ে নারাণ বুঝতে পারে তার মনের অস্বস্তির কথা। তাই তাড়াতাড়ি বলে ওঠে: 'অবশ্য তুমি মনে ক'রো না যে আমি বলছি, যারাই জমি পায়, তারাই এইভাবে সাহেবদের হাত করে, তা নয়। আমার কথা হলো রাজা সাহেবটা ভীষণ বদমায়েস এবং নিয়োগীরও কোন গত্যন্তর ছিল না। যদি সে বাধা দিতো, তাহলে তার সর্বস্ব যেতো, রণবীরের ভাগ্যে যা ঘটেছিল, তারও ভাগ্যে তাই ঘটতো। রণবীর রাঁচী থেকে আসে। সাহেবের নজর তার বউ-এর ওপর পড়তে সে চটে যায়। তার ফলে সাহেব একদিন তাকে বেঁধে চাবুক দিয়ে রীতিমত জর্জরিত করে এবং তাতেও সন্তুষ্ট না হয়ে, একটা মিথ্যে ওজুহাতে তাকে হাজতে আটক ক'রে রাখে এবং সেই সুযোগে তার বউকে ভোগ করে। সে হারামজাদীও বেশ্ মনে দিয়ে মাস কতক বাংলোতেই রইলো। এই সেদিন সাহেব লাথি মেরে বাংলো থেকে তাড়িয়ে দিয়ে আবার লাইনে পাঠিয়ে দিয়েছে।'

গজু বলে: 'কিন্তু রণবীরের বউ-এর দোষ কি বল? তাকে জোর ক'রেই না নষ্ট করেছে?'

নারাণ সে-কথার ঠিক উত্তর দিতে পারে না। কারণ, তার মন তখন অন্যদিকে পড়েছিল। তাই সে শুধু বলে: 'কি বলছো ভায়া? মাগী কত গয়না পেয়েছে জান? গয়না, ভাল ভাল কাপড়, জমি···'

গজু বুঝতে পারে নারাণের কোথায় লাগছে। সে শুধু ছোট্ট ক'রে জবাব দেয়: 'তা হবে!'

নারাণ ব'লে চলে: 'তাই বলছিলাম, অ্যাসিষ্টান্ট সাহেব কি আমাকেও জমি দেবে ভায়া?···কাল তাদের ক্লাবের পোলো মাঠে বিনি পয়সায় আমাকে খেটে দিয়ে আসতে হবে···পাবার মধ্যে হয়ত পাবো, গোটা কতক লাথি! যা তুমি পেয়েছিলে!'

শস্তু বুঝতে পারে, জমির অভাবে নারাণ মনে কি যন্ত্রণা পাচ্ছে। তারও একদিন ঠিক এই রকমই যন্ত্রণা হতো। আজকে সে জমি পেয়েছে বলে নয়, অপমানের যন্ত্রণার চেয়ে তীব্রতর বহু যন্ত্রণা সে পার হয়ে এসেছে, তাই আজ সে ক্ষমাও করতে পারে।

তাছাড়া, জীবন আজ তাকে আঘাত দিয়ে দিয়ে আপস করতে শিখিয়েছে। গ্রীষ্মের সূর্যের তাপে পুড়ে, বর্ষার জলে ভিজে, রুক্ষ মাটির সঙ্গে লড়াই করতে করতে, সংসারের হাজার রকম ঝামেলা, হাজার রকম বোঝা বইতে বইতে, সে আজ জানে ধৈর্য কি, সহনশীলতা কি। কিন্তু হায়, আজ যে অনুপাতে তার বুক শক্ত হয়েছে, সেই অনুপাতে তার মন দুর্বল হয়ে গিয়েছে!

আজ তার অন্তরের ধর্ম হিসাবে সে গ্রহণ করেছে, আঘাত পেলে মুখ বুজে সহ্য ক'রে থাকা, জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে তিক্ততাকে বাদ দিয়ে রাখা, যা-পেলাম-না তা পাবার নয় বলে মন থেকে তাকে ঝেঁটিয়ে ফেলে দেওয়া···এবং ক্ষমা করা···

তাই সে আজ পারে সবাইকে ক্ষমা করতে।

কিন্তু এ ক্ষমা আঘাতকারীর কাছে মাথা নত ক'রে থাকা নয়···তার নিজের ভেতরকার এক অদৃশ্য মহাশক্তির কাছেই নিজেকে নত ক'রে রাখা··· তাকেই সে ভয় করে। এক অনিবার্য মহা-ভবিতব্যতা।

কিন্তু জন্মসূত্রে যে-সব প্রবৃত্তি সে শিরায়-উপশিরায় বহন ক'রে বেড়াচ্ছে সেগুলোকে এইভাবে সংযত ক'রে রাখতে তাকে রীতিমত চেষ্টা করতে হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। তার রাজপুত-ধর্মে অপমানের একমাত্র প্রতিবিধান হলো, হত্যা। তার সমস্ত প্রবৃত্তি সেই দিকেই তাকে আকর্ষণ ক'রে নিয়ে যায়। কিন্তু সে শপথ গ্রহণ করেছে, এভাবে তার প্রবৃত্তিদের সে আর ছেড়ে দেবে না।

বন্ধু-হতে-পারে এমন লোক এই পৃথিবী ভরে আছে। যেদিন সে প্রথম

আসে সেদিন নারাণ তার কাছে ছিল সম্পূর্ণ অপরিচিত। আজ তাকে বন্ধু বলে ডাকতে তার মন অস্বীকার করে না।

ক্ষমা করতে পারলে তবেই মানুষকে স্বীকার করতে পারা যায়। ক্ষমা তো দুর্বলতা নয়। সে শুনেছে, তার দেশের পণ্ডিত লোকদের মুখে, জগতে যারা মহৎ-দায়িত্ব পালন করতে আসে, তাদের ঘৃণাও নেই, আসক্তিও নেই। তারা পারে সহজে ক্ষমা করতে। কিন্তু ক্ষমা করা মানে একথা নয় যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবো না। প্রকৃত ক্ষমা হলো দুরন্ত সংগ্রাম, তার চেয়ে কঠিন সংগ্রাম মাত্র আর একটি আছে, ক্ষমার অন্তর থেকে দম্ভকে দূর করা।

আপনা থেকে তার মুখ দিয়ে উচ্চারিত হয়ে যায় : 'নারাণ ভাই, ক্ষমা করা ছাড়া আমাদের পথ নেই !'

হঠাৎ গঞ্জুর সেই কণ্ঠস্বরে এবং সেই সংক্ষিপ্ত উক্তিতে নারাণ বিস্মিত হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকে। তার মনে হয়, তার কপালের দু'দিকে যেন কে দুটো জ্বলন্ত কয়লা পুরে দিয়েছে।

বাইরে তখন চা-বাগানের সশস্ত্র রক্ষীরা বিউগিল্-এ 'লাস্ট পোস্ট' বাজাচ্ছিল···টু···টু···ধু···ধুটু···টু···

হঠাৎ বাইরে থেকে ভ্রাম্যমাণ চৌকিদারের গলার আওয়াজ আসে : 'কে জাগে ? গঞ্জু···নারাণ···হুঁশিয়ার···যে-যার ঘরে যাও···'

নারাণ উঠে পড়ে।

'যাই ভাই···ঘুমুতে চললুম···এখনি হয়ত চৌকিদার তেড়ে আসবে !'

নারাণ চলে যায়।

॥ চৌদ্দ ॥

রেজী হার্ট বুড়ো টিপুর পিঠে চড়ে ক্লাবের ময়দানে পোলো খেলছে। বিদ্যুৎবেগে ঘোড়া ছুটছে, হাতের লম্বা স্টিক ছোট্ট শাদা বলটাকে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে, রেজী হার্টের মনে হয় জীবনটা সত্যিই সুন্দর…

বিদ্যুৎবেগে টিপু ছুটে চলেছে…বলের সঙ্গে সঙ্গে ছুটে চলেছে মনের উৎসাহে…রেজী হার্টের ধমনীতে নীল রক্ত টগবগ ক'রে ফুটে ওঠে। স্কুলে, স্যাণ্ডহার্স্টের সামরিক কলেজে, ইণ্ডিয়ান আর্মিতে, এই নীল রক্তের গর্বের মর্যাদা সে রেখে এসেছে…আজ পরিণত যৌবনে, সমস্ত বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও সেই নীল রক্তের গর্ব আজও তাকে উল্লসিত করে তোলে। ক্রিকেট হলো কচি মেয়েদের খেলা, মিনিমুখো ছেলেদের জন্যে! ইটনের খেলার মাঠে নাকি ওয়াটারলুর যুদ্ধের মীমাংসা হয়ে গিয়েছিল…এসব কথা কেবল স্কুল-বেকেই মানায়। ক্যাম্বারলীতে হকি খেলা, সে শুধু কাদা ছোঁড়া। আর আর্মিতে আছে বিলিয়ার্ড আর দু'বিঘতের গলফ্…তাও আবার কর্নেলের মেজাজ বুঝে খেলতে হবে। খেলা বলতে আসল খেলা হলো, 'পোলো', বেটা ছেলের খেলা, সাঁচ্চা মরদের খেলা…খেলার রাজা…চা-বাগানের যত সব কুৎসিত আত্ম-নির্যাতনের একমাত্র ক্ষতিপূরণ…

খেলার শেষে ঘর্মাক্ত কলেবরে তাঁবুর কাছে যেতেই খাস-বেয়ারা আফজল তোয়ালে আর জ্যাকেট নিয়ে ছুটে আসে। বেশ পরিবর্তনে প্রভুকে সাহায্য করে।

ক্লাবের খানসামা বিয়ার আর শ্যামপেনের বোতল খুলে ঠিক ক'রে রাখে। আফজল তাড়াতাড়ি শুভ্র-সফেন বিয়ারের টই-টম্বুর টাম্‌ব্‌লার প্রভুর সামনে এনে তুলে ধরে।

ম্যাকেরা এসে যোগদান করে। খেলার শেষের দিকে, বুড়ো টিপুর দরুন রেজীকে রীতিমত অসুবিধায় পড়তে হয়। ম্যাকেরা তাই বলে ওঠে :

'তোমার ঐ ক্লান্ত ঘোড়াটাকে গুলি ক'রে মেরে ফেলা উচিত!'

হিচকক্‌ টিপুর পক্ষ সমর্থন করে। বলে: 'এতক্ষণ ধরে তোমাকে বয়ে বেড়াবার শক্তি আর ওর নেই। তাছাড়া, একটা ঘোড়ায় এতগুলো চক্কর খেলা উচিত নয়, আমাদের প্রত্যেকের অন্তত আর-একটা ক'রে ঘোড়া থাকা দরকার।

খেলার শেষের দিকটায় বেলী যে সুবিধা ক'রে উঠতে পারে নি, সে-কথা স্মরণ করতে তার রীতিমত অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল। চাপা লজ্জায় মুখ-চোখ রাঙিয়ে উঠছিল। বিয়ারের রঙীন জল ভেতরে ছড়িয়ে পড়ায় সঙ্গে সঙ্গে এক বিচিত্র আবেশের সৃষ্টি করে। ক্লান্ত দেহে হাড়গুলো যেন টনটন ক'রে ওঠে। বাষ্পাচ্ছন্ন মস্তিষ্কের উত্তপ্ত উত্তেজনায়, সামনের ঘনায়মান প্রদোষ-অন্ধকারে স্থান-কাল-পাত্রের সীমারেখা ধীরে ধীরে যেন মিলিয়ে মিশিয়ে যায়।

'আফজল, দোসরা গ্লাস···'

'জী, হুজুর!'

সঙ্গে সঙ্গে ট্রে-র ওপর আর-একটি ভর্তি টাম্‌ব্‌লার এগিয়ে দেয়।

তাঁবুর বাইরে গৃহাভিমুখী কুলি-রমণীদের কল-কাকলি তার উদ্‌গ্রীব শ্রবণেন্দ্রিয়ে এসে আঘাত করে। মনের ভেতর কে যেন চুপি চুপি ইশারায় তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে।

অর্ধ-নিমিলিত চোখে এক চুমুকে গেলাসটি শেষ ক'রে ফেলে। ঘাড় থেকে নাকের ডগা পর্যন্ত লাল হয়ে ওঠে। ধীর পদক্ষেপে মোটর সাইকেলের দিকে অগ্রসর হয়।

সেকেণ্ড-গীয়ার লাগিয়ে কয়েক পা সাইকেলের সঙ্গে ছুটে চলে, ক্লাচটা তুলে নিয়ে আসনের ওপর লাফিয়ে গিয়ে বসে। সশব্দে সাইকেল ছুটতে আরম্ভ করে। র‍্যালফ্‌, টুইটি, হিচকক্‌ সমস্বরে বিদায়-অভিবাদন জানায়:

'চেরিও, চেরিও বেলী!'

নরম বাতাস চোখে-মুখে লাগতে প্রসন্ন হয়ে ওঠে শরীর। সেই দ্রুতচারী লৌহ-যানের সংস্পর্শে দেহে শক্তির তড়িৎ-প্রবাহ আবার জেগে ওঠে। সমস্ত

পেশীতে জোয়ারের মত জেগে ওঠে এক উন্মাদ উল্লম্ফনের বাসনা… মনে হয় বিরাট-পক্ষ বিহঙ্গমের মত ঝাঁপিয়ে পড়বে সন্ধ্যার রক্ত-মেঘের বুকে।

ঘণ্টায় ষাট মাইল বেগে কোনরকমে বাড়ীতে গিয়ে পৌছনো…একেবারে শয্যার ওপর…যেখানে অপেক্ষায় আছে নারী…

অধীর চাঞ্চল্য জেগে ওঠে শিরা-উপশিরায়।

দ্রুত চলতে গিয়ে বাধ্য হ'য়ে তাকে বন্ধুর এঁকা-বেঁকা পথের জন্যে মাঝে মাঝে গতি শ্লথ করতে হয়।

কামনার সদ্য-জাগ্রত বীভৎস ক্ষুধায় সামনের আবছা অন্ধকারে আচ্ছন্ন উপত্যকা-ভূমির দিকে হিংস্র দৃষ্টি তুলে চেয়ে দেখে। যদি সেই মুহূর্তে সেখানে কোন নারী তার সামনে এসে পড়তো, নিশ্চয় তাকে সেইখানেই সেই পাহাড়ের গায়ে সে চেপে ধরতো, হিংস্র পশুর মত সেইখানেই তার ঘাড়ে চেপে বসতো। সেই ক্রমবর্ধমান লালসার লেলিহান অগ্নিশিখা স্পন্দমান বেদনার মত তার মস্তিষ্ক ছেয়ে ফেলে। রতিবাসনা যেন মূর্ত রতিক্রিয়া হ'য়ে তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

কুলি-লাইনের পাশ দিয়ে, তীব্র বেগে সে বেরিয়ে পড়ে। সামনের খাড়াই পথটুকু অতিক্রম ক'রে সশব্দে এঞ্জিন বন্ধ ক'রে দেয়।

চোঙার মত দুই হাত মুখের কাছে এনে সে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার ক'রে ওঠে :

'কোই হায়!'

নিয়োগীর স্ত্রী কাছে-ভিতে যেখানেই থাক্, নিশ্চয়ই তার কণ্ঠস্বর শুনতে পাবে।

কিন্তু কোন উত্তর আসে না। কাছেই আকন্দের ঝুঁড়েঘর। সেখান থেকে শুধু কতকগুলো মুরগীর ছানা কলরব করতে করতে নিজেদের মাতৃ-আশ্রয়ের সন্ধানে ছুটে চলে।

এক মুহূর্তের মধ্যে মনে মনে ঠিক ক'রে নেয়, অতঃপর কি করবে। দীর্ঘ পা ফেলে সর্দারদের লাইনের দিকে অগ্রসর হয়। প্রত্যেক পদক্ষেপের সঙ্গে

পেশী-মূলের উত্তাপ বেড়ে ওঠে, সে-উত্তাপের মধ্যে হৃদয় এবং মস্তিষ্ক পলে অবলুপ্ত হ'য়ে যায়। পায়ে একটা পাথরের টুকরো লাগতে, সজোরে তাকে পা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। কয়েক পা অগ্রসর হয়ে আবার চীৎকার ক'রে ডেকে ওঠে :

'কোই হ্যায়!'

কিন্তু কোথাও কোন সাড়াশব্দ নেই।

সামনেই নিয়োগীর স্ত্রীর কুঁড়েঘর। তার থাকবার জন্যে রেডীই এই ঘরটা তাকে ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছে। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে, উৎকর্ণ হয়ে শোনে, ভেতর থেকে কোন শব্দ আসছে কি না। যদি কালকের মতন, আজও আবার দেখতে পায় নিয়োগীকে এখানে, তা হলে লাথি দিয়ে তাকে মেরে ফেলবে আজ! না, নিয়োগীর স্ত্রী শুধু একাই আছে। দরজায় করাঘাত করতেই, দরজা আপনা থেকেই খুলে যায়।

শয্যা থেকে চোখ রগড়াতে রগড়াতে নিয়োগীর স্ত্রী উঠে বসে।

সোজা তার কাছে গিয়ে তার কোমর জড়িয়ে ধরে বলে ওঠে :

'সারাদিন পড়ে পড়ে ঘুমোনো!'

কোন কথা না বলে, সে শুধু চোখ রগড়ায়। ঘুমে চোখের পাতা ভারী হয়ে উঠেছে।

সজোরে তাকে বুকে টেনে নিয়ে জড়িয়ে ধরে।

মাথাটা হেলিয়ে নিয়োগীর স্ত্রী বলে ওঠে :

'আমার নাকচাবি, নাকচাবি কই?'

'টাকা দেবো, কাল কিনে নিস্ নাকচাবি,' রেডী উত্তর দেয়।

সঙ্গে সঙ্গে বিছানার ওপর ঝাঁপিয়ে প'ড়ে দুই বলিষ্ঠ উরুর মধ্যে তার দেহকে নিষ্পেষিত করে—কামনার মৈনাক-চূড়া ঝাঁপিয়ে পড়ে রতি-সমুদ্রে।

'উঃ...'

নিষ্পেষণের যন্ত্রণায় চীৎকার ক'রে ওঠে নিয়োগীর স্ত্রী। অসহায় নিরুপায়তায় সহ্য করতে হয় সেই বর্বরতার অসহ্য দয়াহীন পীড়ন। রেডীর

[illegible] আর নারীর ছিন্ন হয়ে যায়, [illegible] রক্তাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ···অভিঘাতে আহত, বিবশ পড়ে থাকে, প্রস্তরীভূত, স্থির···

সম্ভোগ-অন্তে বেণী শয্যা থেকে উঠে দাঁড়ায়···শার্দূল-ভুক্ত ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত-দেহ মৃত মৃগীর মত পড়ে থাকে নগ্ন-দেহ নারী···

আলুলায়িত কৃষ্ণ-কেশের মধ্যে রক্ত-গোলাপের মত তার সেই পার্বত্য হৈম-শ্রীভরা মুখ আরও রাঙা হয়ে ওঠে, তবে সে-রঙ নিদারুণ লজ্জার। হিমালয় যে শুভ্র শুচিতা দিয়েছিল, বেণী হাপ্টি তার ওপর স্পষ্ট ক'রে টেনে দিয়েছে কলঙ্কের কালো রেখা। যবনে আর উঠবে না সে দাগ।

॥ পনরো ॥

'দুটো পাতা আর একটা কুঁড়ি,
দুটো পাতা আর একটা কুঁড়ি···'

লীলা আপনার মনে গান গেয়ে চলে আর পাতা কেটে কেটে পিঠের ঝুড়িতে ফেলে। চারিদিকে ছেলে, মেয়ে, বুড়ো, বুড়ী সবাই কাজ করছে। তার মধ্যে বাগানের এক কোণে আলাদা একা লীলা কাজ ক'রে চলেছে।

'দুটো পাতা আর একটা কুঁড়ি,
দুটো পাতা আর একটা কুঁড়ি····'

তন্ময় হয়ে সে কাজ ক'রে চলেছে।

কাছেই নিয়োগী তদারক ক'রে বেড়াচ্ছে। তাকে হাত তুলতে দেখলেই লীলার মন ভয়ে কেঁপে ওঠে। মনে হয়, সে হাত যদি তার ঘাড়ের ওপর এসে

পড়ে, সে মরে যাবে। সবুজ সবুজ পাতার মধ্যে, যেদিন প্রথম সে এসে দেখেছিল, মেয়েরা কাজ করছে, গুনগুন ক'রে গাইছে আর পাতা তুলছে, সেদিন তার মনে হয়েছিল, এর চেয়ে সুখের কাজ বুঝি আর কিছু নেই। কিন্তু প্রতিদিনের গতানুগতিকতা আর ক্লান্তির মধ্যে আজ আর তার মনে সেই প্রথম দর্শনের স্মৃতিটুকু পর্যন্ত নেই। মাথার ওপর সূর্য জলন্ত অগ্নিকুণ্ডের মত দেহকে পুড়িয়ে দিয়ে চলেছে। পিঠের ঝুড়িতে ঝুঁকো হয়ে পাতা ফেলতে ফেলতে সর্বাঙ্গ ঘামে ভিজে উঠছে।

তার পাশ দিয়ে যেতে যেতে নিয়োগী হেঁকে ওঠে: 'দেখে কাজ কর! চোখ মেলে কাজ কর! ওজন যার কম হবে, তার আজ কি করবো, তা আমিই জানি। আড্ডা দিয়েছিস কি, পিঠের ওপর এই ছড়ি দিয়ে নক্সা কেটে দেবো ...সাহেবকে বলে মাইনে কাটান্ দেবো!'

কাছেই নারাণের বউ কাজ করছিল। সে চাপা গলায় বলে ওঠে: 'জানতে বাকি নেই কিছু! কারুর ভাগ্যে ছড়ি, আবার কারুর ভাগ্যে সাহেবের বকশিশ!'.

কথাটা কানে যেতেই চামেলী রীতিমত জোর গলাতে, যাতে নিয়োগীও শুনতে পায়, রসান দিয়ে বলে ওঠে: 'যা বলেছিস্ দিদি! টাকার জন্যে যারা ...উকে পর্যন্ত সাহেবদের খাটে তুলে দেয়, তারাই আবার আমাদের কাছে এসে পরতাপ দেখায়!'

বাগানের পাশে পথের ওপর থেকে নারাণের বড় ছেলে বাদু চীৎকার ক'রে ...কে ডাকে: 'মা! ও-মা! ভাই যে কাঁদছে!'

চামেলীর কথায় নারাণের বউকে যা হোক একটা কিছু জবাব দিতে হয়। ...ন্তু নারাণ তাকে বার বার ক'রে সাবধান ক'রে দিয়েছে, যেন চামেলীর সঙ্গে ...ন কোন কথা না বলে, চামেলী নাকি বড় বজ্জাত মেয়ে। তাই তাড়াতাড়ি ...জ শেষ না হতেই সে বাগান থেকে বেরিয়ে পড়ে, ছেলের ডাকে সাড়া ...বার অজুহাতে।

দেহের সংস্পর্শে চেতন থেকে তার নারীত্ব ছিন্ন হয়ে যায়, কামনার নখ-দন্তাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ···অগ্নিস্রাবে আহত, বিবশ পড়ে থাকে, প্রস্তরীভূত, স্থির···

সম্ভোগ-অন্তে রেণী শয্যা থেকে উঠে দাঁড়ায়···শার্দুল-ভুক্ত ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত-দেহ মৃত মৃগীর মত পড়ে থাকে নগ্ন-দেহ নারী···

আলুলায়িত কৃষ্ণ-কেশের মধ্যে রক্ত-গোলাপের মত তার সেই পার্বত্য হৈম-শ্রীভরা মুখ আরও রাঙা হয়ে ওঠে, তবে সে-রঙ নিদারুণ লজ্জার। হিমালয় যে শুভ্র শুচিতা দিয়েছিল, রেণী হার্ট তার ওপর স্পষ্ট ক'রে টেনে দিয়েছে কলঙ্কের কালো রেখা। ঘষলে আর উঠবে না সে দাগ।

॥ পনরো ॥

'দুটো পাতা আর একটা কুঁড়ি,
দুটো পাতা আর একটা কুঁড়ি···'

লীলা আপনার মনে গান গেয়ে চলে আর পাতা কেটে কেটে পিঠের ঝুড়িতে ফেলে। চারিদিকে ছেলে, মেয়ে, বুড়ো, বুড়ী সবাই কাজ করছে। তার মধ্যে বাগানের এক কোণে আলাদা একা লীলা কাজ ক'রে চলেছে।

'দুটো পাতা আর একটা কুঁড়ি,
দুটো পাতা আর একটা কুঁড়ি····'

তন্ময় হয়ে সে কাজ ক'রে চলেছে।

কাছেই নিয়োগী তদারক ক'রে বেড়াচ্ছে। তাকে হাত তুলতে দেখলেই লীলার মন ভয়ে কেঁপে ওঠে। মনে হয়, সে হাত যদি তার ঘাড়ের ওপর এসে

পড়ে, সে মরে যাবে। সবুজ সবুজ পাতার মধ্যে, যেদিন প্রথম সে এসে দেখেছিল, মেয়েরা কাজ করছে, গুনগুন ক'রে গাইছে আর পাতা তুলছে, সেদিন তার মনে হয়েছিল, এর চেয়ে সুখের কাজ বুঝি আর কিছু নেই। কিন্তু প্রতিদিনের গতানুগতিকতা আর ক্লান্তির মধ্যে আজ আর তার মনে সেই প্রথম দর্শনের স্মৃতিটুকু পর্যন্ত নেই। মাথার ওপর সূর্য জলন্ত অগ্নিকুণ্ডের মত দেহকে পুড়িয়ে দিয়ে চলেছে। পিঠের ঝুড়িতে কুঁজো হয়ে পাতা ফেলতে ফেলতে সর্বাঙ্গ ঘামে ভিজে উঠছে।

তার পাশ দিয়ে যেতে যেতে নিয়োগী হেঁকে ওঠে: 'দেখে কাজ কর! চোখ মেলে কাজ কর! ওজন যার কম হবে, তার আজ কি করবো, তা আমিই জানি। আড্ডা দিয়েছিস কি, পিঠের ওপর এই ছড়ি দিয়ে নক্সা কেটে দেবো ···সাহেবকে বলে মাইনে কাটান্ দেবো!'

কাছেই নারাণের বউ কাজ করছিল। সে চাপা গলায় বলে ওঠে: 'জানতে বাকি নেই কিছু! কারুর ভাগ্যে ছড়ি, আবার কারুর ভাগ্যে সাহেবের বকশিশ!'

কথাটা কানে যেতেই চামেলী রীতিমত জোর গলাতে, যাতে নিয়োগীও শুনতে পায়, রসান দিয়ে বলে ওঠে: 'যা বলেছিস্ দিদি! টাকার জন্তে যারা বউকে পর্যন্ত সাহেবদের খাটে তুলে দেয়, তারাই আবার আমাদের কাছে এসে দেবৃত্তাপ দেখায়!'

বাগানের পাশে পথের ওপর থেকে নারাণের বড় ছেলে দামু চীৎকার ক'রে মাকে ডাকে: 'মা! ও-মা! ভাই যে কাঁদছে!'

চামেলীর কথায় নারাণের বউকে যা হোক একটা কিছু জবাব দিতে হয়। কিন্তু নারাণ তাকে বার বার ক'রে সাবধান ক'রে দিয়েছে, যেন চামেলীর সঙ্গে সে কোন কথা না বলে, চামেলী নাকি বড় বজ্জাত মেয়ে। তাই তাড়াতাড়ি কাজ শেষ না হতেই সে বাগান থেকে বেরিয়ে পড়ে, ছেলের ডাকে সাড়া দেবার অজুহাতে।

'শুনেছি, আর চেঁচাতে হবে না, আমার মাথা না খেয়ে কি তোরা ছাড়বি ?' বলতে বলতে নারাণের স্ত্রী পুত্রের দিকে অগ্রসর হয়।

কাজে আসবার সময়, ছেলেপুলেদের দেখাশোনা ক'রে আসতে পারে নি। একপাল ছেলেপুলে, কখনই বা তাদের দেখাশোনা করে ? আপনার মনে কতবার সে ভেবেছে, এমন কি কোন উপায় নেই যাতে ক'রে ছেলে জন্মানো বন্ধ করা যেতে পারে ? সবগুলি তবুও বেঁচে নেই। জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গেই গুটিকতক মারা গিয়েছে। হয়ত যে কোন রাত্তিরে আবার একটা জন্ম নিতে পারে। তবে এখন ছেলেগুলো বড় হচ্ছে, একটা আশা, দু'দিন পরেই তারা আবার পাতা ছিঁড়তে পারবে, সংসারের দু'পয়সা আয় বাড়বে। বানুর অবশ্য পাঁচ বছর বয়স হয়েছে, এরই মধ্যে সে দিনে দশ বার হাত কাজ করতে পারে, আর তাকে বাড়ী রেখে আসতে কোন ভাবনাই হয় না। যেগুলো অবশ্য বুকের দুধ ছাড়া বাঁচতে পারে না, সেগুলোকে সঙ্গে ক'রেই আনতে হয়, বাগানের কাছে পথের ধারে ঝোপেঝাড়ের আশ্রয়ে তাদের ঘুম পাড়িয়ে রাখতে হয়।

এই জন্যেই চা-বাগানের চারিদিকে ধরিত্রী-জননীর বুকের ওপর এইসব স্তন্যপায়ী শিশু-মানুষের দল মুক্ত সূর্যকিরণে দগ্ধ হয়ে পড়ে থাকে। নারাণের স্ত্রীও পথের একপাশে একটা ছেঁড়া কাঁথা পেতে ছেলেকে শুইয়ে রেখে এসেছিল—

সে ছেলের কাছে এসে দেখে, ছেলে গড়িয়ে ধুলোতে চলে গিয়েছে··· ছেলের হাতে-পায়ে জোর হচ্ছে তো! তাড়াতাড়ি ধুলো থেকে ছেলেকে বুকে তুলে নেয়।

এর কয়েক দিন আগে কাজ সেরে ছেলেকে নিতে এসে দেখে, ছেলে গড়িয়ে রাস্তার ধারে নর্দমায় পড়ে গিয়েছে, সেইখানেই কাদায় মুখ গুঁজে পড়ে আছে। তবু তার বরাত ভাল, মরে নি। মহাবালেশ্বর থেকে যে কুলি-কামিনটা এসেছে, তার ছেলেকে সেদিন এমনি শুইয়ে রেখে কাজ করতে

গিয়েছিল, কাজ সেরে ছেলেকে নিতে এসে দেখে, একটা ঢালু জায়গা থেকে ছেলেটা গড়িয়ে পড়ে একেবারে মারা গিয়েছে।

ছেলেকে বুকে তুলে নিয়ে আদর করতে করতে নারাণের স্ত্রী ভাবে, যদি একটা দোলনা তৈরি ক'রে কোন গাছের ছায়ায় ঝুলিয়ে রেখে যেতে পারতো তাহলে খুব ভাল হতো। হঠাৎ সেই তামাটে রঙের ছোট মাংস-পিণ্ডটা বাণীহীন ভাষায় চীৎকার ক'রে উঠলো, তার ক্ষুধা-জ্ঞাপনের সেই হলো ভাষা। বুকের বাম দিকের কাঁচুলি সরিয়ে শিশুর মুখে স্তনাগ্রভাগ তুলে ধরে।

পেছন দিক্ থেকে নিয়োগী চীৎকার ক'রে ওঠে :

'আমি সব দেখছি··· খাতায় আধারোজি ক'রে দেবো···'

ছেলেকে সেখানে শুইয়ে রেখে নারাণের স্ত্রী আবার কাজ করতে বাগানের দিকে অগ্রসর হয়। নিয়োগীর হুমকির উত্তরে তিক্তকণ্ঠেই বলে ওঠে :

'বেশ, যা খুশি তাই করিস!'

চামেলী ব্যাপারটা লক্ষ্য করছিল। বলে উঠলো :

'আজ দেখছি হারামজাদা সপ্তমে চড়েই আছে।'

নিয়োগীর স্ত্রীর প্রতি ঈর্ষা আর সাহেবদের ওপর একটা তীব্র আক্রোশের সঙ্গে সর্দারের ওপর একটা ভীষণ রাগ চামেলীর মনে জমা হয়েছিল। তার সেই অন্তরের জ্বালা নিষ্ক্রমণের যখনই সুযোগ পেতো, তখনই তা গ্রহণ করতে চামেলী একটুকু দেরি করতো না।

তাই সকলকে শুনিয়েই সে বলে : 'আমার কাছে ঢাক-ঢাক গুড়-গুড় নেই। বেজন্মা বেটার ছেলে, বউকে বাঁধা দিয়ে কত টাকা পেয়েছে সে কি আমি জানি না? আর ঐ হারামজাদী মাগী, হাজারটা সোয়ামী চরিয়ে বেড়ায়··· এখানে যখন পরথম আসে, হাতে একটা রুপোর আংটিও ছিল না, এখন দেখ না, এক-গা গয়না ··চোরের মতন চুপটি ক'রে কেমন দাঁড়িয়ে আছে···'

চামেলী নিয়োগীর স্ত্রীকে লক্ষ্য ক'রে শব্দভেদী বাণ ছোঁড়ে।

ঘুম থেকে নিয়োগী হেঁকে ওঠে: 'কাজ কর্ মাগী! পাতার দিকে নজর দে!'

নিয়োগীর বউ ঘাড় হেঁট ক'রে মুখ বুজে কাজ ক'রে চলে।

তার মনের ভেতর তখন শব্দহীন তরঙ্গের পর তরঙ্গ ওঠে আর নামে··· কখনও ভাসিয়ে নিয়ে তাকে সূর্যালোকিত সৌভাগ্যের সুমেরু শিখরে নিয়ে তোলে, কখনও বা টেনে নিয়ে যায় গভীর অন্ধকার খাদে···নিরন্ধ্র তমিস্রার বুকে, যেখানে মিশিয়ে যায় তার বুকের সব দীর্ঘশ্বাস নিঃশব্দে সেই অন্তহীন কুটিল কৃষ্ণ গহ্বরে।

কোনদিক্ থেকে কোন প্রত্যুত্তর আসে না। তাতে চামেলী যেন আরও উত্তেজিত হয়ে ওঠে। বলে: 'ঐ তো···মুখ বুজে দাঁড়িয়ে রয়েছে···বলি মুখে কথা নেই কেন শতেকখোয়ারী সতী-সাবিত্তির? যেমন মাগী, তেমনি তার সোয়ামী। ঐ কুলি-ধাওড়ার নর্দমায় যে সব শূয়োর লোকের গু-মুত খেয়ে বেড়ায়, তারাও ওর চেয়ে ভাল। বলি, বেজন্মা বাপের বেজন্মা মেয়ে, কথা বলে না কেন এখন?'

নিয়োগীর স্ত্রী নিঃশব্দে নাকের ডগা থেকে হাত দিয়ে ঘাম মুছে নিয়ে, হাতটা যন্ত্রচালিতের মত নিজের মুখের ওপর বুলিয়ে চলে···যেন বেগী হাণ্টের কামনা-ঘাতের চিহ্ন সে হাত দিয়ে মুছে ফেলতে চায়। চোখে না দেখলেও, আঙুলের গোড়ায় সেই সব সদ্য ক্ষতচিহ্ন অগ্নি-রেখার মত সে অনুভব করে। একদিন তারও মুখে একটিও লজ্জা-চিহ্ন ছিল না।

নিঃশব্দে সেইভাবে মুখের ওপর নিয়োগীর স্ত্রীকে হাত ঘোরাতে দেখে, চামেলী ধরে নেয় যে, তাকে মন্ত্র পড়ে অভিশাপ দিচ্ছে। তুক করছে। আরও ক্ষিপ্ত হ'য়ে তাই ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে: 'ওঃ, হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আমাকে শাপ দেওয়া হচ্ছে! তবে রে খান্‌কী মাগী···'

দুই হাত বিস্তার ক'রে শকুনির মত চামেলী নিয়োগীর স্ত্রীর ঘাড়ের ওপর গিয়ে পড়ে। চুল ছিঁড়ে, ঘাড় কামড়ে, মুখ আঁচড়ে ক্ষতবিক্ষত ক'রে দেয়।

নিয়োগীর স্ত্রীও তার পাল্টা উত্তর দিতে চেষ্টা করে, কিন্তু সুবিধা ক'রে উঠতে পারে না।

দেখতে দেখতে সমস্ত চা-বাগানের মধ্যে একটা হৈ-চৈ পড়ে যায়। পুরুষেরা চীৎকার ক'রে গালাগালি দিতে আরম্ভ করে, মেয়েরা আর্তনাদ ক'রে ওঠে, ছেলেরা ভয়ে কাঁদতে শুরু ক'রে দেয়।

নিয়োগী ছুটে এসে হাতের ছড়ি দিয়ে চামেলীকে প্রহার করতে শুরু ক'রে দেয়। আঘাতের পর আঘাত ক'রে চলে কিন্তু চামেলী তাতে কাবু হয় না। ঈর্ষার জ্বালায় আজ তার মধ্যে দানবী জেগে উঠেছে, তার পিঠের ওপর ছড়ি ভেঙে গেলেও সে কাতর নয়। দিনের পর দিন যত জ্বালা সে নীরবে সয়েছে, যত পরাজয় আর হতাশা ভেতরে ভেতরে পুষে রাখতে বাধ্য হয়েছে, আজ তারা চরম বিক্রমে একসঙ্গে সব ফুটে উঠেছে, তাকে ভয়ঙ্করী ক'রে তুলেছে।

ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে অসহায়ভাবে লীলা, যেদিকে তার বাবা কাজ করছিল, সেদিকে চেয়ে থাকে। কিন্তু সবুজ গাছের আড়ালে কোন মানুষের মূর্তিই তার চোখে পড়ে না। শুধু চোখের সামনে সাদা আলো বলয়ের মতন কাঁপতে থাকে।

নারাণের স্ত্রী কোলের ছেলেটিকে তাকে ধরতে দিয়ে বাসুকে খুঁজতে তাড়াতাড়ি চলে যায়।

লীলার মনে পড়লো বুড়ুর কথা। চেঁচিয়ে বলে উঠলো: 'আমাদের বুড়ুকে যদি দেখতে পাও, নিয়ে এসো! হায় হায়! সে বেচারা যদি ঐ হাঙ্গামার মধ্যে পড়ে গিয়ে থাকে!'

নিয়োগী বহু কসরত ক'রেও সেই যুধ্যমান নারী দু'টিকে ছাড়াতে পারলো না। তাদের ঘিরে চা-বাগানের সমস্ত কুলি তখন ঝুঁকে পড়েছে। নিষ্ফল রাগে নিয়োগী সেই জনতার ওপরই নির্দয়ভাবে লগুড় চালনা শুরু ক'রে দিল। তাদের শক্ত হাড়ের সঙ্গে বাঁশের সংঘর্ষে যে বিচিত্র শব্দ উঠছিল, তাতে লীলা

আতঙ্কে আতঙ্কিত হয়ে উঠছিল। যদি তার মাথার ওপর ঐ লাঠির একটা আঘাত গিয়ে পড়ে।

নিয়োগী দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে লাঠি ঘোরাতে আরম্ভ করে।

'এত্ত বড় স্পর্ধা! ব্যাটার ছেলেরা, আমাকে তোয়াক্কা করে না। যত সব শূয়োরের বাচ্চা!'

চারিদিকে সেই কোলাহল আর ক্রন্দনের মধ্যে, নিয়োগীর বিপুলায়তন দেহই সকলকেই ছাপিয়ে চোখে পড়ে। দুর্বিনীত কুলিদের সায়েস্তা করবার জন্যে লাঠি হাতে মত্ত ষাঁড়ের মত যাকে সামনে পায় তাকেই তাড়া করে।

নারাণের শিশু-পুত্রকে কোলে নিয়ে লীলা ছুটতে আরম্ভ করে, কিন্তু হঠাৎ গুলির আওয়াজে ভয়ে তার পা অচল হয়ে যায়। পেছন ফিরে চেয়ে দেখতে গিয়ে, পা কেঁপে সেইখানেই হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায়। কোনরকমে হাত দিয়ে ছোট ছেলেটির মাথা জড়িয়ে ধরেছিল তাই, নইলে তার মাথা কেটে চৌচির হয়ে যেতো।

সেই অবস্থায় চোখ চেয়ে দেখে, তার দশ গজের মধ্যে দিয়ে একটা ঘোড়া বেগে ছুটে চলে গেল···সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জায়গাটা ধুলোয় ভরে উঠলো। ঘাড় তুলে কান খাড়া ক'রে শোনে, রাজা সাহেবের গলার আওয়াজ···ক্রুদ্ধ কণ্ঠে কি বলছে তা সে বুঝতে পারে না।

কোনরকমে সাহসে ভর ক'রে উঠে দাঁড়ায়। একটা গাছের আড়ালে গিয়ে চারিদিকে চেয়ে দেখে। দেখে, নিয়োগীর হাতের লাঠি থেমেছে বটে কিন্তু সাহেব ঘোড়ার ওপর চড়ে জোরে হুইসিল দিচ্ছে আর চারিদিক্ থেকে অন্য সব কুলি ছুটে সেইদিকে আসছে।

ঘাড় নীচু ক'রে হাঁটতে হাঁটতে সামনের একটা নালায় নেমে পড়ে। নালা দিয়ে সরু একফালি জল নীচের দিকে ছুটে চলেছে। আঁচলা ভরে জল নিয়ে ছেলেটার মুখে ধরে এবং নিজেও পান করে। চারিদিকে নিঃসাড়,

চুপচাপ্। শুধু তার নিজের বুকের ভেতর থেকে ধুপধাপ্ শব্দ উঠছে—আর বুকটা কাঁপছে বুদ্ধুর পাঁজরার বন্ধন।

হঠাৎ পেছন থেকে চাপা গলায় নারাণের স্ত্রীর কণ্ঠস্বর শুনতে পেলো :

'আরে, এই যে, লীলা!' তাড়াতাড়ি লীলা তার কাছে ছুটে যায়।

নারাণের স্ত্রীর বলে : 'চল, ঝোপের আড়ালে দু'জনে নীচে নেমে যাই, সেখানে ঝুলন-সাঁকো পেরিয়ে কুলি-লাইনে গিয়ে উঠবো।'

সভয়ে দু'জনে এগিয়ে চলে। কিন্তু বুদ্ধু বিপত্তি করলো। কিছুতেই যাবে না। বাদুও কান্না জুড়ে দিল।

এমন সময় পিছন দিক্ থেকে একজন চৌকিদার হঠাৎ তাদের সামনে এসে লাঠি তুলে রুখে দাঁড়াল : 'লুকিয়ে পালানো হচ্ছে? চল্ সাহেবের কাছে, সবাইকে ধরে নিয়ে যাবার হুকুম হয়েছে···চল্, হাঙ্গামা করার মজা টের পাবি···চল্···'

বাধ্য হয়ে কাঁপতে কাঁপতে তারা এগিয়ে চলে। পেছনে চলে লাঠি হাতে চৌকিদার।

ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেখে, তখনও পর্যন্ত তেমনি হৈ-চৈ চলছে। চারদিক্ থেকে চেঁচামেচি, কান্না আর চীৎকার, গালাগালি আর আর্তনাদ উঠছে। পাগলের মত লোকে ছুটোছুটি করছে, উঠছে, বসছে, মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে, হাতজোড় ক'রে ক্ষমা চাইছে। আর সেই বিভ্রান্ত জনতার মধ্যে রাজা সাহেব ঘোড়ার ওপর সওয়ার হয়ে ভাঙা হিন্দুস্থানীতে গলা ফাটিয়ে চীৎকার করছে :

'হুঁশ কারো···হুঁশ কারো···কুত্তাকে বাচ্চা···'

কিন্তু জনতা তাতেও শান্ত হয় না। উন্মাদের মত তারা তেমনি হাত-পা ছুঁড়তে থাকে, তেমনি চীৎকার ক'রে ওঠে। কেউ বা হাত জোড় করে, কেউ বা আস্ফালন ক'রে ওঠে।

রেগী গর্জন ক'রে উঠলো : 'গুলি ক'রে সবাইকে মেরে ফেলবো! হুঁশিয়ার!'

গুলির কথাতে হঠাৎ সবাই চুপ হয়ে গেল। কারুর কারুর মনে হলো যেন তাদের পা হঠাৎ কাঠের হয়ে গিয়েছে।

রাগে রেণীর কণ্ঠস্বর কেঁপে ওঠে :

'আমাদের লোক এত ক'রে তোদের ভালো করবার চেষ্টা করছে…তার এই ফল? কিছুতেই কি তোদের এই ঝগড়া-করার অভ্যাস তোরা ছাড়তে পারিস্ না, ব্লাডি ফুলের দল ? ভদ্র ব্যবহার কিছুতেই শিখবি না ?'

রেণীর থামবার ইচ্ছা ছিল না…কিন্তু তার নিজের কাছেই কথাগুলো ফাঁপা মনে হতে লাগলো।

ভিড়ের পেছন থেকে একজন সাহস ক'রে বলে উঠলো : 'কি করবো সাহেব ? আমাদের মা-বোন, বউ-ঝির ইজ্জত এখানে আর থাকে না…'

রেণী ভ্রূকুটি ক'রে বলে উঠলো : 'কি বলছে লোকটা ? কে ও ? ব্যাটাকে অফিসে ধরে নিয়ে আসবি নিয়োগী, তার পর আমি দেখে নেবো !'

তার পর সর্দারদের দিকে চেয়ে হুকুম করে :

'ভিড় ভেঙে দে…যে যার কাজে এখুনি গিয়ে যেন লাগে…কেউ যদি একটা বাজে কথা বলেছে, কি হাত তুলেছে, অমনি গুলি ক'রে তাকে মেরে ফেলবি !'

চোখ দিয়ে যেন তার আগুন ঠিকরে পড়ে। বদ্ধ-দৃষ্টিতে জনতার দিকে চেয়ে থাকে।

'একটা টুঁ শব্দ করেছিস্ কি গুলি ছুঁড়েছি। চারদিকে ক্রুদ্ধ-দৃষ্টি মেলে একবার চেয়ে নিয়ে ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরে। টিপুর পাজরে লৌহ অঙ্কুশের আঘাত পড়তেই, সে নড়ে ওঠে। রেণী ঘাড় সোজা ক'রে বিজয়ী সেনাপতির মত অফিসের দিকে অগ্রসর হয়।

ভীত, সন্ত্রস্ত কুলির দল অস্পষ্ট চাপা-গলায় নিজেদের মধ্যে প্রতিবাদ ক'রে ওঠে। ভিড়ের পেছন দিকে যারা ছিল, তাদের মধ্যে যাদের বুকের পাটা বেশী, তারা ঠেলে সামনের দিকে এসে জোর গলায় প্রতিবাদ জানাবার চেষ্টা করে।

হঠাৎ সেই চীৎকারে রেণী ঘোড়া থামিয়ে ঘুরে দাঁড়ায় এবং একবার ভাল ক'রে তাদের দেখে নিয়ে তাদের ওপরে ঘোড়া ছুটিয়ে দেয়।

॥ ষোল ॥

বেণীর সেই ক্রূর অত্যাচারে হতভাগ্য অসহায় কুলির দল অন্তর্নিরুদ্ধ আবেগে ক্রন্দন ক'রে ওঠে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খাওয়া ছাড়া আর কি করতে পারে, তা তারা ভেবে ঠিক করতে পারে না। বেণীর মূর্তি দৃষ্টির বাইরে চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, ভিড়ের পেছনে যারা পড়ে ছিল তাদের মধ্যে কেউ কেউ এগিয়ে এসে সর্দারের সামনে রুখে দাঁড়ায়।

কিন্তু সর্দারের লাঠির সামনে বেশীক্ষণ তারা দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। পাছে সেই গণ্ডগোলে সাহেব আবার ফিরে এসে গুলি চালায় এই

ভয়ে অধিকাংশ কুলিই ছত্রভঙ্গ হয়ে যে যার পথ ধরলো···যারা আহত হয়ে নড়তে পারলো না তারা সেইখানেই পড়ে রইলো।

আহত-অঙ্গে বাড়ী ফিরতে ফিরতে কেউ বলে ওঠে: 'রাম রাম,' কেউ বা বলে: 'ইয়া আল্লাহ্!' কেউ বা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে: 'কলি, ঘোর কলি··· পৃথিবীর আয়ু শেষ হয়ে এসেছে।'

হয়ত তাদের দেহের ভেতর ভগবান যে-সব অস্থি দিয়েছিল সে-গুলো কাঠের তৈরী। তবুও সেই কাঠের ওপর যে প্রবল আঘাত এসে পড়লো তার বেদনার চেয়ে বড় হয়ে উঠলো, তাদের নিদারুণ অসহায়তার কথা। গাড়োয়ানের চাবুকের আঘাতে জর্জরিত হয়ে ভারবাহী বলদ যখন কেঁপে কেঁপে ওঠে, তখন এমনি অসহায়তার নিদারুণ ভবিতব্যতাই হয়ত তার মূক চেতনায় স্পন্দিত হতে থাকে।

লগুড় হস্তে সর্দারদের ছায়ামূর্তি তাদের মনের ভেতর যেন দাগ কেটে বসে যায়। কোন কিছু ভাবতে গেলেই চোখ আপনা থেকে সেই ছায়ামূর্তির ওপর গিয়ে পড়ে। তাই ফেরবার পথে মুখ ফুটে তারা কিছু বলতে পারে না, শুধু চোখে চোখ পড়তে, চোখের ইশারায় মনের কথা জানায়, অঙ্গ-ভঙ্গী ক'রে হাত তুলে হাতের মুদ্রায় মনের সংগোপন বাসনাকে রূপ দিতে চেষ্টা করে, কচিৎ কখনো কারুর মুখ থেকে দু'একটা অক্ষর দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ে।

গজুই প্রথম কথা বলে: 'ভাই সব, চল হাসপাতালে গিয়ে ডাক্তার সাহেবকে সব কথা জানিয়ে আসি!'

একজন ভুটিয়া কুলি তাকে সমর্থন ক'রে ওঠে: 'ঠিক বলেছ দাদা, অন্তত যাদের চোট লেগেছে তাদের একটা ব্যবস্থা করা দরকার। কে কে জখম হলো তা জানা দরকার!'

গোরখপুরের একজন কুলি বলে উঠলো: 'আমার মনে হচ্ছে একজন মারা গিয়েছে। মাথার উপর যদি কেউ থাকেন, তবে এর জবাবদিহি একদিন না একদিন তাঁর কাছে দিতেই হবে!'

পেছন থেকে একজন সর্দার হেঁকে উঠলো : 'মুখ বুজে যে যার কাজে যা !'

গোরখপুরী কুলিটা থেমে ঘাড় ফিরিয়ে দেখে। দেখে, পেছনেই সর্দার এসে পড়েছে। নিজের সাহসে সে নিজেই বিস্মিত হয়ে ওঠে।

তার ঘাড় ধরে টেনে আনতে আনতে নারাণ বলে : 'যে মরলো, তাকে মরতে দাও ভাই ! গঙ্গু যা বললে, চল তাই করি, ডাক্তার সাহেবের কাছে যাই !'

গঙ্গু সাড়া দেয় : 'হাঁ, যাবো…নিশ্চয়ই যাবো। একটা যা হোক্ বিহিত কিছু করতেই হবে ! এমনি মুখ বুজে মার খাওয়া আর চলবে না !'

বহুদিনের বহু বেদনা মুখ বুজে নীরবে সহ্য ক'রে আসবার দরুন ভেতর থেকে সে ভাগ্যবাদী হয়ে উঠেছিল। কিন্তু আজ এই নিদারুণ অত্যাচারের প্রত্যক্ষ উত্তেজনায় তার ভেতরকার সেই বহুদিনের অসহায় আত্মসমর্পণের ভাব যেন নিমেষের জন্যে মন থেকে মুছে যায়, তার জায়গায় আঘাতের পরিবর্তে আঘাত করবার এক নরঘাতন উন্মাদনা সহসা মাথা তুলে জেগে ওঠে।

চারদিক্ থেকে কলরব ওঠে : 'চলো ! চলো !' একটা কিছু-করার এই প্রত্যক্ষ ইঙ্গিতের জন্য তারা এতদিন অপেক্ষা ক'রে ছিল। 'চলো',—এই একটা কথার মধ্যে তাদের অন্তরের সেই পুঞ্জীভূত বেদনা, এতদিন পরে যেন আত্ম-প্রকাশের পথ পেলো।

গোরখপুরী চীৎকার ক'রে উঠলো : 'দিলওয়ার সাহেব জিন্দাবাদ !'

সঙ্গে সঙ্গে শত কণ্ঠের সেই শ্লোগান চারদিকের সেই ঘন-সবুজের অরণ্য ছেয়ে, বাতাসে জাগিয়ে তুললো অনুরণন। তার তরঙ্গ গিয়ে লাগলো পর্বত-শৃঙ্গে…যেখানে ছিল তাদের লক্ষ্য, হাসপাতাল।

ডা হাভর তখন ডিস্‌পেন্‌সারীতে একটা স্লাইড এক মনে পরীক্ষা ক'রে দেখছিল। সেই শব্দ-তরঙ্গ তার কানে এসে লাগতেই ঘাড় তুলে জানলার বাইরে চেয়ে দেখে। দেখে, পঙ্গপালের মত কুলির দল উপত্যকা বেয়ে সেই

দিকে উঠে আসছে। বিস্ময়ে আসন থেকে উঠে পড়ে। ছুটে বারাণ্ডায় বেরিয়ে আসে।

কুলিদের যে দলটা আগিয়ে এসেছিল, তারা রাস্তার ওপর থেকে ছ লা হাভরকে দেখতে পেয়েই চীৎকার ক'রে উঠলো : 'দিলওয়ার সাহেব জিন্দাবাদ !'

সঙ্গে সঙ্গে পেছনে যারা আসছিল, তারাও একসঙ্গে চীৎকার ক'রে উঠলো এবং দ্রুত পা চালিয়ে হাসপাতালের সামনে এসে হাজির হলো।

এই সব নিরীহ, নির্বিরোধ, মেরুদণ্ডহীন কুলি একমাত্র হোলির দিন ছাড়া আর কোনদিন যাদের গলার আওয়াজ পাওয়া যায় না, যাদের মুখের দিকে চাইলেই নজরে পড়ে মূক-মূর্খতার বদ্ধ-মুখোশ, মানুষ বা পশু বা মহামারীর আক্রমণে, এমন কি ক্ষুধার তাড়নায় যাদের স্বভাবত নতশির কোনদিন উঁচু হয়ে উঠতে জানে না, আজ তারাই ঘাড় তুলে, মেরুদণ্ড সোজা ক'রে, চীৎকার করতে করতে এগিয়ে আসছে, এ-দৃশ্য দেখেও ছ লা হাভরের সত্য বলে বিশ্বাস করতে মন চাইছিল না। নিশ্চয়ই ভয়ঙ্কর এমন কিছু ঘটেছে, যার ধাক্কায় তাদের বহুদিনের অভ্যাসগত দীনতা আজ অপসারিত হয়ে গিয়েছে। ইচ্ছা করছিল, এই মুহূর্তে ছুটে তাদের মধ্যে সে চলে যায়। কিন্তু সেই উত্তেজিত জনতার দিকে চেয়ে, সে নিজেকে সংযত ক'রে নেয়···যা আসছে, তার জন্যে ধীরভাবে সেইখানে অপেক্ষা ক'রে থাকাই শ্রেয়।

তার বহুদিনের কল্পনার ছবি, আজ তার চোখের সামনে সত্য হয়ে ফুটে উঠেছে। সেই কল্পনার স্বচ্ছ তরঙ্গ মস্তিষ্কে এসে আঘাত করে। দুলে ওঠে সব চেতনা। আপনার মনে বলে ওঠে : 'মাটির পোকা, সেও তাহলে পাশ ফেরে···' কিন্তু এক অজানা আতঙ্কে সে শিউরে ওঠে। সূর্যের মত স্থির হয়ে সে দাঁড়িয়ে থাকে, তারই শুভ্র আলোর তরঙ্গে যেন কেঁপে ওঠে তার চেতনা, যেন দূর থেকে ঝড়ো হাওয়ার সওয়ার হয়ে আসছে সর্বনাশা উন্মাদনার ঢেউ··· সে ঢেউ-এর স্পর্শে দুলে উঠছে সামনের ঐ রোদে-পোড়া তামাটে কুলির দল···তারই ধাক্কায় তারা বজ্রমুষ্টি তুলছে আকাশের দিকে···মাটিকে টলিয়ে

মাটিতে ফেলছে পা। তবু মনে হয়, তাদের সামনে গিয়ে, তাদের অভ্যর্থনা করবার মত শক্তি বুঝি তার নেই। ভেতর থেকে এক অনির্দিষ্ট শক্তির জোয়ার তার চোখ-মুখ ছেয়ে ফেলে। কিন্তু তবুও সে ভুলতে পারে না নিজেকে। যেমন দাঁড়িয়ে ছিল তেমনি দাঁড়িয়ে থাকে, উদ্‌গ্রীব কিন্তু অসাড়। জন কয়েক কুলি তখন হাত জোড় ক'রে নত-দেহে এগিয়ে এসে, তার সামনে সটান মাটিতে শুয়ে পড়ে।

নিজের কল্পনার সঙ্গে সামনের সেই দীনতাকে সামঞ্জস্য করতে গিয়ে, আপনা থেকে সে হেসে ওঠে।

হাসি সংবরণ করার ব্যর্থ চেষ্টায় সে গম্ভীর কঠোর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে: 'কি ব্যাপার? কি হয়েছে?'

অপমানের রুদ্ধ-জ্বালায় ফুলতে ফুলতে তারা শুধু বলে ওঠে: 'হুজুর···হুজুর' ···তার পর, চুপচাপ্।

সেই নীরবতায় বিরক্ত ও বিব্রত হয়ে ওঠে হু লা হাভর। আবার জিজ্ঞেস করে: 'কি ব্যাপার? কি হয়েছে?'

কিন্তু কোন সাড়াশব্দ নেই। সামনে শুধু দাঁড়িয়ে হাত কচলায় আর এ-ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে।

হঠাৎ সেই ভিড়ের মধ্যে গঙ্গুকে দেখতে পেয়ে হু লা হাভর একটু নরম গলায় তাকেই জিজ্ঞেস করে: 'কি হয়েছে গঙ্গু? এদিকে উঠে এসো···বল, কি হয়েছে?'

হাত জোড় ক'রে গঙ্গু বলে: 'হুজুর···'

কিন্তু আর কোন কথা বলতে পারে না। অপমানে, বেদনায় শুধু ঠোঁট কাঁপতে থাকে।

সেই সুযোগে নারাণ তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বলতে আরম্ভ করে: 'হুজুর, চামেলী বলে যে কুলি-কামিনটা রাজ: সাহেবের বাংলোতে এক সময় থাকতো, তার সঙ্গে নিয়োগীর বউ-এর ঝগড়া বাধে। নিয়োগীর বউ এখন রাজা

[illegible] থাকে। আমরা যখন সেই ছুটো বদমাস মাঝিকে ছাড়াতে যাই, সেই সময় নিয়োগী সর্দার এসে আমাদের মারতে আরম্ভ করে। দেখতে দেখতে গণ্ডগোলে অন্য সব বাগান থেকে কুলিরাও ছুটে এলো, সর্দাররাও যে-যেখানে ছিল লাঠি হাতে সবাই এসে জুটলো। আর বেপরোয়া আমাদের ওপর লাঠি চালাতে শুরু ক'রে দিল। সেই সময় লাফ্‌টার্ট সাহেব ঘোড়ায় চড়ে এসে আমাদের ওপর দিয়ে ঘোড়া চালিয়ে দিল। আপনি হুজুর, দেখলেই বুঝতে পারবেন, আমাদের গায়ে তার দাগ রয়ে গিয়েছে। একজন তো মারাই গেল···আর কত লোক যে জখম হয়েছে, তার ঠিক নেই।'

স্থ লা হাভরের মনে এক নিদারুণ বিক্ষোভ জেগে ওঠে···সে শুধু শুনতে পারে, প্রতিকারের উপায় তো তার হাতে নেই। নিরুপায় অসহায়তার চরম তিক্ততায় ভরে ওঠে মন। পাথরের মত সোজা দাঁড়িয়ে থাকে। নীচের বারাণ্ডায় সমবেত জনতার মধ্যে বিভিন্ন কণ্ঠে অস্পষ্ট কলরব উঠতে থাকে।

নিজের অসামর্থ্যে চঞ্চল এবং বিব্রত হ'য়ে স্থ লা হাভর হঠাৎ চেঁচিয়ে বলে ওঠে: 'বড় সাহেবের কাছে গিয়ে রিপোর্ট কর!'

কিন্তু পরক্ষণেই যেন আপনার মনে আপনি বলে ওঠে: 'অবশ্য, তাতে কোন ফল হবে না। তোমরা চাও তোমাদের রাজত্ব হবে···মজুর-কৃষাণ-রাজ! তবে কেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু মার খেলে তাদের কাছ থেকে? কেন তোমরা সবাই মিলে তাদের মেরে তাড়াতে পারলে না?'

কুটিয়া কুলিটা এগিয়ে এসে উত্তর দেয়: 'আমরা কি করতে পারি, হুজুর! আপনিই আমাদের মা-বাপ হুজুর!'

ক্রুদ্ধ কণ্ঠে স্থ লা হাভর গর্জন ক'রে ওঠে: 'না, না, আমি তোমাদের মা-বাপ নই! আমিও তোমাদের মতন মালিকদের মাইনে-করা চাকর। তফাত শুধু তাদের মতন আমিও সাহেব বলে, তোমাদের ওপর যে অত্যাচার করে আমার ওপর তা পারে না। আজ তোমাদের যেমনভাবে এরা মারছে

বিলেতে ওদের নিজের দেশে, তোমাদের মত যারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজগার করে, তাদেরকেও ওরা এইরকমভাবে মারে?'

হঠাৎ তার মনের একান্ত সংগোপন-কথা এইভাবে ওদের সামনে বলে ফেলে, বিব্রত হয়ে ওঠে। সে যে স্বতন্ত্র, তার পথ আলাদা। তবু যেন তার ভেতর থেকে তাকে ওদের মধ্যেই টেনে নিয়ে যেতে চায়।

দ্য লা হাভরের কথায় বিস্মিত হয়ে গোরখপুরী জিজ্ঞেস করে: 'তারাও তো সাহেব, তবু তাদের মারে?'

স্থির কণ্ঠে দ্য লা হাভর উত্তর দেয়: 'হাঁ!' কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে নিজের মনেই আবার বলে ওঠে: 'কোন তফাত নেই, এখানে আর সেখানে!'

মজ্জাগত দীনতায় হাত জোড় ক'রে নারাণ বলে: 'হুজুর, সে-সব কথা আমরা জানি না। আমরা জানি, আপনিই আমাদের মা-বাপ। আমাদের হয়ে সর্দারদের এই অত্যাচার সম্বন্ধে আপনিই ম্যানেজার সাহেবকে দু'চার কথা বলুন, আর দেখবেন হুজুর, রাজা সাহেবের কোপ থেকে যেন আমরা রক্ষা পাই!'

'বেশ, তাহলে তোমরাও আমার সঙ্গে এসো, সকলে মিলে বড় সাহেবের কাছে যাই।'—দ্য লা হাভর প্রস্তাব করে।

হঠাৎ একটা মথিত আর্তনাদের শব্দ ডাক্তারের কানে এসে লাগতেই, ঘাড় তুলে দেখে, সামনে রাস্তা দিয়ে একদল লোক হাঁফাতে হাঁফাতে আসছে, দাঙ্গায় আহত কুলিদের পিঠে ক'রে নিয়ে।

সামনের জনতা আতঙ্কে শিউরে ওঠে। দ্য লা হাভর হঠাৎ দোটানার মধ্যে পড়ে যায়, যারা বেঁচে আছে তাদের নিয়ে বড় সাহেবের কাছে যাবে, না, যারা মরছে তাদের আগে বাঁচিয়ে তুলতে পারে কিনা দেখবে। সেই দোটানার মধ্যে অচল অনড় শুধু দাঁড়িয়ে থাকে। সেই আহত মুমূর্ষু লোকদের আর্তনাদে সমস্ত চা-বাগানের বেদনার ইতিহাস যেন পাথরের পাঁচিলের মত তার দৃষ্টির সামনে খাড়া হয়ে ওঠে···হায়! সে চলেছে মাথা ঠুকে সেই পাঁচিলকে ভেঙে ফেলতে! তার চোখের সামনে বিস্তৃত সেই শ্যাম-উপত্যকার

মর্মবেদনা, সেই উপত্যকার বাইরে সমগ্র দেশের, সমগ্র লোকের বেদনা মনে হয় এক দুর্ভেদ্য মেঘচুম্বী পর্বতের মত তার পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে।

তবুও বলে ওঠে : 'গজু, ভেঙে পড়লে চলবে না···সাহসে বুক বাঁধ···সকলে মিলে একজোট হয়ে বড় সাহেবের কাছে যা ঘটেছে সব কথা তাঁকে সাহস ক'রে খুলে বল। এবং সেই সঙ্গে স্পষ্ট ক'রে জানিয়ে দিয়ে এস, যতক্ষণ এর সুবিচার না হচ্ছে, ততক্ষণ তোমরা কেউ আর কাজে যাবে না। আর বলবে, আমি তোমাদের পাঠিয়ে দিয়েছি। পরে আমি তাঁর সঙ্গে কথা বলবো।'

হাত জোড় ক'রে কুলিরা যাবার জন্যে উঠে দাঁড়ায়।

'দেরি নয়···যাও,' ডা হাভর উৎসাহ দেয়।

উত্তেজিত কণ্ঠে গোরখপুরী চীৎকার ক'রে ওঠে : 'দিলওয়ার সাহেব কী জয়!'

সঙ্গে জনতা প্রতিধ্বনি তোলে : 'দিলওয়ার সাহেব কী জয়!'

গজু এগিয়ে চলে, 'এসো ভাই সব! চল···চল এগিয়ে!'

গোরখপুরী হেঁকে সবাইকে ডাক দেয়···

প্রস্তর মূর্তির মত দাঁড়িয়ে ডা হাভর ভাবে, সে কি করতে পারে আর! আপাতত তাকে ছুরি ধরতে হবে···আহতদের সেবার জন্যে। কিন্তু তার বেশী আর কিছু কি তার মনের অনুভূতিতে নেই? প্রাণপণ চেষ্টা করে, মনের মধ্যে জাগিয়ে তুলতে, একটু করুণা, একটু সমবেদনা, একটু কোমলতা। কিন্তু ভেতর দিকে চেয়ে মনে হয়, তার শরীরের সব রক্ত যেন শুকিয়ে শূন্য হয়ে গিয়েছে। শূন্য বদ্ধদৃষ্টিতে শুধু সামনের দিকে চেয়ে থাকে, যেন সুদূর, নিস্পৃহ, উদাসীন, স্বতন্ত্র।

আহত লোকদের ব্যবস্থা করতে ডিসপেনসারী ঘরে গিয়ে ডা হাভর দেখে, ঘরের এককোণে তিনজন কুলি আহত রক্তাক্ত-দেহে একসঙ্গে জড়াজড়ি ক'রে একটা মাংসপিণ্ডের মত পড়ে আছে।

তাদের নিষ্প্রভ ভীত চোখের দিকে চেয়ে তার মনে হলো, তার নিজের মেরুদণ্ড বেয়ে যেন একটা হিমানী-স্রোত বয়ে যাচ্ছে।

রাস্তায় বেরিয়ে কুলিরা সন্তর্পণে ম্যানেজারের অফিসের দিকে এগিয়ে চলে।

সূর্যের আলো ঘর্মাক্ত কালো দেহের ওপর এসে যেন পিছলে পড়ে। দু'ধারে ঘন-সবুজের মধ্যে ধূলিময় পথ বেয়ে তারা সার বেঁধে চলে, পিঁপড়ের মত। সামনে সুবিস্তীর্ণ উপত্যকা-ভূমি পিছনে পর্বত আর অরণ্যের ছায়া। প্রত্যেক পদক্ষেপের সঙ্গে ভয়ে তাদের বুক কেঁপে ওঠে। মুখ বুজে এ-ওর মুখের দিকে চায়, প্রত্যেকের চোখের দৃষ্টি থেকে প্রত্যেকে সাহস সংগ্রহ করতে চেষ্টা করে।

হঠাৎ গন্থু বলে ওঠে : 'ভয়ে আমার বুকটা কাঁপছে, ভাই! বড় সাহেব আবার না আমাকে মারে!'

নিদারুণ দুর্দিনে বড় সাহেবের কাছ-থেকে-পাওয়া সেই লাথি তার মনে গভীর ছাপ রেখে গিয়েছিল।

'ভয় কি, আমরা তো আছি!' গোরখপুরী আশ্বাস দেয়।

কিন্তু গন্থু যতই এগিয়ে চলে, ততই তার হাড়ের ভেতর যেন কাঁপন ধরে। কিছুতেই সে-কাঁপন রোধ করতে পারে না। সামনের লতাগুল্ম থেকে দৃষ্টি তুলে দূর পর্বতের ঘন বৃক্ষ-শ্রেণীর দিকে নিবদ্ধ করে, যেন যে মহা-দুর্দৈবের দিকে এগিয়ে চলেছে, তার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে ঊর্ধ্বলোকে কোন নিরাপদ শক্তির আশ্রয় খুঁজছে। কিন্তু সে জানে যে-নিশ্চিন্ত নির্ভরতার জন্যে সে ঊর্ধ্বলোকে চেয়ে আছে, সে-নির্ভরতার একমাত্র জন্মভূমি হলো, তার নিজেরই অন্তর, কিন্তু সে-অন্তর তখন ক্ষুধায় আর তৃষ্ণায় আর অপমানের শতেক জ্বালায় নিজেই জর্জরিত অসহায়। তবু এগিয়ে চলতে হয় সকলের সঙ্গে। ভয়ে আর ভাবনায় দুলতে দুলতে ক্রমশ তার চেতনা যেন লুপ্ত হয়ে আসে। সর্ব-অঙ্গ ঘামে নেয়ে উঠছে, এইটেই শুধু তার নজরে পড়ে।

পাশ থেকে নারাণ সাহস দেয় : 'ভয় কি ভাই গন্থু?'

কিন্তু গন্নুর মনে তখন ভয়, ভাবনা, আক্রোশ বা আশ্বাস কোন কিছুই ছিল না। এক অবসন্ন নীরবতার মধ্যে যন্ত্রচালিতের মত সে এগিয়ে চলেছে সামনের অমোঘ ভবিতব্যতার দিকে।

ভুটিয়া কুলি চেষ্টা ক'রে গলার আওয়াজ উঁচু পর্দায় তুলে বলে : 'দিলওয়ার সাহেব যা যা বলতে বলেছে, আমি অবিকল সব বড় সাহেবকে বলবো!'

কিন্তু গলার পর্দা যতখানি উঁচুতে তুলেছিল, ঠিক সেই অনুপাতে মনের ভেতর কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ করছিল। যেখানে ঘাড় উঁচু ক'রে চলা উচিত, সেখানে তার অজ্ঞাতসারে ঘাড় নীচুই থেকে যায়।

কিন্তু একটার পর একটা বাধা অতিক্রম ক'রে জনতা যতই বড় সাহেবের অফিসের কাছ বরাবর গিয়ে পৌছোয়, গন্নুর ততই মনে হয়, যেন সে ক্রমশ জনতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে।

তাদের উৎসাহ দিতে গিয়ে, হঠাৎ জোর গলায় ভুটিয়া কুলি চীৎকার ক'রে ওঠে :

'চল ভাই সব··· পালাও পালাও··· '

সঙ্গে সঙ্গে যে যেদিকে পারে ছুটবার জন্যে পা বাড়ায়, কিন্তু একটা ভয়াবহ আওয়াজ যেন তাদের পথ রোধ ক'রে দাঁড়ায়।

'থাম্ থাম্, ব্লাডি ফুল্‌স্!'

ঘাড় তুলে চোখ মেলে চাইতেই কুলিরা দেখে, সামনের পথের বাঁকের ঝোপ থেকে দেখা যাচ্ছে বড় সাহেবের লাল মুখ···নরকের অন্তহীন অন্ধকারের মত যেন তাদের দিকে এগিয়ে আসছে।

মেঘের গর্জনের মত তাদের কানে এসে লাগে : 'কোথায় চলেছিস্ সব?'

সঙ্গে সঙ্গে বড় সাহেবের পেছনে রাজাসাহেব এবং রাজাসাহেবের পেছনে রাইফেলধারী পাঁচজন প্রহরী তাদের সামনে স্পষ্ট মূর্তিতে জেগে ওঠে।

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত তারা কয়েক পা পিছিয়ে যায় কিন্তু সেখান থেকে আর তারা নড়তে পারে না, যেন সহসা সর্ব-অঙ্গে পক্ষাঘাত হয়ে গিয়েছে।

বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ড যেন এখুনি ছিঁড়ে পড়ে যাবে। কম্পিত হাত আপনা থেকে যুক্ত হয়ে যায়।

জনতার সামনে যারা ছিল, তাদের বুকের দিকে রিভলভার তুলে রেগী গর্জন ক'রে ওঠে:

'হাত তোল্ শিগগির···শূয়োরের বাচ্চা!'

রাজা সাহেবের চোখে যাতে চোখ না পড়ে, এমনিভাবে তারা কোন রকমে তাদের ঘর্মাক্ত মুখ তুলে অর্ধ-নিমীলিত চোখে চেয়ে থাকে, যেন হঠাৎ মধ্য-দিনের সূর্য তাদের দৃষ্টির একেবারে সামনে এসে পড়েছে।

রেগীর দিকে ফিরে ক্রুক্‌ট্রুক্‌ চাপা গলায় বলে: 'আধ-মিনিট দেরি করো··· তার পর রিভলভার ছুঁড়বে···'

ক্রুক্‌ট্রুক্‌ সন্দিগ্ধ সাহসে জনতার দিকে একপা-একপা ক'রে এগিয়ে যায়। বিশ্বাস নেই, এইসব কালা-আদমীদের।

কিন্তু কালা-আদমীরা তখন পিছু হটতে হটতে এ-ওর গায়ে লেগে পড়ে যায়, যেন মৃত্যুর ছায়া তাদের গ্রাস করতে এগিয়ে আসছে।

পেছন থেকে পশ্চাদপসরণকারীদের সামনে এসে ভুটিয়া বুলি বলে ওঠে:

'ভয় নেই ভাই, কিসের ভয়?'

বড় সাহেবের সামনে এগিয়ে এসে বলে: 'হুজুর, দিলওয়ার সাহেব আমাদের পাঠিয়ে দিয়েছেন, আপনার কাছে আমাদের নালিশ জানাতে। নিয়োগী সর্দার, হুজুর···'

পেছন থেকে সামনে ছুটে এসে রেগী গর্জন ক'রে ওঠে: 'শাট্ আপ্! ব্লাডি ফুল! চুপ্ রহো! যেখান থেকে এসেছিস্ সেখানে ফিরে যা···এক পা আর এগিয়েছিস্ কি গুলি ক'রে মেরে ফেলবো! শুনা হাভয়! নিজের চরকায় তেল দিক সে! শূয়োরের বাচ্চা, যা···ফিরে যা যে যার ডেরায়!'

কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভুটিয়ার দিকে কয়েক পা এগিয়ে যায়, কিন্তু একেবারে তার সামনাসামনি পৌঁছবার আগেই থেমে যায়। পেছন

দিকে ফিরে প্রহরীদের হুকুম দেয় : 'এদের মার্চ করিয়ে লাইন-এ রেখে আয়··· এক্ষুনি···না গেলে সবাইকে গুলি ক'রে মেরে ফেলবি!'

হুকুম পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রহরীরা এগিয়ে এসে রাইফেলের বাঁট দিয়ে গুঁতোতে আরম্ভ করে।

কুলিরা ভয়ে চীৎকার ক'রে ওঠে : 'হায় হায়, মা-বাপ, মা-বাপ, হুজুর··· বাঁচাও···বাঁচাও আমাদের হুজুর!'

প্রহরীদের পেছনে পেছনে সাহসে ভর ক'রে ক্রুক্‌টুকুক্ এবার এগিয়ে গিয়ে ধমক দিয়ে ওঠে : 'ফিরে যা, ফিরে যা শুয়োরের দল! ফিরে যা যে-যার গর্তে। তার পর ছ না হাডরের সঙ্গে বোঝা-পড়া, সে আমি ক'রে নেবো!'

তবু সাহসে ভর ক'রে গোরখপুরী বলে ওঠে : 'হুজুর!'

ক্রুক্‌টুকুক্ চীৎকার ক'রে ওঠে : 'ফের! ফের কথা! প্রহরীদের দিকে চেয়ে হুকুম দেয়, কথায় যদি ব্যাটারা না ফেরে, চালাবি গুলি!'

কর্তব্যনিষ্ঠ প্রহরীরা সঙ্গীন তুলে দিয়ে চীৎকার ক'রে ওঠে : 'খবরদার!'

ইতিমধ্যেই অনেকে ছুটতে আরম্ভ করেছিল। অবশিষ্ট যারা তখনও দাঁড়িয়ে ছিল, প্রহরীদের সঙ্গীন তুলতে দেখে তারাও দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে যে যে দিকে পারলো চীৎকার করতে করতে ছুটতে আরম্ভ করলো···

ভীত, সন্ত্রস্ত, পরাজিত, তারা পালিয়ে বাঁচলো।

॥ আঠারো ॥

রাত্রির ঘনায়মান অন্ধকারে গম্বু মুক্ত-দ্বারের বাইরে প্রেত-কণ্টকিত নীরবতার দিকে চেয়ে আছে। তার অন্তরের আতঙ্ক যেন বাইরে অন্ধকার হয়ে কাঁপছে। কোথাও কাছাকাছি জলাভূমিতে আর্তস্বরে ব্যাঙ ডেকে উঠছে, যেন তারা সকলে মিলে সমস্বরে ঊর্ধ্ব আকাশের দিকে প্রতিবাদ

জানাচ্ছে, এমন সুন্দর পৃথিবীতে যমরাজ তার সর্প-অনুচরদের ছেড়ে দিয়েছে কেন।

পাশেই মেঝের ওপর ছেলেমেয়েরা নিশ্চিন্ত নিদ্রায় সুষুপ্ত। নিষ্পাপ শৈশবের প্রশান্ত সুষুপ্তি। গজুই শুধু নিদ্রাহীন চোখে একা জেগে বসে আছে, নিজের মনের সঙ্গে তার বোঝাপড়া চলছে।

দিনের বেলার সেই নির্দয় প্রহারের স্মৃতিতে তার মন জ্বলে-পুড়ে যাচ্ছে। অন্ধকারের ভেতর থেকে ফুটে ওঠে, বড় সাহেব আর ছোট সাহেবের মুখ··· চোখের সামনে যেন স্পষ্ট দেখতে পায়, তারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খেয়ে চলেছে। লজ্জায়, অপমানে, দৈন্যে, ক্ষোভে ভরে ওঠে মন।

সারা বিকেল, সারা সন্ধ্যা, এমনিভাবে ঘরের গুমোটে বদ্ধ হয়ে কেটে গিয়েছে। সন্ধ্যার মুখে গর্ত থেকে একবার বেরিয়েছিল, কাঠ কাটবার আর জল আনবার জন্যে। কিন্তু দেখলো, আশে-পাশেই প্রহরীরা সঙীন তুলে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং চীৎকার ক'রে সকলকে জানিয়ে দিচ্ছে যে, অন্ধকারে রাস্তায় যাকে দেখতে পাবে, তাকেই তারা গুলি ক'রে মেরে ফেলবে।

তাই সন্ধ্যার পর থেকে অন্ধকারে ঘরে সে একলা চুপটি ক'রে বসে আছে। মাঝে মাঝে দেয়ালে কান দিয়ে শুনতে চেষ্টা করেছে, আশে-পাশের ঘর থেকে কোন সাড়াশব্দ আসছে কি না। মাঝে মাঝে শুধু একটা কাশির শব্দ শুনতে পাচ্ছে···সে অতি পরিচিত শব্দ—নারাণ কাশছে। আর শুনছে, বুটওয়ালা ভারী পায়ের শব্দ···রাস্তা দিয়ে প্রহরীরা পাহারা দিয়ে চলেছে। এছাড়া, আর-একটা শব্দ একটু সজাগ হলেই শুনতে পায়, তার নিজের বুকের ভিতর, কে যেন সেখানে একটা হাতুড়ি পিটছে, তারই শব্দ।

অলস চিন্তার জাল থেকে ঝাঁকানি দিয়ে নিজেকে মুক্ত ক'রে নিয়ে নিজেকেই নিজে জিজ্ঞেস ক'রে ওঠে, কি হলো? কেন এমন হলো?

মনের ওপর দিয়ে ভেসে ভেসে চলে যায়, একটার পর একটা ভাবনা। কোনটার সঙ্গে যেন কারুর কোন যোগ নেই।

কতক্ষণ যে এইভাবে কেটে যায়, তা সে নিজেই ঠিক করতে পারে না। হঠাৎ উঠে দাঁড়ায়। ঠিক করে, নারাণের ঘরে গিয়ে নারাণের সঙ্গে দেখা করবে। মনে হয় যেন নারাণ তাকে ডাকছে। মানুষের কাছে যাবার জন্যে, মানুষের উষ্ণ স্পর্শের জন্যে ব্যাকুল হয়ে ওঠে মন। সে মন-প্রাণ দিয়ে উপলব্ধি করতে চায়, সে বিচ্ছিন্ন একক নয়...মানুষের সঙ্গে মানুষের সহজ সম্পর্ক আছে বলেই না জীবনের সার্থকতা। সেই সহজ সম্পর্কটুকুর জন্যে ব্যাকুল হয়ে ওঠে তার মন।

বাইরে তারাহীন অন্ধকার আকাশ, পড়ে আছে দুস্তর ব্যবধানের মত, দুই স্বতন্ত্র বিশ্বের মাঝখানে দুর্লঙ্ঘ্য এক মহা-ব্যবধান। অগ্নি-দেহ দিব্য-পুরুষেরা সেখানে এখন বেরিয়েছে বিচরণ করতে, মানবেব সকল কর্মের নির্বাক সাক্ষী···

নারাণের ভাঙা বেড়ার ফাটল দিয়ে যেটুকু আলো দেখা যাচ্ছিল, সেই দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে অন্ধকারে রুদ্ধশ্বাসে ছুটে চলে।

দরজার কাছে এসে তবে দম নেয়। ডাকে : 'নারাণ ভাই!'

কাশতে কাশতে নারাণ জিজ্ঞেস ক'রে ওঠে : 'কে বটে?'

'আমি গজু, নারাণ ভাই!'

তাড়াতাড়ি উঠে দরজা খুলে দিয়ে নারাণ আগে তাকে ভেতরে টেনে নেয়। বলে : 'এসো, এসো ভায়া!'

ঠিক তক্ষুনি কাছে কোথায় একটা রাস্তার কুকুর চীৎকার ক'রে ডেকে উঠলো। ভয়ে গজু কাঠ হয়ে বাইরের দিকে চায়। ঘরের এক কোণে নারাণের বউ ছেলেপুলে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। একটা মাটির প্রদীপের চারদিকে ভুটিয়া আর গোরখপুরী আর একজন ছোকরা কুলি হুঁকো নিয়ে বসেছিল। গজুকে টেনে নিয়ে এসে নারাণ তার হাতে হুঁকোটা দেয়।

গজু আসবার আগে তারা নিজেদের মধ্যে যে কথা নিয়ে আলোচনা করছিল, সেই প্রসঙ্গেই নারাণ বলতে শুরু করে : 'তাহলে বোঝ ব্যাপারটা

কি···জোরহাটের ডেপ্‌টি কমিশনার সাহেবের কাছে বিশজন কুলি গিয়ে ধন্না দিল···বোম্বের নাসিক অঞ্চল থেকে তাদের যোগাড় ক'রে আনা হয়েছে··· এক বছরের কন্‌ট্রাক্‌ট তাদের সঙ্গে। এক বছরের বেশী তারা কাজ করেছে। সামান্য যা মাইনে পেতো, তা থেকে আধ-পয়সাও তারা জমাতে পারে নি। সঙ্গে এমন কিছু চাল-ডাল নেই যে ছ'সাত দিনও চলে। তাই তারা হুজুরের কাছে এসে জানালো যে, তাদের বাড়ী ফিরে যেতে দেওয়া হোক্‌. অবশ্যি যাবার খরচ মালিকরাই দেবে, কন্‌ট্রাক্টের সময় তাদের তাই বোঝানও হয়েছিল। ডেপ্‌টি সাহেব ম্যানেজার সাহেবের কাছে গেল···ছ'জনে গিট্‌-মিট্‌ গিট-মিট্‌ ক'রে কি সব বলাবলি করলো···তার পর বুঝলে কিনা, ডেপ্‌টি সাহেব এসে কুলিদের সোজা হুকুম করলো বাড়ী যাওয়া এখন হবে না, আরও এক বছর কাজ করতে হবে···অতএব যে-যার কাজে এখুনি চলে যাও। তারা, বুঝলে কিনা, রাজী হলো না। ঠিক করলো, যে হেঁটেই বাড়ী রওয়ানা হবে। সেই না মতলব ক'রে তারা চা-বাগান থেকে বেরিয়ে পড়লো। কিন্তু তারা আর দেশে গিয়ে কেঁউ পৌছল না। কি যে হলো, তা-ও কেউ জানতে পারলো না।···তাহলে বুঝেছ ভায়া, কয়বার আমাদের কিছু নেই··· ঐ সাহেবদের মুখ চেয়েই আমাদের পড়ে থাকতে হবে।'

সেই কাহিনী শুনে গঙ্গুর মনের অন্ধকার যেন বিদ্যুৎ-ঝলকে শুধু একবার নড়ে উঠলো। চোখ দুটো আপনা থেকে বড় হয়ে গেল। বোকার মতন ফ্যালফ্যাল ক'রে নারাণের মুখের দিকে শুধু চেয়ে রইলো।

গঙ্গুর স্তব্ধতাকে যেন ধাক্কা দিয়ে গোরখপুরী বলে উঠলো :

'হায়, হায়, যদি আমরা কোনরকমে সকলে একজোট হয়ে অন্য কোন বাগানে যেতে পারতাম!'

নারাণ বলে : 'সেটা নিছক পাগলামি ছাড়া আর কিছুই হতো না। তুমি ভায়া, এইসব শাদা চামড়াওয়ালাদের চেনো না। শোন, বলি। তোমারই সমান বয়সী, একজন কুলি-ছোক্‌রা, নাম ভেরোনা তিলক, তার অপরাধ সে

সে-চা-বাগানে কাজ করতো, সেখানকার কাজ ছেড়ে অন্ত এক চা-বাগানে কাজ করতে চলে যায়। তার কারণ, সে বেচারা শুনেছিল, সেই চা-বাগানে নাকি তাদের নিজের গাঁয়ের লোকেরা সব কাজ করে। কি হলো জান? নতুন চা-বাগানে আসতেই তাকে গ্রেফতার ক'রে ম্যানেজারের সামনে নিয়ে আসা হলো। সেখানে ম্যানেজার সাহেব তাকে সওয়াল করতে··· সে জবাব দিল যে, সে কাজের জন্তে এসেছে। সাহেব কিন্তু সে কথা বিশ্বাস করলো না। সাহেব মনে করলো, নিশ্চয়ই ছোক্‌রা কোন ইউনিয়নওয়ালা হবে। ইউনিয়নের নামে, জান তো, সরকার কিরকম চটা! তক্ষুনি তক্ষুনি ছেলেটার নামে একটা কাগজে কি-সব লিখলো সাহেব, তার পর বাবু, পিয়ন আর চৌকিদারদের ডেকে সাক্ষী হতে বললো। পুলিসকে ডেকে পাঠালো··· পুলিস আসার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটাকে জেলে ধরে নিয়ে গেল। সাহেব সেই কাগজে লিখেছিল যে ছেলেটা ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের লোক, সাহেবের তাই ঘোরতর সন্দেহ হয়। ট্রেড ইউনিয়ন? ওটা হলো কুলিমজুরদেরই একরকম সভা···এখানে অবশ্য ও-সব কিছু নেই। এখানকার সাহেবদের কড়া হুকুম ট্রেড ইউনিয়ন-ওয়ালাদের কোন লোক যেন এখানে না আসে। এই ইউনিয়ন কি, কি তার কাজ, সে-সম্বন্ধে এখানে কেউ কোন আলোচনা করতে পারবে না। কিন্তু বুঝলে কি না, বছর দুই আগে এই ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের একজন লোক ফকীরের ছদ্মবেশ ধরে আমাদের কাছে এসেছিল। তার মুখ থেকেই আমরা জানতে পারলাম আমাদের সুখ-সুবিধার জন্তেই এই ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস গড়ে তোলা হয়েছে। যাতে মালিকরা আমাদের স্তায্য প্রাপ্য আমাদের ফাঁকি দিতে না পারে, তাই দেখবার জন্তেই এই ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস। হাঁ, যা বলছিলাম ভেরোনার কথা। সে বেচারা তো অবাক। পুলিসের কাছে সে দিব্যি ক'রে বললে, হুজুর, জীবনে আমি ঐ যে কি বলছেন···ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস···তার নাম পর্যন্ত শুনি নি। শেষকালে তাকে জেলে যেতেই হলো। ম্যানেজারের কাজে ঝামেলা করেছিল, এই হলো তার অপরাধ।'

দুখিয়া জিজ্ঞেস ক'রে উঠলো : 'সে কেন প্রতিবাদ করলো না ?'

নারাণ জবাব দেয় : 'আরে তার কথা শুনছে কে বলো ? সাহেবরা যাই ইচ্ছে করলে সবই করতে পারে। যখন তোমাকে তাদের দরকার, তখন তোমাকে থাকতে তারা বাধ্য করবে, যখন তোমাকে আর তাদের দরকার হবে না, তখন তোমাকে চলে যেতে বাধ্য করবে তারাই। যুদ্ধের পর, ব্যবসায় মন্দা পড়ে গেল। ছোট ছোট চা-বাগানগুলো যুদ্ধের সময় মেলা টাকা রোজগার করেছিল। ব্যবসা মন্দা দেখে তখন তারা দরজা বন্ধ ক'রে দিল। আর যে-ক'টা বড় চা-বাগান ছিল তারা কুলিদের ডেকে জানিয়ে দিল, তাদের সমানই কাজ করতে হবে, তবে পুরো মাইনে পাবে না, শুধু নাম-মাত্র হাত-খরচা পাবে। তাতেই তাদের কাজ করতে হবে। গণ্ডায় গণ্ডায় কুলি খেতে না পেয়ে পথের ধারে মরে প'ড়ে রইলো তবুও তারা চা-বাগানে ফিরে গেল না। দিনে তিন পয়সার কি সুখ তারা জান খুইয়ে তা দেখে নিয়েছে। চোখের সামনে তারা দেখেছে, গাছের সঙ্গে তাদের ভাই-ভাইদের বেঁধে, বেতের পর বেত মারা হয়েছে। আজ মুখ বুজে আমাদের যে অত্যাচার সহ্য করতে হচ্ছে, তারাও তা ষোল আনা সয়েছে। তাই যত কষ্টই তারা পাক না কেন, তারা শপথ করে, আর চা-বাগানে তারা ফিরে যাবে না। তারা প্রতিজ্ঞা করেছিল…'

হঠাৎ কাশি এসে পড়ায় নারাণ বক্তব্য শেষ করতে পারে না। অনেকক্ষণ একসঙ্গে কথা বলার দরুন তার দমও ফুরিয়ে এসেছিল।

গজু মনে মনে ভাবে, যদি তাদের মতন শক্ত মন তার হতো, যদি তাদের মতন সে-ও শপথ করতে পারতো!

উদ্‌গ্রীব হয়ে নিজেই ছিন্নসূত্র ধরিয়ে দেয় : 'হাঁ, তার পর কি হলো ?'

নারাণ উৎসাহে আবার শুরু করে : 'যখন একে একে সবাই কাজ ছেড়ে চলে যেতে লাগলো, তখন বুঝেছ কিনা ভায়া, সাহেবরা একটু ভড়কে গেল। তখন তারা তাদের আটকাবার ফিকির খুঁজতে লাগলো। রেলগাড়ীর

সাহেবদের কাছে খবর চলে গেল। করিমগঞ্জের রেলের সাহেবরা হুকুম দিয়ে দিল, কোন কুলি রেলের টিকিট কিনতে পাবে না। তাই না জেনে কুলিরা ঠিক করলো, তারা হেঁটেই চলতে আরম্ভ করবে। তাই দল বেঁধে তারা হেঁটে নামতে শুরু ক'রে দিল। কালৌরাতে প্রায় দু'শো কুলিকে পুলিস পথ আগলে দাঁড়ালো। সেইখানেই তাদের আটক ক'রে রাখলো।

'...গোয়ালন্দতে প্রায় হাজার কুলি জমা হয়েছিল। সেখানে গান্ধী-ওয়ালাদের সঙ্গে রেলের সাহেবদের ঝগড়া বেধে যায়। বাধ্য হয়ে তখন তারা কুলিদের টিকিট দেয়। সেই এক হাজার কুলি গোয়ালন্দ থেকে ট্রেনে চড়ে ফরিদপুর স্টেশনে এসে যখন পৌছল, তখন সেখানকার ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব ট্রেন থেকে সমস্ত কুলিদের জোর ক'রে নামিয়ে দিল। সারা রাত তাদের পুলিসের হেফাজতে রেখে সকালবেলা তাদের পথে বার ক'রে দেওয়া হলো। সেখান থেকে মাইল তিনেক দূরে একটা জায়গায় কংগ্রেসওয়ালারা তাদের খাবার বন্দোবস্ত ক'রে দিল। তাদের খাইয়ে-দাইয়ে ঠিক করলো যে, কোকসা থেকে তাদের আবার ট্রেনে তুলে দেবে। কিন্তু সাহেবরা সেখান থেকে পুলিস দিয়ে তাদের তাড়িয়ে বেলগাছিতে এনে ফেললো। সেখানকার শহরের লোকেরা তাদের সেদিনের মত খেতে দিল। তার পর, বুঝেছ ভায়া, সেই ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব সেখানে স্বয়ং হাজির হয়ে হুকুম দিল, খবরদার, তারা সেখান থেকে ট্রেনে উঠতে পারবে না। শহরের ভদ্রলোকেরা সকলে মিলে বললো, আমরা ওদের হয়ে টিকিটের দাম দেবো। কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব কোন কথাই কানে তুললো না। পরের দিন, কি জানি কি হলো, সাহেবের মেজাজ একটু নরম হলো। তাদের কুষ্টিয়া পর্যন্ত যাবার হুকুম দিল। পথে কলেরায় বহু কুলি মারা গেল। যখন করিমগঞ্জে তারা এসেছে, সরকার থেকে তাদের মাইনে রোজ ছ'আনা দেওয়া হবে বলে জানানো হয়। কিন্তু তবুও তারা ফিরলো না। হাজারে হাজারে কুলি সেই কাঠ-ফাটা রোদে শহরের পথে-ঘাটে দুর্বল শরীরে শুয়ে পড়লো। অঙ্গে কারুর একটা ন্যাকড়া

বলতে কিছু নেই। যারা তখনও দাঁড়িয়ে ছিল, দেশে ফিরে যাবার জন্যে তারা ছটফট করতে লাগলো। আর দেশ কি ছাই কাছে? কেউ এসেছে নাসিক থেকে, কেউ এসেছে বম্বে থেকে, কেউ বা এসেছে সেই রাজপুতানা, মাদ্রাজ থেকে।···সেদিন চা-বাগানের সাহেবদের লোক করিমগঞ্জে এসে জাহাজের মালিকদেরও সঙ্গে শলা-পরামর্শ ক'রে ঘাট থেকে তক্তা সরিয়ে নিয়েছিল। যারা ঠিক করেছিল জাহাজে ক'রে যাবে, তারা আর জাহাজে উঠতেই পারলো না। হুড়োহুড়িতে অনেকে নদীর জলেই পড়ে গেল, যারা সাঁতার জানতো না, তারা ডুবে মরে গেল।'

দম নেবার জন্যে নারাণ কয়েক মুহূর্ত থেমে আবার বলতে শুরু করলো: 'সরকারের লোক এসে তখন তাদের চা-বাগানে ফিরে যাবার জন্যে ধরাধরি করতে লাগলো। কিন্তু তারা কিছুতেই ফিরবে না। তারা তখন কোনরকমে তাদের দেশে গিয়ে পৌঁছতে চায়। এখানকার কর্মচারীদের জুলুমে তাদের মন এতদূর খারাপ হয়ে গিয়েছিল যে, আশী বছরের বুড়ো, কোলেতে বাচ্চা-কাচ্চা মেয়েমানুষ; ছোট ছোট ছেলে, তারা পর্যন্ত পণ করেছিল যে, কোন কিছু যদি না জোটে, পায়ে হেঁটেই তারা এগিয়ে চলবে। মহাত্মা গান্ধীর বন্ধু, একজন পাদরী সাহেব, তাদের সেই দুর্দশার কথা শুনে তাদের সাহায্য করবার জন্যে আসেন। একবার তাদের কাছ থেকে সরকারের কাছে যান, আবার সরকারের কাছ থেকে তাদের কাছে ম্লান মুখে ফিরে আসেন। দুঃখে তাঁর মন ভারী হয়ে ওঠে কিন্তু এত চেষ্টা ক'রেও তিনিও কিছু ক'রে উঠতে পারলেন না। চাঁদপুর স্টেশনের আশে-পাশে, প্লাটফর্মে, প্রায় তিন হাজার ছেলে, বুড়ো, মেয়ে গাড়ীতে ওঠবার জন্যে অপেক্ষা ক'রে আছে। কিন্তু একটার পর একটা ট্রেন চাঁদপুর ছেড়ে চলে যায়। তাদের আর উঠতে দেওয়া হয় না। সব আশা ছেড়ে দিয়ে সেইখানেই কুলিরা রাত আসতে যে যার চোখ বুজে পড়ে রইলো। দেখতে দেখতে তারা ক্লান্ত দেহে ঘুমিয়ে পড়লো। এমন সময় রাত দুপুরে যখন তারা অঘোরে ঘুমুচ্ছে, সেই সময় গুর্খা

সৈন্যরা এসে তাদের আক্রমণ করলো। বেয়নেটের খাঁচা দিয়ে খুঁচিয়ে মারতে লাগলো। একবার ভেবে দেখো ভায়া, তাদের মধ্যে দুধের বাচ্চা সব আছে, এমন কি যার পেট থেকে সদ্য বেরিয়েছে, এমন সব বাচ্চারাও আছে, ভয়ে তারা ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠলো। একজন কুলি-কামিন, বেচারার অসুখ হয়েছিল, কোলের বাচ্চাকে নিয়ে ভয়ে পালাতে গিয়ে টিকিট ঘরের বাইরে লোহার তারে আটকে পড়ে গেল, সেই অবস্থায় গুর্খারা এসে তাকে সঙীন বিঁধে মেরে ফেললো। সেই চীৎকার শুনে···শহরের লোকেরা লণ্ঠন হাতে যখন ছুটে এলো, দেখে, অনেকের ভবলীলা শেষ হয়ে গিয়েছে, অনেকে রক্তে লাল হয়ে পড়ে ধুঁকছে। আজ সকালে আমাদের ভাগ্যে যা ঘটেছে, তার কাছে সে কিছুই নয়। তাহলে মোদ্দা কথা, বুঝছো ভায়া, করবার আমাদের কিছু নেই আর। এইখানেই থেকে মরবার জন্যে মনস্থির ক'রে ফেলো, হুঁকো খাও আর রাম নাম করো।'

কয়েক মুহূর্তের নিস্তব্ধতার পর গোরখপুরী বলে উঠলো :

'আমি কিন্তু চলে যাবোই। যেমন ক'রে পারি পালাবো। দিনে লুকিয়ে থাকবো, রাতের আঁধারে হাঁটবো।'

নারাণ ধমকে ওঠে : 'তুমি একটা আস্ত পাঁঠা। আমরা এখানে হাজার জন লোক রয়েছি, আমাদের ফেলে যাবে কোথায়? যদি কিছু করতেই হয়, এইখানে সবাই মিলে একজোট হয়ে করবো। তাছাড়া লুকোবে কোথা ? আঁধারে হাঁটলেই কি শুধু হলো? চারিদিকে বাঘ, বুনো হাতী, সিংহ আছে ···বেশী আর এগিয়ে যেতে হবে না।'

ছোকরার মুখে আর কথা যোগায় না। পালানোর চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে একটা এ্যাডভেঞ্চারের স্বাদ ছিল। কিন্তু বাঘের পেটে হেঁটে চলে যাওয়ার সম্ভাবনায় তার উৎসাহ নিভে আসে। মাথা হেঁট ক'রে বসে থাকে। মানুষ মরিয়া হয়ে উঠলে, হঠাৎ ভেতরে যে শক্তির জোয়ার জেগে ওঠে, তার সংস্পর্শে ভেতরটা তখনও আলোড়িত হতে থাকে।

নারাণের কথা শুনে গন্থু একেবারে বিহ্বল হয়ে যায়। অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াতে আর পারে না সে, তার ক্লান্ত মন বাধ্য হয়ে নারাণের যুক্তিই মেনে নেয়।

গোরখপুরী প্রস্তাব করে : 'তাহলে, কালকে থেকে কি ভাবে আমরা...' কিন্তু বক্তব্য শেষ হবার আগেই, তার কথা বন্ধ হয়ে যায়। দরজায় কে যেন এসে ধাক্কা মারছে।

তাড়াতাড়ি নারাণ হাত তুলে সবাইকে, শিং দিয়ে গুঁতোনোর মতন ক'রে মাটিতে শুয়ে পড়তে ইঙ্গিত করে। হঠাৎ যেন ঘুম ভেঙে গিয়েছে, এমনিভাবে দু'তিনবার কেশে উঠে ভারী গলায় জিজ্ঞেস করে : 'কে বটে ?'

বাইরে থেকে প্রহরীর গলার আওয়াজ আসে : 'ঘরের আলো নিভোও নি কেন এখনও ?'

তাড়াতাড়ি নারাণ নিজের ভুল শুধরে নেবার জন্যে ভীতকণ্ঠে বলে ওঠে : 'তাইতো, তাইতো, এক্ষুনি নিভিয়ে দিচ্ছি, হুজুর !'

সঙ্গে সঙ্গে চাপা গলায় গালাগাল দিয়ে ওঠে ; 'নিভিয়ে দিচ্ছি, জালিম !'

আলো নিভিয়ে দরজার কাছে গিয়ে দেখে, বাইরে কেউ দাঁড়িয়ে আছে কি না। না, চলে গিয়েছে জালিম !

ফিরে এসে সঙ্গীদের বলে :

'বরাত ভাল, ঠিক যখন আমরা চুপচাপ হয়ে গিয়েছিলাম, বেটা তখন এসে পড়েছিল।'

'কালকের ভাবনা কাল ভাবা যাবে'খন। এখন যে যার তাই ঘুমিয়ে পড়।

গন্থু উঠে পড়ে, বলে :

'আমার আবার ছেলেমেয়ে দুটো একলা রয়েছে। আমাকে যেতেই হবে।'

দরজার বাইরে পা দিয়েই সে ছুটতে আরম্ভ করে। যেন তাকে ভূতে তাড়া করেছে। নিজের ঘরের ভেতর ঢুকে যখন চোখের সামনে দেখে, বুদ্ধুকে পাশে নিয়ে লীলা ঘুমিয়ে আছে, তখন সুস্থির হয়।

। উনিশ ।

সারারাত্রি ভাল ঘুম না হওয়ার দরুন সকালবেলা রুক্‌উইকের মেজাজটা রুক্ষ হয়েই ছিল। গতকালের ঘটনায় মনটাও চঞ্চল হয়েছিল। ঘড়ির দিকে চেয়ে আপনার মনে বলে ওঠে, আট-টার মধ্যে যদি ব্যাটারা কাজে না আসে, তাহলে বুঝতে হবে গণ্ডগোলটা ভালভাবেই পাকাচ্ছে। আসাম ভ্যালী লাইট হর্স সৈন্য-বিভাগের রিসার্ভ দলে তার নাম তখনও লেখা ছিল। সেই সৈন্য-বিভাগের বিশিষ্ট সামরিক পোষাকে সুসজ্জিত হয়ে সকালবেলা ক্লাবের বারাণ্ডায় পায়চারি করতে করতে সমস্ত ব্যাপারটা নিজের মনের মধ্যে পুনরাবৃত্তি ক'রে নিচ্ছিল।

কাল রাত্রি থেকে নিজের বাংলোতে আর ফিরে যায় নি। ক্লাবের লাইব্রেরি ঘরে একটা খাটের ওপর সাময়িকভাবে বিছানা ক'রে নিয়ে সেইখানেই রাত কাটায়। রাতারাতি ক্লাবকে দুর্গে পরিণত ক'রে নেওয়া হয়েছিল, বিপ্লবের আশঙ্কায়। সাহসিকা শ্বেতাঙ্গিনীর দল স্ব স্ব বাংলোতে না থেকে ক্লাবের ডাইনিং-ঘরে ক্যাম্প-খাটের ওপরই রজনী-যাপন করেন এবং ক্লাবের চতুর্দিকে সারারাত্রি ধরে সশস্ত্র প্রহরীরা টহল দেয়। ভেতরে পালা ক'রে এক-একজন শ্বেতাঙ্গ অফিসর স্ব স্ব নারীর মর্যাদা রক্ষার জন্যে জেগে পাহারা দিয়েছিল।

অবশ্য ক্লাবের অধিকাংশ সভ্য বা সভ্যার মনে আসল কি ব্যাপার তার সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল না। তবে তাঁরা সবাই ধরে নিয়েছিলেন যে ব্যাপার নিশ্চয়ই খুব সঙ্গীন। ক্লাবের ভেতর ডবল-ব্যারেল গান মজুদ রেখে, হাতে ভর্তি রিভলভার নিয়ে, মারাত্মক মূর্তিতে সুসজ্জিত হয়ে তাঁরা সিপাহী বিদ্রোহের আমলে জন্ লরেন্স, হেনরী ক্যানিং এবং লক্ষ্ণৌর অবরোধের কথা আলোচনা করেন। ওধারে সিলেটে টেলিগ্রাফ চলে গিয়েছিল পুলিসের সাহায্যের জন্যে, মণিপুরে গিয়েছিল সামরিক সাহায্যের জন্যে এবং আর একটা তার গিয়েছিল কলকাতায় দ্রুত বিমানবাহিনী পাঠাতে।

বিশেষ চেষ্টা ক'রে নিজেদের শান্ত এবং সংযত রেখে, তাঁরা আকুলভাবে দূর দিক্‌-রেখার দিকে চেয়ে বসেছিলেন, কখন সামরিক সাহায্য আসে।

ম্যাকেরা গত যুদ্ধের সময় সামরিকভাবে একটা কমিশন পেয়েছিল। সেই সময়কার স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ মেজরের পোষাকটি তার সঙ্গে সর্বদাই থাকতো। ব্যাপার-গতিক দেখে সেই মেজরের পোষাকেই ম্যাকেরা সুসজ্জিত হয়ে এসেছিল। নিজেদের আয়োজন সম্পর্কে একটু সন্দিগ্ধ হয়েই বলে উঠলো:

'আমাদের মাল-মসলা আরও কিছু থাকা উচিত। কোন অস্ত্রশস্ত্র নেই...সংবাদ দেওয়া-নেওয়ার ব্যবস্থা বলতে গেলে সেই মান্ধাতার আমলের... তা ছাড়া ছাই এখন এসব বলেই বা কি লাভ?'

রেগী হার্ট সুস্থির হয়ে বসতে পারছিল না। একবার উঠছে আবার বসছে, ঘরের ভেতর যাচ্ছে আবার বারাণ্ডায় বেরিয়ে পায়চারি করছে... ভেতরের অস্বস্তি যেন কোন মতেই চেপে রাখতে পারছে না। ম্যাকেরার কথায় বলে উঠলো: 'সেই জন্যেই তো আমি আবার টেলিফোন করেছি...'

সমস্ত বিপত্তির মূল কারণ সে নিজে, একথা সে ভালরকমই জানতো। তাই দলের মনস্তুষ্টির জন্যে খানিকটা গায়ে পড়েই আজ সে প্রত্যেকের হয়ে এটা-সেটা করতে এগিয়ে যায়। যদি তাকে দিয়ে কারুর কোন সাহায্য হয়। হঠাৎ এইভাবে মাথা গরম ক'রে ফেলার দরুন, মনে মনে যে খানিকটা অনুতপ্ত হয় নি, তাও নয়।

র‍্যাল্‌ফ্‌ও অধীর হয়ে উঠেছিল। বাইরের দিকে চেয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে ব'লে ওঠে: 'কই, এখনো তো সাহায্য আসার কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না।'

ভারতবর্ষে আসবার আগে, র‍্যাল্‌ফ্‌ হ্যাম্‌শায়ারে সাধারণ কৃষকের দৈনন্দিন মামুলী জীবনই যাপন ক'রে এসেছে। বিপদের সময় একটা কিছু করা দরকার কিন্তু কি যে করা দরকার তা সে ঠিক ক'রে উঠতে পারে না।

হঠাৎ ম্যাকেরা সামরিক কায়দায় ডেকে ওঠে: 'কোথায়, টুইটি?'

বসবার ঘরের জানলার ওপার থেকে টুইটির মেদ-বহুল বপু নড়ে ওঠে।

'ম্যাকেরা জিজ্ঞেস করে : 'হিচকক্ কোথায় ?'

'এ্যাটেন্‌শন্' ভঙ্গীতে পায়ে পা ঠুকবার চেষ্টা ক'রে টুইটি উত্তরে জানায় : 'ঘুমুচ্ছে, স্যার!'

ম্যাকেরা গর্জে ওঠে : 'মদ খেয়ে বেহুঁশ তো ?'

ম্যাকেরার ভঙ্গী দেখে টুইটির হাসি পায় কিন্তু হাসিটাকে সহজ ক'রে নিয়ে বলে : 'মনে হচ্ছে, দু' এক ঢোক বেশী হয়ত পেটে গিয়েছে। সারা রাত্তিরের ছটফটানি পুষিয়ে নিচ্ছে, স্যার!'

ফ্রুক্ ট্রুক্ তিক্ত কণ্ঠে প্রতিবাদ ক'রে ওঠে : 'সারা রাত্তিরের ছটফটানি· বাজে কথা!...সারা রাত ধরে ব্রিজ খেলা!'

টুইটির দিকে ঘাড় তুলে নিরীক্ষণ ক'রে দেখে ম্যাকেরা বলে :

'তোমারও অবস্থা যে খুব ভাল, তাতো মনে হচ্ছে না।'

টুইটি ব্যঙ্গের সুরেই জবাব দেয় : 'তা যা মনে করেন, স্যার ?'

'তোমাকে একলা কি আর বলছি. তোমাদের দলের সব ক'টিই সমান বার্টন, স্মিথ আর ক্রেম্‌ওয়েল আজ সকালে আমার নিষেধ সত্ত্বেও ক্লাব ছেড়ে চলে গেল...'

রাগে ঘোঁতঘোঁত করতে করতে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থাকার পর আবার বলতে শুরু করে :

'এখন যে সিচুয়েশন্ তাতে পুরোমাত্রায় ডিসিপ্লিন্ মেনে চলতে হবে... বল, সত্যি কি মিথ্যে ?'

উত্তরের জন্যে সকলের মুখের দিকে ফিরে চেয়ে দেখে! হঠাৎ কি যেন মনে পড়ায় চোখ-মুখ লাল হয়ে ওঠে। গলা সপ্তমে চড়িয়ে বলে ওঠে :

'কুলিরা যদি এখন আমাদের আক্রমণ করে, ব্যাপারটা কি হবে তা বুঝতে পারছো ? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব মরতে হবে...একেবারে সাবাড়! তার চেয়েও ভয়ঙ্কর কথা, আমাদের প্রেস্‌টিজ্ একেবারে নর্দমার পাঁকে গিয়ে পড়বে।'

রুক্‌টুকুক্ আপনার মনে বিড়বিড় ক'রে ওঠে : 'শয়তানের ঝাড় !'

হাতে একটা রঙীন ছাতি নিয়ে সহসা মিসেস্ রুক্‌টুকুক্ হাজির হন।

'গুড্ মর্নিং !' সকলের দিকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে অভিবাদন জানান। যাদের অভিবাদন জানালেন, তাদের মনে তখন যে কি ঝড়-তুফান চলেছে, সে-সম্বন্ধে ভদ্রমহিলার কোন ধারণাই ছিল না।

তাই এক গাল হেসে বলে উঠলেন : 'কি লাভ্‌লি সকালটা···না ?'

চার্লস রুক্‌টুকুকের ভারী ভ্রূ দুটো একবার নেচে উঠলো শুধু, বিরক্ত হয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিল। কারুর মুখে কোন কথা নেই।

বাড়ন্ত বেলার খর রোদ বারাণ্ডার ওপর এগিয়ে এসে পড়েছে।

সেই নিস্তব্ধতাকে নিজের মতন ক'রে ব্যাখ্যা ক'রে নিয়ে মিসেস্ রুক্‌টুকুক্ বলে ওঠেন : 'এ সব হলো বাবুবারার দোষ···এখন কেঁদে ভাসিয়ে দিচ্ছে মেয়ে···বেচারা মিসেস্ ম্যাকেরা তাকে বোঝাতে এত চেষ্টা করছে কিন্তু কারুর কথাই শুনবে না সে···'

দাঁতে দাঁত লাগিয়ে ম্যাকেরা বলে ওঠে : 'ও ভাবছে, আমাদের এবার মুঠোর মধ্যে পেয়েছে···কাল রাত্তিরে টহল দিতে দিতে হুজুর এখানে এসেছিলেন একবার···আসল উদ্দেশ্য, আমাদের অবস্থাটা স্বচক্ষে দেখা···মুখে বললেন : 'টুইটির খোঁজে এসেছি···'

ম্যাকেরা স্তু লা হাভরের কথা ভাবছিল।

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে রুক্‌টুকুকের দিকে ফিরে বলে :

'চার্লস্ ! অসহ্য ! এ সম্বন্ধে একটা কিছু বিহিত করতেই হবে এবার !'

রুক্‌টুকুক্ সঙ্গে সঙ্গে সায় দিয়ে ওঠে : 'এক্ষুনি তাকে এখান থেকে আমি বরখাস্ত করছি···তার পর কোম্পানীর অনুমোদন পরে-পশ্চাতে নিয়ে আসা যাবে !'

সেখান থেকে উঠে ম্যাকেরা আড্ডাঘরের দিকে অগ্রসর হয়, ম্যাবেল ঘুম থেকে উঠেছে কিনা দেখবার জন্যে। রুক্‌টুকুক্ আর হার্ট অনুসরণ করে।

মিসেস্ ক্রুক্‌ট্রুক্ একা পড়ে থাকেন। বিস্মিত হয়ে আপনার মনে বলে ওঠেন : 'কি জানি, আজ সকালে সকলকেই যেন ভূতে পেয়েছে !'

'একবার এরোপ্লেনটা এসে পড়লে হয়···তখন বাছাধনেরা কোথায় যায় দেখা যাবে ! তার পর সিলেট থেকে আর্মি আসছে···সব ঠাণ্ডা ক'রে দেবো···' ম্যাকেরা শুনিয়ে শুনিয়েই বলে।

কিন্তু টুইটি সামনে বসে নির্বিকার সিগারেটের ধোঁয়া উদ্গিরণ ক'রে চলে। যেন এসব কথার সঙ্গে তার কোন সম্পর্কই নেই। রাগে ম্যাকেরার ক্লান্ত স্নায়ু উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।

পাশের টেবিল থেকে একখানা পুরনো 'বাইস্টাণ্ডার' কাগজ তুলে নিয়ে টুইটি এতক্ষণ পরে উদাসীন শান্ত কণ্ঠে সাড়া দেয় : 'আমার কথা যদি জিজ্ঞেস কর, তাহলে আমি বলবো, এইসব এরোপ্লেন আর আর্মির কোন প্রয়োজনই নেই। কুলিরা যা দুঃখ করছে, তা যদি আমরা সত্যিই শুনতাম, তাহলে এসব হাঙ্গামা কিছুই হতো না, তার বদলে আমরা তাদের সঙ্গে খেলা করতে শুরু ক'রে দিলাম···'

সহকর্মীদের সেই মূর্খতা স্মরণ ক'রে টুইটি মনে মনে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। জর্জ বেল্‌যারের একটা কার্টুন ছবির ওপর মনঃসংযোগ ক'রে নিজের রাগকে দমন করবার চেষ্টা করে। কাল রাত্তিরে স্ক লা হাভর এসে তার সঙ্গে দেখা করেছিল এবং সব কথা তাকে বুঝিয়ে বলে গিয়েছে।

তাই তখনও সে চেষ্টা করছিল, যাতে আপসে ব্যাপারটার নিষ্পত্তি হয়ে যায়। কিন্তু মাথার বালিশের তলায় রিভলভার নিয়ে শুয়ে থাকতে থাকতে, আর এরোপ্লেন থেকে বোমা-বর্ষণের রোমাঞ্চকর দৃশ্যের স্বপ্ন দেখতে দেখতে, তার সহধর্মীদের বিলিতী-রক্ত গরম হয়ে উঠেছিল। টুইটি বেশ ভালরকমই জানতো, এইসব সৌখীন রাইফেলধারীর বীরত্বে যদি সত্যি ভীত হবার কারুর কারণ থাকে, তা তাদের আশে-পাশের বন্ধুদেরই এবং তাদের

নিজেদেরই। কুলিদের সে ভালরকমই জানতো। তারা যে যুদ্ধ করতে আসতে পারে না, সে সম্বন্ধে তার মনে কোন সন্দেহই ছিল না। অবশ্য ছ লা হাভর হয়ত আগুন-মার্কা উগ্র লোক হতে পারে কিন্তু ভেতরের দিক্ থেকে সে অবুঝ নয়। সে তো কুলিদের শুধু বলেছিল ক্রুক্‌টুকুক্ আর হাক্টের কাছে গিয়ে তাদের অভিযোগ জানাতে, এবং তারা তাই দলবদ্ধ হয়ে আসে। কিন্তু তাদের দেখেই মালিকদের রক্ত মাথায় চড়ে যায় এবং তাদের মারতে শুরু ক'রে দেয়। এতদিন এই কুলিদের নিয়ে ঘর ক'রেও, এরা এদের আজও চেনে না। অকারণে নিজেদের আয়ু নিজেরাই টেনে ছিঁড়ে ফেলছে···

লাইব্রেরি ঘরের ভেতর থেকে টলতে টলতে বেরিয়ে এসে হিচকক্ সামনে ম্যাকেরাকে দেখেই বলে ওঠে: 'এই যে ম্যাক্, বাঃ! দিবিা মেজে ঘষে ফুট্‌ফুটেটি হয়ে আছ দেখছি!'

সারা রাত্রির অনিদ্রা এবং সুরাপানে হিচককের চোখ-মুখ ফোলা ফোলা দেখাচ্ছিল।

ম্যাকেরা তিক্তকণ্ঠেই উত্তর দেয়:

'মদ খেয়ে তোমার মাথার ঠিক নেই, যা তা বক্‌ছো!'

টুইটি ঘাড় তুলে হিচককের দিকে চেয়ে বক্রোক্তি ক'রে ওঠে:

'সাবধান হিচকক্! ম্যাকেরা তোমার ওপরের অফিসর! বড় অফিসরের সঙ্গে যদি বেচাল কিছু করো, যুদ্ধের আইন মাফিক ছ লা হাভরের সঙ্গে সঙ্গে এক্ষুনি তোমারও কোর্ট-মার্শাল হয়ে যাবে···'

কথাটার জবাব ক্রুক্‌টুকুক্ই দেয়: 'শোন টুইটি, তোমার বন্ধুর সম্পর্কে আমরা যথেষ্ট সদয় ব্যবহার ক'রে এসেছি। তার প্রতিদান স্বরূপ, তিনি কাল কুলিদের খেপিয়ে আমাদের খুন করতে পাঠিয়েছিলেন। সুতরাং তাঁর প্রাপ্য তাঁকে হাতে-নাতেই চুকিয়ে দেওয়া হবে। তিনিই এই দাঙ্গা সৃষ্টি করেছেন, আমি করি নি। আর এই সব ঝামেলা—'

ক্রফ্‌ট্‌কুক্‌ রাগে কথা আর শেষ করতে পারে না। সারারাত ধরে এই ঝামেলার কথা ভাবতে ভাবতে তার কল্পনায় সমস্ত ব্যাপারটা একটা বিরাট বীভৎস আকার ধারণ ক'রে উঠেছে। অফিসের সমস্ত কাজ-কর্ম বন্ধ। তার সমস্ত জীবন ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে বাঁধা। প্রতিদিন সকালে উঠে প্রাতরাশ সেরে নিয়মিত সে তার অফিসের চেয়ারে গিয়ে বসে। কোথায় এখন অফিসে গিয়ে ডাক দেখবে, না, তার জায়গায়, সকাল বেলা এই ক্লাবে বসে! তার অভ্যস্ত জীবনধারার মধ্যে এই আকস্মিক ছেদ, এইটেই তার মনের আড়ালে তাকে রীতিমত পীড়িত ক'রে তুলছিল। হয়ত সামনের 'ব্যালান্সশীট'-এ এই হাঙ্গামার দরুন লাভের অঙ্কগুলোর চেহারা বদলে যাবে···

ম্যাকেরা চীৎকার ক'রে ওঠে: 'ছ লা হাভর বিশ্বাসঘাতক, দলের শত্রু। কাল রাত্তিরে আমরা সবাই এখানে ক্লাবে রইলাম, ও কেন আমাদের সঙ্গে রইলো না? অন্য সময় হলে, গুলি ক'রে ওর তেজ বার ক'রে দিতাম।'

ম্যাকেরার কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা ভয়াবহ নীরবতা যেন সকলকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলে। নিজের অস্বস্তি দূর করবার জন্যে হিচকক্‌ আপনার মনে শিস দিতে থাকে।

এমন সময় হঠাৎ তাদের জানলার জালের ভেতর থেকে এরোপ্লেনের এঞ্জিনের আওয়াজ এসে পৌঁছোয়।

ম্যাকেরা, র‍্যাল্‌ফ্‌, হার্স্ট ছুটে বারাণ্ডার দিকে যায়।

হাতের ছাতা দোলাতে দোলাতে মিসেস্‌ ক্রফ্‌ট্‌কুক্‌ উল্লাসে চীৎকার করতে করতে সেই দিক্‌ থেকে এগিয়ে আসছিলেন:

'এরোপ্লেন এসেছে—এসেছে এরোপ্লেন!'

ম্যাকেরার কণ্ঠস্বরে আনন্দ ফেটে পড়ে। উল্লাসে আদেশ করে: 'এ্যাটেন্‌শন্‌!' যেন এখুনি যুদ্ধ আরম্ভ হবে!

আকাশের দিকে ঘাড় তুলে, ক্রফ্‌ট্‌কুক্‌ হাত নাড়তে নাড়তে চীৎকার ক'রে ওঠে: 'বাঁচা গেল এতক্ষণে!'

আর. এ. এফ্-এর বোমারু প্লেন গতি সংযত ক'রে ঘুরতে ঘুরতে পোলোর মাঠের ওপর নেমে আসে।

রুক্‌টুকুক্ বারাণ্ডা দিয়ে নীচে নামে। এই নিদারুণ সামরিক পরিস্থিতি সত্বেও, মহিলারা এতক্ষণ পাউডার আর রুজ নিয়ে প্রাভাতিক প্রসাধনে ব্যস্ত ছিলেন। প্রসাধন অন্তে, বাতাসে সুগন্ধ ছড়াতে ছড়াতে হাস্যমুখে তাঁরা ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েন। জানলার তারের ফাঁক দিয়ে উদ্‌গ্রীব আগ্রহে পোলো-মাঠের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করেন।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে টুইটি আপনার মনে বলে ওঠে : 'এ যেন আলকা-জারের অবরোধ-শেষের দৃশ্য!'

স্থির বদ্ধদৃষ্টিতে পোলো গ্রাউণ্ডের দিকে চেয়ে ভাবে, এই এরোপ্লেন আসার আনন্দের পেছনে রয়েছে কি নিদারুণ ঘৃণার বাণী-হীন বিজয়োল্লাস। মানুষের বিজ্ঞান-সাধনার এই প্রত্যক্ষ দান, মানুষের আকাশ জয়ের এই প্রতীক, কি হীন প্রয়োজনেই না তাকে মানুষ মারাত্মক ক'রে তুলেছে। সে নিজে একজন যন্ত্রবিদ্। দূর থেকে প্লেনটির নিখুঁত গড়ন দেখে উল্লসিত হয়ে ওঠে তার মন।

বিমান-পরিচালক অফিসারটি লাফিয়ে বিমান থেকে নেমে সামরিক কায়দায় ম্যাকেরাকে অভিবাদন জানায়। মেজর ম্যাকেরা তাকে সঙ্গে ক'রে ক্লাবের দিকে এগিয়ে আসে।

চলতে চলতে অফিসারটি বলে : 'ঠিক এসে পৌঁছেছি, স্যার···তবে এখানে নামাটা খুব সহজ নয়···অনেকক্ষণ দেখতেই পাই নি···তবে পেছনে যে চার খানা বোমারু প্লেন আসছে তাদের কোন অসুবিধা হবে না। তাতে একজন এন্. সি. ও-র অধীন ইয়র্কশায়ার লাইট ইন্‌ফ্যানট্রির একটা দল আসছে··· আর ইষ্টার্ণ ফ্রন্টিয়ার রাইফেল্‌স্-এর দুটো কোম্পানী জি. ও. সি-র আদেশে এসে পড়লো বলে।

বিরাট যুদ্ধের সম্ভাবনার উত্তেজনায় ম্যাকেরা উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে।

'হ্যাণ্ট, তাড়াতাড়ি ব্রেকফাস্টের বন্দোবস্ত ক'রে ফেল। এখুনি প্লেন গুলোও এসে পড়বে, আসার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা ঘটনাস্থলে মার্চ ক'রে যাবো' —আদেশ দেয় মেজর ম্যাকেরা।

॥ কুড়ি ॥

সমস্ত উপত্যকা-ভূমিকে পরিব্যাপ্ত ক'রে প্রথম প্রভাতের যে ম্লান কুয়াশা নেমেছিল, উদিত-সূর্যের খর-আলোকে দেখতে দেখতে তা উবে গেল। মুক্ত স্বচ্ছ আকাশের তলায় বাতাস স্পন্দনহীন, স্থির। ঘন পল্লবপুঞ্জ রুদ্ধ আবেগে মহাশূন্যের দিকে চেয়ে আছে। দিবসের মন্থর হৃদয়ে নিস্তব্ধতা ঘনীভূত হয়ে উঠেছে, যেন চলতে চলতে মহাকালের চক্র-আবর্তনে জীবনের একটি হৃদ্-স্পন্দন সহসা গিয়েছে হারিয়ে।

হঠাৎ তার মধ্যে, ঘন লতাগুল্মের অন্তরালে অসংখ্য পতঙ্গের মিলিত ধ্বনির মত ক্রমান্বয় একটা শব্দ জেগে ওঠে। তার পর, সমস্ত বাতাস যেন নিমেষের মধ্যে মাতাল হয়ে ওঠে। একটা উন্মাদ আর্তনাদ পর্বতচূড়া থেকে উপত্যকা-ভূমি পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে আগুনের ফুলকি ছড়িয়ে পড়ে। যেন চা-বাগানের মালিকদের পরিবেশিত কোন্ এক সংগোপন বিষ-রসে অরণ্যবাসী কোটি কোটি কীট-পতঙ্গ সশব্দে একসঙ্গে ফেটে পড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। সেই শব্দের প্রতিধ্বনি শুনে মনে হয় কে যেন বলিষ্ঠ নিষ্ঠুর হাতে ছিঁড়ে ফেলে দিল আকাশের প্রান্তবাস।

প্রথম এরোপ্লেনটা বোমা ফেলেছে। আকাশে ধোঁয়া কুণ্ডলীতে তার চিহ্ন তখনও দেখা যাচ্ছে। তার পেছনে যে এরোপ্লেনটা ছিল সেটা মাথার ওপর দিয়ে উড়ে চলে গেল। তার পর একটা। আর একটা। কুলিদের মাথার ওপর ক্রুদ্ধ পক্ষীর মতন তারা ডানা মেলে সশব্দে ঘুরে বেড়াতে লাগলো।

ভয়-বিস্ফারিত চোখে কুলিরা বোমার সধূম ভগ্নাংশগুলি এড়িয়ে চলে। ঘাড় বেঁকিয়ে চোখেতে হাত ঠেকিয়ে ঊর্ধ্বে চেয়ে দেখে। দানবীয় শক্তির সেই অন্তর-বিদারণ মৃত্যু-সঙ্গীতে মূহ্যমান স্থির হয়ে যায়। শয়তান ছাড়া, একাজ আর কারুর দ্বারা সম্ভব নয়, এই কথাই তারা মনে মনে স্থির ক'রে নেয়। ভয়ে, বিস্ময়ে পরস্পর পরস্পরের দিকে চায়। সে চাউনির পেছনে কেঁপে ওঠে মমতা।

ধ্বংসের সুতীব্র উল্লাসে, নানা ভঙ্গী অঙ্কিত ক'রে ঘুরে বেড়ায় সশব্দে লৌহ বিহঙ্গমের দল।

আতঙ্কে অস্থির হয়ে ওঠে কুলিদের অন্তরাত্মা।

একজন বৃদ্ধ কুলি বলে ওঠে :

'সেকালে গল্পে শুনেছি ধোঁয়া থেকে দানবরা মূর্তি ধরতো, এ দেখছি তাই...'

হঠাৎ একটা এরোপ্লেনকে ডুব দিয়ে তীব্র বেগে নীচের দিকে ছুটে আসতে দেখে, একটা কুলি-কামিন্ ভয়ে আর্তনাদ ক'রে ওঠে : 'ও মাগো! হায়! হায়!'

এরোপ্লেনটা আবার ভেসে উঠে ওপর দিকে চলে যায়।

মেয়েটির পাশে একটা ছোট ছেলে দাঁড়িয়ে ছিল। সে-ও চীৎকার ক'রে কেঁদে ওঠে।

কুলি-ধাওড়ায় মহা-আতঙ্ক পড়ে যায়। যে যেমন অবস্থায় ছিল, ঘর ছেড়ে দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে বেরিয়ে পড়ে।

গঞ্জু একবার তার এক দূর সম্পর্কের ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে এক তাঁবুদার শহরে গিয়েছিল। সেখানে এরোপ্লেনের কথা শুনেছিল কিন্তু এর আগে কোনদিন স্বচক্ষে আর দেখে নি। ঘাড় নেড়ে সকলকে আশ্বস্ত করতে চেষ্টা করে : 'ওগুলো হলো উড়ন্ত গাড়ী। ওতে এক-একজন ক'রে সাহেব বসে আছে।'

কাছেই একজন বৃদ্ধা দাঁড়িয়ে শুনছিল। বিস্মিতকণ্ঠে প্রতিবাদ ক'রে ওঠে :

'কি বলছো গা, সাহেব আছে? কই দেখতে তো পাচ্ছি না। সে কি কখনো হয় নাকি? থাকবে কি ক'রে গা? বুঝছো না, উ হলো দত্তি-দানা··· হেই দাদা, নিজের চোখে দেখলুম, শোঁ শোঁ ক'রে পাহাড় দিক্‌ থেকে ইধার উড়ে এলো।

গম্ভীরভাবে নারাণ বলে: 'সত্যিই দত্যি-দানা···দাঁড়িয়ে দেখছো কি? ওতে সব বোমা আছে, একটা একটা ক'রে এক্ষুনি পড়বে··· যদি বাঁচতে চাও, যেদিকে পার লুকিয়ে পড়। পালাও!'

সঙ্গে সঙ্গে ভুটিয়া কুলিটা চীৎকার ক'রে উঠলো:

'পালাও, পালাও নীচের দিকে!'

'পালাও! পালাও!' গোরখপুরী কুলি চেঁচিয়ে উঠলো।

মেয়েরা কেঁদে উঠলো: 'হায় হায় বাবা! হায়! দাদা।'

পুরুষরা মাথায় হাত দিল, সর্বনাশ!

ভীত, সন্ত্রস্ত যে যেদিকে পারলো, ছুটতে আরম্ভ করলো।

তার মধ্যে থেকে গঙ্গু চেঁচিয়ে উঠলো: 'ভাই সব, চল দিলওয়ার সাহেবের কাছে যাই!'

কিন্তু কেউ শুনলো না সে-কথা।

যে যে-দিকে পারে, আত্মরক্ষার জন্য তখন ছুটতে আরম্ভ করেছে। ছেলে-মেয়েদের মায়া যারা ভুলতে পারে না, তারাই শুধু পিছু পড়ে থাকে। মাথার ওপর যমরাজ ঘুরে বেড়াচ্ছে, তবুও তারা হন্তদন্ত হয়ে খুঁজে বেড়ায় তাদের ছেলেমেয়েদের।

দেখতে দেখতে লোহার শকুনগুলো ছোঁ মেরে কুলি-লাইনের একেবারে ছাদের ওপর দিয়ে চলে গেল।

চারিদিকে অসহায় আর্তনাদ···যেন হঠাৎ নরকের দ্বার খুলে গিয়েছে।

এরোপ্লেনগুলো এবার দুলতে দুলতে নীচে থেকে ওপরের দিকে উঠে যায়। কিন্তু কুলিদের বুকের কাঁপুনি থামে না।

বুদ্ধু আর লীলাকে খুঁজতে গিয়ে গজু দেখে শীর্ণদেহ এক কুলি-কামিন ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে আর চলতে না পেরে মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেল। তাড়াতাড়ি তার পাশে গিয়ে হাতের নাড়ী তুলে ধরে দেখে, তাতে কোন স্পন্দন নেই। মরে গিয়েছে। পেটের বর্ধিত আয়তন থেকে গজু বুঝতে পারে মেয়েটি গর্ভবতী ছিল।

গজু আপনার মনে বলে ওঠে: 'ছুটি· ভালই হয়েছে, রোজ রোজ তিল তিল ক'রে শুকিয়ে মরার চেয়ে, এ ভাল···একদম ছুটি!'

কালবিলম্ব না ক'রে নিজের ঘরের দিকে ছুটে চলে। বাড়ীর কাছে এসে দেখে, বুদ্ধু আর লীলা ভয়ে হাঁ ক'রে আকাশের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

'চলে আয়!'

রাস্তা থেকেই তাদের ডেকে নেয়। কিন্তু চলে যে কোথায় যাবে, তা ভেবে ঠিক করতে পারে না।

এমন সময় শোনে নারাণের গলার আওয়াজ। সে চেঁচাচ্ছে: 'দিলওয়ার সাহেব এসেছে! দিলওয়ার সাহেব! ভয় নেই, এদিকে আয়, এদিকে···'

গজু চেয়ে দেখে, অদূরে ডা লা-হাভরের মূর্তি, তাদের দিকেই এগিয়ে আসছে। ছেলেমেয়েদের হাত ধরে সে সেইদিকে ছুটতে আরম্ভ করে। দিলওয়ার সাহেবের মুখের দিকে চেয়ে দেখে, একমাত্র সেই মুখে ভয়ের কোন চিহ্ন নেই।

চীৎকার ক'রে ডা লা হাভর সবাইকে ডাকে: 'আমার সঙ্গে এসো, কোন ভয় নেই, কেউ তোমাদের ছুঁতে পারবে না! এসো, আমার সঙ্গে!

ভুটিয়া কুলি চীৎকার ক'রে সবাইকে জানিয়ে দেয়: 'দিলওয়ার সাহেব, দিলওয়ার সাহেব ডাকছে, চলে আয় এদিকে···'

গোরখপুরী ডা লা হাভরের পাশে এসে ঘেঁষে দাঁড়ায়। তখন আশ্বস্ত হয়ে অন্য সবাইকে ডাকে: 'ভয় নেই, ছুটতে হবে না, এদিকে, এই দিকে আয়!'

দেখতে দেখতে একদল কুলি ডা লা হাভরকে ঘিরে দাঁড়ায়।

তাদের নিয়ে স্তু লা হাভর রাস্তা দিয়ে অগ্রসর হয়। অতি সন্তর্পণে পা ফেলে চলতে হয়, পায়ে পায়ে ভীত ক্রন্দনরত ছোট ছেলের দল জড়িয়ে যায়। সমস্ত দেহ তার যেন কাঠ হয়ে গিয়েছে···ক্লান্ত কিন্তু একমাত্র সান্ত্বনা সে নিজের স্বার্থের জন্যে এ পথে নামে নি। মানুষের মুক্তি, তার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, অপমানিত মানবতা, তারই মর্যাদা রক্ষা করবার জন্যে সে এগিয়ে চলেছে। এতগুলি মানুষের জীবন তার উপর নির্ভর করছে। হয়ত যে আদর্শের জন্যে সে জীবন উৎসর্গ করেছে, আজ এই মুহূর্তে মনে হতে পারে যে জগতে তার কোন অস্তিত্বই বুঝি নেই কিন্তু তবুও তার মনের কোণে তখনও এ বিশ্বাস সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হয় নি যে, একদিন না একদিন কোন না কোন সার্থকতায় আবার তা পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠবে।

খানেক গজ যেতে না যেতে রাস্তার অপর দিকে তারা দেখে খাকী-পরিহিত একদল সৈনিক সেই দিকেই আসছে।

হঠাৎ স্তু লা হাভরের মাথার ওপর দিয়ে সশব্দে কতকগুলো গুলি ছুটে চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তার পেছনের সার-বাঁধা কুলির দল ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়লো। আত্ম-সংবরণ করতে না করতে পায়ের কাছে খানিকটা মাটি উড়িয়ে আর একটা গুলি এসে পড়লো।

ম্লান বিবর্ণ সে দাঁড়িয়ে পড়ে। মনে হয় যেন তার হৃৎপিণ্ড ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। চোখের সামনে সমস্ত পৃথিবী অন্ধকারে হারিয়ে যায়। সেই অন্ধকারের পর্দা ঠেলে দেখে, ম্যাকেরা আর ক্রুক্‌ট্রুক্‌ একদল বৃটিশ টমী নিয়ে তার দিকেই এগিয়ে আসছে। পেছনে তখন কান্নার আর চীৎকারে আর টুকরো টুকরো আর্তনাদে ভীত সন্ত্রস্ত কুলির দল ছুটছে পড়ছে পালাচ্ছে···

সামনের দিকে চোখ চেয়ে সে দাঁড়িয়ে থাকে কিন্তু কিছুই দেখতে পায় না···আতঙ্ক···এক মহা-আতঙ্কে বাতাস পর্যন্ত যেন স্থির হয়ে গিয়েছে।

কানে এসে পৌছল ম্যাকেরার আদেশ: 'হল্ট্‌! স্ট্যাণ্ড এ্যাট্‌ইজ্‌!'

যে শাণিত-শক্তি একদিন এই সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল, সেই মুহূর্তে ম্যাকেরার প্রতিমূর্তিতে যেন তা সজীব হয়ে তার সামনে এসে দাঁড়ালো।

কয়েক পা এগিয়ে এসে ড লা হাডরকে আহ্বান ক'রে ম্যাকেরা হেঁকে উঠলো: 'এই—ইয়ু ফুল্...শোন...এইমুহূর্তে তোমাকে এবং তোমার পেছনে যাদের নিয়ে এসেছ, সবাইকে গুলি ক'রে মেরে ফেলতাম... যদি না তোমার চামড়ার রঙ আমাদেরই মতন শাদা হতো। ভাল চাও তো, ওসব মতলব ছেড়ে দাও।'

সঙ্গে সঙ্গে রুক্‌টুক্‌ হাত তুলে গর্জন ক'রে ওঠে: 'এই মুহূর্তে তোমাকে বরখাস্ত করলাম...যাও...'

ড লা হাডর বিস্ময়ে মূক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। উত্তর দেবার মত কোন কথাই সে খুঁজে পায় না।

ভিড় ঠেলে এগিয়ে এসে রেগী হার্ট বলে ওঠে: 'তোমার বরাত ভাল যে, এখনও তুমি জ্যান্ত দাঁড়িয়ে আছ!'

হঠাৎ ড লা হাডরের সমস্ত মুখ আরক্তিম হয়ে ওঠে। ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে রেগীর দিকে ঘাড় তুলে চায়। কিন্তু পরমুহূর্তেই ঘাড় নীচু ক'রে মাটির দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়।

ম্লান হেসে মৃদু কণ্ঠে শুধু বলে ওঠে: 'সব শেষ!'

'তোমারও!' ম্যাকেরা ব্যঙ্গ ক'রে ওঠে। তার পর সৈন্যদের দিকে ফিরে হুকুম করে: 'কুইক্ মার্চ!'

॥ একুশ ॥

সেই অতি-পরিচিত পথ ধরে ড লা হাডর রুক্‌টুকের বাংলোর দিকে অগ্রসর হয়ে চলেছে। সে জানে, এই পথে এই তার শেষ পা-ফেলা। কিন্তু পথ কি সে-কথা জানে? সে ভেবেছিল, তার মনের রঙের পরিবর্তনের সঙ্গে

সঙ্গে, হয়ত এ-পথও পরিবর্তিত দেখাবে! চারিদিকে চোখ তুলে দেখে, তেমনি পড়ে আছে চারিদিকের গাছ-পালা, উদাস উদাসীন...এমনিই অপরিবর্তনীয় থাকবে পড়ে, যতক্ষণ না একটা কোন ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয় কিংবা ভূমিকম্প এসে গ্রাস ক'রে নেয়...এমনি থাকবে শেষ-বিচারের চরম দিন পর্যন্ত...যেদিন মেদিনী বিদীর্ণ হয়ে সমস্ত পাপীকে গ্রাস ক'রে নেবে। তবে সাধারণ ছায়াচিত্রে বা নাটকে প্রেম-পীড়িত হতভাগ্য নায়কের অন্তরে হা-হুতাশের যে বিপুল বেদনার আলোড়ন দেখা যায়, ঠিক সে-ধরনের কোন লক্ষণ তার মনের মধ্যে অনুসন্ধান ক'রে সে খুঁজে পায় না। তবু তার মনের মধ্যে, বার বার একটা করুণ আত্ম-নিগ্রহের স্বর গুঞ্জন ক'রে উঠছিল, বার বার তাকে জোর ক'রে চেপে রাখে। অস্পষ্ট অনুভূতির অন্তরাল থেকে একটা কথা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে, বাবুবারার সঙ্গে হয়ত জীবনে আর দেখা হবে না।

মনের সব এলোমেলো ভাবনাকে একত্র ক'রে আনতে চেষ্টা করে কিন্তু সব মনে হয়, আবছা অসম্পূর্ণ। এই যে হঠাৎ জীবনে পরিবর্তন ঘটে গেল, তার স্বরূপ বোঝবার জন্য প্রাণান্ত চেষ্টা করে।...যদিও মাঝে মাঝে সন্দেহ এসেছে, তর্ক হয়েছে, দু'জনের মধ্যে নানা মত নিয়ে নানা দ্বন্দ্ব হয়েছে, তবুও বাবুবারা তারমধ্যে মনের আনন্দে দুষ্টুমি ক'রে বেড়িয়েছে, বাক্যে বিদ্রূপে হাসিয়েছে, হেসেছে; তার মগজ যতখানি ছিল হাল্কা, শূন্য, চোখ দুটো ততখানি ছিল ভরাট, আনন্দের আলোতে ভরাট। হাসিতে খুশীতে, প্রীতিতে, প্রতিবাদে সবই ছিল সুন্দর, সম্পূর্ণ, মোহনীয়। দু'জনে মিলে সেদিনও স্বপ্ন দেখেছে তাদের ছোট্ট বাড়ীতে থাকবে একটি শান-বাঁধানো স্নানের ঘর... জীবনের সব চেয়ে সহজসাধ্য অনায়াস বিলাসিতা! এমন কি সকলের সঙ্গে সে-রাত্রিতে ক্লাবে বাস না করায় অপরাধে যেদিন সে দলচ্যুত একঘরে হয়েছিল, সেদিনও বাবুবারা এসে তার সঙ্গে দেখা ক'রে গিয়েছে।

তবে আজ কেন সে তার সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন ক'রে চিঠি লিখে পাঠালো? স্মিথ-এর বাড়ীতে সেদিন ককটেল-পার্টি ছিল। সেই পুলিসের বাড়ীতে

উৎসবে যোগদান করতে স্থ লা হাভর তাকে বারণ করেছিল, ভর্ৎসনা করেছিল। সেই জন্যে কি ? সত্যি, স্মিথের বাড়ীতে যাওয়ার কথা শুনে তার মনে একটু যে ঈর্ষা জাগে নি, তা নয়। হয়ত সে ইচ্ছা ক'রেই সেই ঈর্ষাটুকুকে তার সামনে তুলে ধরেছিল, যদি তাতে ক'রে তাদের বন্ধন আরও দৃঢ় হয় এই আশায়। কিন্তু আসলে তার মনে এই কথাটাই সেদিন সব চেয়ে বড় হয়ে উঠেছিল যখন সে চাইছে তাকে পেতে সন্ধ্যায় তার ঘরে একলা, সে-সময় সে কেন যাবে ছুটে পাগলের মতন পার্টিতে ? তাছাড়া, সে তো তার জন্তে ক্ষমা চেয়েছে ? আর যাবার অনুমতি তো শেষ পর্যন্ত সে দিয়েই ছিল ? তবে ?

স্থ লা হাভর দীর্ঘশ্বাস ফেলে ব'লে ওঠে, বদলে গিয়েছে বার্বারা ! হয়ত সব জিনিসই এমনি বদলে যায়। সব লোকই এমনি বদলায়। একটা তুচ্ছ কথা, একটা টুকরো ঘটনা, তুচ্ছতম একটা জিনিস, বাতাসে একটুখানি আলোড়ন, একটা দীর্ঘশ্বাস, মানুষ যায় বদলে তার মধ্যে···যেখানে ছিল না কেশ-পরিমাণ ব্যবধান, সেখানে দেখা দেয় দুস্তর সাগর। আকুল হয়ে ভাবে কেন এমন হলো ? কেন এমন হয় ?

স্মিথ সম্বন্ধে স্থ লা হাভরের ভর্ৎসনাকে বার্বারা কাজে লাগিয়েছে।

সেটা কারণ হিসাবে দেখালেও, স্থ লা হাভর জানে, সেটা শুধু একটা বাজে অজুহাত। স্থ লা হাভর সম্বন্ধে তাকে একটা শেষ সিদ্ধান্তে আসতে হবে। তার সমাজের সব লোক একদিকে হয়ে যাকে প্রত্যাখ্যান করলো, সে একা তাকে কি ক'রে গ্রহণ করতে পারে ? মাসের পর মাস, তার মা তাকে ভর্ৎসনা করেছে, স্থ লা হাভরের বিরুদ্ধে তার মনকে বিষাক্ত ক'রে তুলেছে। অবশ্য তখন বার্বারা চেষ্টা ক'রে সে-সব আঘাতের সঙ্গে যুঝেছে। আজ কেন যে সে হঠাৎ পরিবর্তিত হয়ে গেল, তার কারণ সে যে বুঝতে পারে নি, তা নয়। সে ঠিকই বুঝেছে। চিরকাল যে-সমাজে বার্বারা মানুষ হয়ে এসেছে ছেলেবেলা থেকে, যে-শিক্ষা পেয়েছে, তাতে একটা কথা সে জীবনের সারমন্ত্র হিসাবে জেনেছে, ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং নির্ভয় নির্ভরতা নারী-জীবনের

প্রধানতম কাম্য। তার যে স্বামী হবে, তার আয় এবং সামাজিক প্রতিপত্তি যদি সেই নির্ভরতা দিতে পারে, তাহলে জগৎ রসাতলে গেলেও কিছু যায় আসে না। যেদিন সে তার প্রেমে পড়েছিল, সেদিন এ-কথা সে ভাবতেই পারে নি যে স্ত লা হাভর তাকে সেই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দিতে পারবে না। তা ছাড়া সেদিন তার মা, তার আত্মীয়-স্বজন তাকে উত্যক্ত ক'রে তার প্রেমকেই বাড়িয়ে তুলেছিল। বাধা পায় বলেই প্রেম সুতীব্র হয়ে ওঠে। কিন্তু সেই সব বিরুদ্ধ সমালোচনা, আত্মীয়-স্বজনের হিতোপদেশ সমস্তই যা এতদিন তার মনের অবচেতন-লোকে সমাহিত হয়ে ছিল, আজ তারা সব সম্মিলিত বেগে অন্তরাল থেকে ওপরে ভেসে উঠেছে। তার সঙ্গে এসে সংযুক্ত হয়েছে, একটা ন্যায্য আক্রোশ যা তার আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকেই সংক্রামিত হয়ে তার কাছে এসেছে, কারণ যেদিন ক্লাবে তারা সকলে মিলে রাত্রিযাপন করেছিল, সেদিন স্ত লা হাভর তাঁদের সঙ্গ ত্যাগ ক'রে যে ঘোর অপরাধ করেছিল, তার জন্যেই সে আজ দলচ্যুত, একঘরে এবং তার জন্যেই সমাজের সমস্ত আক্রোশ তার বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। এই সমস্ত কারণ একসঙ্গে মিলে আজ বাবুবারাকে তার সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। স্পিথের ব্যাপারটা শুধু একটা অজুহাত মাত্র।

তার পাশ দিয়ে একজন কুলি মাথায় কাঠের বোঝা নিয়ে চলে গেল।

পথ চলতে চলতে সে আপনার মনে বলে ওঠে, নিশ্চয়ই, মস্তিষ্ক দিয়ে বিচার ক'রে দেখতে হলে, সমস্ত ব্যাপারটা খুব বেশী দুর্বোধ্য বোধ হয় না, কিন্তু সেইটেই কি শেষ কথা? হৃদয়ের দিক্ থেকে কি কিছু বলবার নেই? বাবুবারার প্রতি তার এই আকর্ষণ, কে বলবে তার পেছনে আছে উত্তাপ-বিজ্ঞানের কোন্ রহস্যময় সূত্র, আলোক-তত্ত্বের কোন্ আইন, চুম্বকত্বের কোন্ অপরিবর্তনীয় বিধান? সে আপনার মনে বিচার ক'রে দেখতে চেষ্টা করে যদি সত্যি বাবুবারা বুঝে থাকে যে তার উপযুক্ত সঙ্গী সে নয়, তাহলে তার প্রমাণ সে তার নিজের মনের মধ্যেই খুঁজে পেতো, সে-ক্ষেত্রে বাবুবারার সঙ্গ

বহু আগেই তার কাছে বিরক্তিকর হয়ে উঠতো। যদি তা না হয়, যদি অজিত বাবুবায়ার ভালবাসা তাকে আশ্রয় ক'রেই বেড়ে উঠে থাকে, যদি তার ভালবাসাও বাবুবারাকে আশ্রয় ক'রে বেড়ে উঠে থাকে, তবুও একথা সে জানে সামান্য একটু আবহাওয়ার তফাত, একদিনের একটুখানি পরিবর্তন, জীবনের ছন্দের সামান্য গরমিল, কোথায় একটুখানি চিড় হয়ত তাদের দু'জনকেই বদলে দিয়ে যেতে পারে। একমাত্র অপরিবর্তনীয় হলো তার অন্তরের অনন্ত কৌতূহল, জানবার অসীম পিপাসা। জগৎ ব্যাপারের সমস্ত রহস্যকে জানা, তাকে উপলব্ধি করা, সেই হলো জীবনের মূল কেন্দ্র, সেই থাক জীবনের মর্মমূলে!

তবুও, কোথা থেকে অন্তরের অন্তঃস্থলে জেগে ওঠে এক অব্যক্ত অস্বস্তি।

এমনি আলো-আঁধারে, সংশয়ের দোলায় দুলতে দুলতে সে এগিয়ে চলে।

পায়ের তলায় কাঁকর-বিছানো পথে গোধূলির আলো-ছায়া মায়ার জাল বুনে চলে। পায়ের দু'ধারে ঘনায়মান দ্রুত অন্ধকারে বর্শার ধারায় আহত হয়ে কেঁপে কেঁপে ওঠে বেতসের বন। স্তলা হাভরের মনে হয়, যেন সে দ্রুত এগিয়ে চলেছে সুগভীর এক অন্ধকার গহ্বরের মধ্যে, এখনি নিশ্চিহ্ন হয়ে চিরকালের মত হারিয়ে যাবে তার তলায়। চলতে গিয়ে হোঁচট খায়, আবার তৎক্ষণাৎ কোনরকমে সামলে নিয়ে আরও জোরে পা চালায় যেন তাকে ভূতে তাড়া ক'রে নিয়ে চলেছে। অন্তরের সমস্ত এলোমেলো চিন্তা-ধারাকে সংহত করবার চেষ্টা করে—একটা স্পষ্ট অভিব্যক্তি.ক আঁকড়ে ধরতে চায়। কিন্তু হায়, তার সব চেষ্টার আড়ালে, বারে বারে শুধু এই কথাই মনে হয়, সে অভিনয় করছে, আত্মপ্রবঞ্চনা করছে। ছেলেবেলায় কষ্ট হলে যেমন ডাকছেড়ে কাঁদতে পারতো, কই, এখন তো সে-রকম কাঁদতে পারছে না? যে-আবেগের আকর্ষণে চোখে টেনে আনে জল, নিজের অন্তরের অন্তঃস্থলে অবগাহন ক'রে দেখে কখন নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে সে-সহজ আবেগের স্বচ্ছধারা। পেছন দিকে চাইতে গিয়ে চোখে পড়ে নিজেরই বালকমূর্তি,

ইটনের স্কুলের বাঁধা-ধরা পোষাক পরে চলেছে স্কুলে। নতুন ক'রে নিজেকে যেন দেখতে পায় ধাপের পর ধাপ, একটু একটু ক'রে বড় হয়ে চলেছে…

দেখে, আবার লণ্ডনের রাস্তা দিয়ে চলেছে, বিস্ময়ে দু'টি বড় বড় চোখ বিস্ফারিত, অফুরন্ত কৌতূহল ভরা, দু'পাশের সমস্ত জিনিসকে যেন দৃষ্টি দিয়ে গ্রাস ক'রে চলেছে। মনে পড়ে, নিজের খেয়ালে তখন চেল্‌টেনহামের আশে-পাশের বনে বেড়াতে যেতো, প্রজাপতি সংগ্রহের জন্ত। সেই বনেতে, সোজা খাড়া চুল একজন রুশিয়ান বৈজ্ঞানিক জলেতে একরকম ছোট জাল ফেলে পোকা-মাকড় ধরতো, সেই দেখেই প্রাণীতত্ত্ব সম্বন্ধে তার ঔৎসুক্য জাগে। এবং সেইখান থেকেই শুরু হয়, প্রাণীতত্ত্ব সম্বন্ধে তার জীবনব্যাপী অনুসন্ধিৎসা।

সহসা তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে তার বাবার ছবি, মদের নেশায় ভরপুর, মুখে পাইপ, কোলের ওপর একটা বই-এ মাথা গুঁজে বসে আছেন। মনে পড়ে, বৃদ্ধকে সে কতখানি ভয় করতো, অথচ তাঁর কাছে যাবার জন্তে, তাঁর মুখে ভারতবর্ষের গল্প শোনবার জন্তে কি আগ্রহই না ছিল তার! তাঁর মুখে ভারতবর্ষের গল্প শোনবারই ফলেই সে আজ এখানে এসেছে। তার বাবা ছিলেন জবরদস্ত আই. সি. এস অফিসার। তিনি যদি আজ জানতেন যে তাঁর ছেলে ভারতবর্ষে এসে কি করেছে, তাহলে তিনিই তাঁর ছেলেকে ঘৃণায় দেশদ্রোহী বলে ত্যাগ করতেন!

আইনের যে লৌহ-চক্রের উপর ভর ক'রে আছে বৃটিশ আমলাতন্ত্রের বিরাট যন্ত্র-দেহ, যার নির্মম নিষ্পেষণে চূর্ণ হয়ে যায় সব মানবতা-বোধ, জীবন-ভোর তারই একনিষ্ঠ সেবায় তাঁর সব সূক্ষ্ম অনুভব-শক্তি খর্ব হয়ে গিয়েছিল, আজ সেকথা স্ত না হাডর স্পষ্ট বুঝতে পারে। বাপের মুখ থেকে যে ভারতবর্ষকে সে জেনেছিল, নিজের চোখে দেখলো তা সম্পূর্ণ বিপরীত। ভারতবর্ষের সঙ্গে এই প্রত্যক্ষ পরিচয়, তার সমস্ত অন্তরকে আজ বদলে দিয়েছে।

মনে পড়ে তার ছাত্রাবস্থার প্রথম দিনগুলোর কথা। ডাক্তারী পড়তে তার আদৌ ভাল লাগতো না। অবসর পেলেই, তার কাজ ছিল পুরনো বই-এর প্রথম সংস্করণ খুঁজে বেড়ানো এবং বিচিত্র বিষয় নিয়ে উদ্ভট কবিতা রচনা করা। কিন্তু বাপের অনবরত ভর্ৎসনার ফলেই, ডাক্তারী তাকে পড়ে শেষ করতে হয়, নতুবা যৌবনের সমস্ত উদ্যমই হয়ত বিপথে নষ্ট হয়ে যেতো।

এবং সব চেয়ে বড় কথা হলো, ভারতবর্ষে না এলে সে কিছুতেই বুঝতে পারতো না যে ডাক্তারী বিদ্যার আজ কতখানি সার্থকতা। মৃত্যুর শেষদিন পর্যন্ত সে ভুলতে পারবে না, লাহোরের পথে পথে তার টোঙ্গার পেছনে পথ-ভিক্ষুকদের সেই অবিরাম অনুনাসিক ক্রন্দন, 'ভুঁখে মরে বাবা, ভুঁখে মরে'— যেন অষ্টপ্রহর একটা গাড়ী-চাপা-কুকুর-ছানা কেঁউ কেঁউ ক'রে চলেছে। টোঙ্গার পেছনে যখনি চেয়ে দেখেছে, দেখেছে একপাল ভিখিরী ছেলে হাত পেতে ছুটতে ছুটতে আসছে, একটি পয়সার জন্যে। সেই সব কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত, উই আর উকুনের জীবন্ত বাহক, শতছিন্নবাস নোংরা ভিখারীদের দেখে স্বেচ্ছায় তখন মুখ ঘুরিয়ে নিতো—পথের দু'ধারে ধুলোয় ধূসর সেই সব ভিক্ষুকদের চরম দৈন্যের ভয়াবহ বীভৎস মূর্তি অনুকম্পার বদলে তার অন্তরে জাগিয়ে তুলতো এক নিদারুণ লজ্জা।

তার পর ঝিলামে আর এখানে, পুরো দু'টি বৎসর কেটে গিয়েছে, মনের খোরাক মেটাবার জন্যে একখানি বই পাবার সম্ভাবনাও নেই, গবেষণার যন্ত্র-পাতির চিহ্নমাত্র নেই, য়ুরোপের প্রতিদিনের জীবন থেকে সর্ব-রকমে চ্যুত-সম্পর্ক, একক নিশ্চল জীবন···

তার পরে এলো বারবারা।

অব্যক্ত যন্ত্রণার ভারে মস্তিষ্ক যেন মুহ্যমান হয়ে আসে। সেই ঘনায়মান অবসাদকে গা থেকে ঝেড়ে ফেলার জন্যে দ্রুত অঙ্গ-সঞ্চালনের চেষ্টা করে। দাঁতে দাঁত চেপে, চোয়ালের হাড় শক্ত ক'রে সে চীৎকার ক'রে বলে উঠতে চায়, বলে উঠতে চায় তার অন্তরের অন্তরতম যা সত্য। কিন্তু পরক্ষণেই

আত্মসচেতন হয়ে পড়ে, নিজেকে মনে হয় যেন ডনকুইকজোট··· অদৃশ্য অবাস্তব শত্রুর সঙ্গে লড়াই করতে চলেছে। হাস্যকর! সমস্ত দেহ অবশ হয়ে আসে। ভয় হয়, বুঝি বা এই ব্যর্থতা তাকে উন্মাদ ক'রে দেবে!

দূরে দিকচক্রবালে আঁধার রজনীর মমতাময়ী আভা নিবিড় হয়ে ওঠে··· তুষার-শুভ্র হিমালয়ের চূড়ায় চূড়ায় কে যেন ঘন মরকত নীল মাখিয়ে দিয়ে যায়। চারিদিক্ থেকে দৃষ্টির অগোচর সেই শ্যাম অরণ্যের অযুত অধিবাসীদের মিলিত হৃদ্-স্পন্দনের শব্দ উঠছে মথিত গুঞ্জরনের মত···অন্ধকারে গিরি-নির্ঝরিণীদের সবেগ জল-কল্লোলে সমস্ত উপত্যকা-ভূমির বায়ু উচ্চকিত হয়ে উঠছে···ডু লা হাভরের অন্ধকার-আহত দৃষ্টি রাত্রির গভীরতার মধ্যে হারিয়ে যায়। অরণ্যের বুক থেকে প্রেত-নিঃশ্বাসের মত এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া তার হাড়ে কাঁপন ধরিয়ে দেয়। ডু লা হাভর সচকিত হয়ে ওঠে। নাসারন্ধ্র বিকুঞ্চিত ক'রে গভীরভাবে সেই নিশিগন্ধী বায়ু নিঃশ্বাসে গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে আশ্বাস দেবার একটা প্রাণান্ত চেষ্টা করে। কিন্তু বুঝতে পারে যে-স্থৈর্য হারিয়ে ফেলেছে, তাকে এত সহজে আর আয়ত্ত করা সম্ভব নয়।

লক্ষ্যহীনভাবে চারপাশে দৃষ্টিপাত করতে করতে মাঠের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলে··· অস্থির, উত্তেজিত-চিত্ত···

হঠাৎ ক্রফ্‌ট্‌কুকের বাড়ীর সামনের ঘন-লতাগুল্ম ভেদ ক'রে তার নজরে পড়ে, বারাণ্ডায় সোনালী দীপদানে আলো জ্বলছে···

যে লক্ষ্যের উদ্দেশ্যে সে হাঁটতে শুরু করেছিল, আর কয়েক পা এগিয়ে গেলেই সেখানে গিয়ে পৌঁছবে। কিন্তু তার দ্বার-দেশে পৌঁছে তার মনে হলো, নিরর্থক, নিরর্থক তার এই চেষ্টা। ফিরে যাওয়াই ভাল। ক্ষণকালের জন্যে তার মনে হলো যেন সমস্ত জগৎ থেকে সে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে, সে স্বতন্ত্র, একক। কিন্তু বাবুবারার সঙ্গে দেখা না ক'রে তো সে আসাম ত্যাগ করতে পারে না। জীবনের পরম পরাজয়কে বীরের মত যারা হাসি দিয়ে

অভ্যর্থনা করতে পারে, সে নিজেকে সেই দলের একজন ব'লে ধরে নেবার যে প্রাণান্ত চেষ্টা করছিল, বুঝতে পারে সে শুধু তার মৌখিক চেষ্টা, আত্ম-প্রবঞ্চনা। নিজের অন্তরের কাছে যদি অকপটে নিজেকে ধরা দিতে হয়, তাহলে এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, তার অন্তর শুধু চায় সেই একটি তরুণীকেই। সে যাই হোক, সে যাই করুক, সেই তার নারী, তাকেই সে পত্নীরূপে জীবনের সাথী ক'রে পেতে চায়। একবার তার দিকে চেয়েই তার অন্তরে এমন এক অনির্বচনীয় কোমলতার উদ্রেক হয়েছে, যা এখানকার আর কারুর সংস্পর্শে সম্ভব হয় নি। আজ সে তারস্বরে, সমগ্র জগতের উপহাসকে উপেক্ষা ক'রে, শুধু এই কথাটাই ঘোষণা করতে পারে, বাব্বারাকেই সে চায়। একদা তপ্ত আলিঙ্গনের মেদুর মুহূর্তে, যখন সান্নিধ্যের উদগ্র নেশায় পরস্পর পরস্পরের মধ্যে নিঃশেষে গিয়েছিল হারিয়ে, যে-প্রেম-শপথ সে গ্রহণ করেছিল আজ দেখে তা' স্রোতের ফুলের মতন তার অন্তরে কামনার অগ্নিধারার তরঙ্গের চূড়ায় চূড়ায় ভেসে চলেছে। মনে পড়ে ব্রাউনিং-এর কথা, একটু অদলবদল ক'রে বাব্বারা তাকে বলেছিল, যতদিন তুমি থাকবে তুমি, আমি থাকবো আমি, যতদিন এই পৃথিবী আমাদের দু'জনকে একসঙ্গে রাখবে ধরে, ততদিন কোন শক্তি নেই যা আমাকে কেড়ে নিতে পারে তোমার কাছ থেকে। বিমুগ্ধ আনন্দে তার চোখের ওপর চোখ রেখে সেদিন সে শুধু বলেছিল, রানী, আমিও ভালবাসি···তার উত্তর দিয়েছিল বাব্বারা, ওগো, আমার জন্যে তোমার এই ভালবাসার আলো, আলো ক'রে দিয়েছে আমার মন! ভাবতে বড় আশ্চর্য লাগে, আমার জন্যেই তুমি ছিলে! বাব্বারার সেই অকুণ্ঠ সারল্য তার ভীরু প্রেমকে দুঃসাহসী ক'রে তুলেছিল। নাক তুলে যারা তাকে হয়ত বলতে পারতো, ও লা লা হাজরা, তুমি হচ্ছ মস্তিষ্ক-বিলাসী আর বাব্বারা হচ্ছে অপরিণীতা নাবালিকা···তোমাদের মধ্যে মিল কিছু নেই! অথবা যে আত্মম্ভরীর দল তাকে উপহাস করবার জন্যে হয়ত বলতো, এসব তোমার মস্তিষ্ক-বিকৃতিরই লক্ষণ! তাদের কি জবাব সে দিতে পারে,

[illegible] মনে তা সে তৈরী ক'রেই রেখেছিল। সে-জবাব সে খুঁজে পেয়েছিল বাবুবারার চোখের হাসিতে, কথায় হয়ত তাকে প্রকাশ করা যায় না। কিন্তু সকলের সামনে তাকে তুলে ধরতে মন চায় নি, লোকে হয়ত তাকে প্রেম-উন্মাদ ব'লে ভুল বুঝতে পারে।

কিন্তু, বাবুবারা কি ক'রে এ সব এত শিগ্‌গির ভুলে যেতে পারলো? যে তীব্র অনুরাগের রাঙারাখীতে তার সঙ্গে সে বাঁধা পড়েছিল, কি ক'রে এত অনায়াসে তাকে ছিন্ন করতে পারলো সে? সে যে ছিন্ন করেছে, তাতে আর কোন সন্দেহ নেই। এইটেই নিষ্ঠুর সত্য এবং তাকে নিঃশব্দে নিজের মধ্যে হজম ক'রে নিয়ে এ স্থান পরিত্যাগ ক'রে চলে যাওয়া ছাড়া তার আর কি উপায় আছে? সে বম্বে চলে যাবে। এর আগে সেখানকার একটা হাসপাতালে একজন রেডিওলজিস্টের পদ খালি ছিল। হয়ত এখনও তা খালি আছে। সেইখানেই সে যাবে…চলেও যেতো হয়ত এতক্ষণ…যদি না তার অন্তরে কুশাঙ্কুরের মত অহরহ বিঁধতো, শুধু এই ভাবনা, বাবুবারাকে সে আর দেখতে পাবে না। হায়, যে তরু মরে গিয়েছে, এখনও তার মৃত মূলে সে সযত্নে সিঞ্চন ক'রে চলেছে জল…এখনও মনে তেমনি জেগে আছে পরম-ক্ষুধা—ফিরে যেতে বাবুবারার বুকে, সেই একটি নারীর স্নিগ্ধ মাধুরীতে নিজেকে ফেলতে নিঃশেষে হারিয়ে…এবং সে নারী আর কেউ নয়, বাবুবারা…

আবিষ্টের মত প্রাঙ্গণের মধ্যে প্রবেশ করতেই পাশের কুঠরি থেকে ইলাহি বক্‌স ছুটে এসে তাকে অভিনন্দন জানায়: 'সেলাম হজুর! বড় সাহেব তো কেলাফে গিয়েছে হজুর…মিসি বাবা, আর মেমসাহেব তো ইধার আছে।'

ডা হাভর জিজ্ঞেস করে:

'মিস্ সাহেবের সঙ্গে এখন একবার দেখা হতে পারে?'

ইলাহি বক্‌স জবাব দেয়: 'মেম সাহেবকে পুছ ক'রে আসি—'

সঙ্গে সঙ্গে বাংলোর ভেতর অদৃশ্য হয়ে যায়।

ভ লা হাভর অধীর অপেক্ষায় উত্তেজিত হয়ে ওঠে। মনে হয় মুহূর্তগুলো যেন দীর্ঘতর হয়ে গিয়েছে। পূর্বেও এইভাবে বাইরে তাকে অপেক্ষা ক'রে থাকতে হয়েছে বটে কিন্তু আজ এই অপেক্ষা ক'রে থাকার নিদারুণ লজ্জা অপমানের মত অন্তরে বিঁধতে থাকে। হয়ত গৃহস্বামী তার আগমন-আশঙ্কায় ভৃত্যকে সতর্ক ক'রে দিয়ে থাকবে। যাতে সে সোজা ভেতরে চলে যেতে না পারে, তার জন্ত হয়ত তার ওপর আদেশ জারী করা হয়েছে। হয়ত বা তার এ ধারণা অমূলক। কেনই বা সে গৃহস্বামীকে এত নীচ প্রবৃত্তির লোক বলে ধরে নিল? নিজের ওপরে ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। পরমুহূর্তেই আত্ম-ধিক্কারে মনে হয়, পায়ের তলার মাটি যেন প্রবল ভূমিকম্পে ধসে পড়ছে। কেনই বা সে নিজেকে এখানে নিয়ে এলো?

ইলাহি বক্স ফিরে এসে জানায়: 'আইয়ে!'

সঙ্গে সঙ্গে দেখে মিসেস্ ক্রফ্‌টকুক্ ভেতর থেকে তারই দিকে এগিয়ে আসছেন। মুখে কষ্টার্জিত ক্ষীণ হাসি···হাতের আঙুলের ডগা প্রসারিত ক'রে দিয়েছেন করমর্দনের জন্তে—

কয়েক পা এগিয়ে এসে মিহি গলায় বলে ওঠেন:

'হালো জন্! কি আশ্চর্য, তুমি?'

অন্তরের অস্বস্তিকে বহু কষ্টে চেপে রেখে সহজভাবেই উত্তর দেবার চেষ্টা করে ভ লা হাভর: 'গুড্ ইভ্‌নিং মিসেস্ ক্রফ্‌টকুক্!'

যেন জগতে কোথাও কিছু ব্যতিক্রম ঘটে নি!

মিসেস্ ক্রফ্‌টকুক্ বলে ওঠেন: 'ও বুঝেছি, চার্লসের কাছ থেকে বিদায় নিতে এসেছ বুঝি? আমি কালকেই বলছিলাম, আমাদের সঙ্গে একবার শেষ-দেখা না ক'রে সে চলে যাবে না! বসো, বসো!'

মেঝের ওপর প্রসারিত ব্যাঘ্র-চর্মের উপর দিয়ে ভ লা হাভর সোফায় গিয়ে বসে।

অস্বস্তিকর নীরবতা।

মিসেস্ ক্রফ্‌টকুকই কথা উত্থাপন করেন :

'জিনিস-পত্র সব বাঁধা-ছাঁদা হয়ে গিয়েছে তো ? যদি কোন—'

স্ত লা হাভর তাড়াতাড়ি বলে ওঠে : 'হ্যাঁ—সব হয়ে গিয়েছে—বার্‌বারা কি ভেতরে রয়েছে ? তার সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই !'

এই সামান্য কথা কয়টি বলতে তাকে যে মানসিক উদ্যম করতে হলো, তার ফলে সমস্ত মুখ-চোখ রাঙিয়ে উঠলো। চোখের পাতা দুটো অসম্ভব রকমের ভারী বোধ হতে লাগলো। সামনে যা কিছু দেখছে মনে হচ্ছে সবই যেন ভেসে ভেসে চলেছে।

যথাসম্ভব কণ্ঠস্বরে মাধুর্য এনে মিসেস্ ক্রফ্‌টকুক্ উত্তর দেন : 'মনে হচ্ছে সে তো ভেতরে ছিল···হয়ত তার নিজের ঘরে আছে·· ম্যাবেলও এসেছে কি না ! ম্যাকেরা এখানেই এ ক'দিন রয়েছে যে ! শিগগিরই ওরা ছুটি নিয়ে হোমে ফিরে যাচ্ছে—বার্‌বারাও ওদের সঙ্গে যাবে। ঐ যে, বলতে না বলতে মেজর এসে গিয়েছে ! বার্‌বারাকে ডেকে দিচ্ছি !'

যদি মিসেস্ ক্রফ্‌টকুক্ তার আগমনবার্তা ঘোষণা না করতেন, তাহলে হয়ত মেজর ম্যাকেরা স্ত লা হাভরকে দেখেই নিঃশব্দে পেছন ফিরতে চেষ্টা করতো, কিন্তু এখন আর তা সম্ভব হয়ে ওঠে না। তাই একরকম বাধ্য হয়েই ম্যাকেরা তার দিকে এগিয়ে আসে। বলে : 'হ্যালো !'

স্ত লা হাভর মুখ তুলে ম্লান হাসি দিয়ে প্রত্যভিনন্দন জানায়। ম্যাকেরাকে দেখে ঘৃণায় তার মন চঞ্চল হয়ে ওঠে, তবুও মনে মনে স্থির ক'রে নেয়, কিন্তু কোনরকমেই সেই লোকটির সামনে নিজেকে ছোট করা চলবে না। নিজের ক্রুদ্ধ দৃষ্টিকে লুকোবার চেষ্টায় স্ত লা হাভর দেয়ালে সুসজ্জিত শিকারের সাজ সরঞ্জামের দিকে চোখ ঘুরিয়ে নেয়।

মিসেস্ ক্রফ্‌টকুক্ হন্তদন্ত হয়ে ভেতর থেকে বাইরে এসে জানান : 'বার্‌বারা এক্ষুনি আসছে। ততক্ষণে, একটা পেগ··· কি বল, জন্ ? ম্যাকেরা, জন্‌কে একটা পেগ তুমিই না হয় দাও।'

জ লা হাভর তাড়াতাড়ি বলে ওঠে : 'ধন্যবাদ! পেগ দরকার নেই!'

'তাহলে এক কাপ কফি···একটু কেক?'

জ লা হাভর বিব্রত হয়েই প্রত্যাখ্যান জানায়: 'অসীম ধন্যবাদ! আমার কিছুই চাই না! জানেন তো, কফি খেলে আমার ভাল ঘুম হয় না—'

'তাহলে একটা লেমোনেড খাও···শহর থেকে এইমাত্র আনানো হয়েছে।'

এবার আর জ লা হাভর প্রত্যাখ্যান করে না।

'বেশ—একটা লেমোনেডই দিন্!'

মিসেস্ ক্রফ্‌ট্রুক্ বারাণ্ডার ধারে গিয়ে লেমোনেডের জন্যে ভৃত্যকে আদেশ করেন।

গৃহস্বামিনীর এই আপ্যায়ন একরকম বাধ্য হয়েই সে গ্রহণ করে। মনে ভাবে, এই অভ্যর্থনার মধ্যে কতটুকুই বা আন্তরিকতা আছে? না, এটা শুধু একটা অভ্যাসের প্রাণহীন পুনরাবৃত্তি? হয়ত বা মিসেস্ ক্রফ্‌ট্রুক্ সত্যি-সত্যিই তার ভাগ্যবিপর্যয়ে দুঃখিত। কিন্তু সে চিন্তা মন থেকে জ লা হাভর সরিয়ে ফেলে। মিসেস্ ক্রফ্‌ট্রুক্ যে তার জন্যে দুঃখিত, একথা ভাববার মত কোন প্রমাণ সে এখনও পর্যন্ত পায় নি; এ শুধু তার নিজের মনেরই বিশ্বাস, তারই মনের গোপন ইচ্ছা। সে বেশ ভালরকমই জানে, এই ধরনের সমস্যায় আত্মরক্ষার জন্যেই সমাজ ছোট ছোট ভদ্রতার বাঁধাধরা নিয়মের সৃষ্টি করেছে! অন্তর যেখানে নিঃশব্দে পুড়ে যাচ্ছে, বাইরে সেখানে ছোটখাট ভদ্রতা, টুকরো-টাকরা আলাপে সেই অস্বস্তিকর ফাঁককে কোনরকমে ভরাট ক'রে রাখতে হয়। এ শুধু অন্তরের দুষ্টক্ষতের জ্বালাকে চেপে রাখবার জন্যে বাইরের মৃদু প্রলেপ। যে কথাটা সকলের মনের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে আছে, বাইরে তাকে সযত্নে আড়াল দিয়ে রাখবার জন্যেই এইসব সামাজিক ভদ্রতার আয়োজন। এক-একবার মনের মধ্যে দুরন্ত সাধ জেগে ওঠে, চীৎকার ক'রে তার নিজের বক্তব্য সে সকলকে শুনিয়ে দেয়, এই ছদ্মবেশী ভদ্রতার ক্ষীণ আবরণ ছিঁড়ে

টুকরো টুকরো ক'রে কেলে দিয়ে এই বদ্ধ-বদ্ধ-করা নিস্তব্ধতার নরক থেকে ছুটে বেরিয়ে চলে যায়। সারা জীবন ধরে যে সত্যকে সে বহন ক'রে এসেছে, আজ তাকে অকুণ্ঠভাবে প্রকাশ করবার সাহস কি তার নেই? একবার সংগোপনে চতুর্দিকে চোখ ঘুরিয়ে দেখে নেয়। পাশের ড্রয়ার থেকে বোতল বার ক'রে ম্যাকেরা একটা কড়া হুইস্কীর পেগের সদ্ব্যবহার করছিল। মিসেস্ ক্রুক্‌টুকুক্ ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছিলেন। তাদের দু'জনকে দেখলে, একথা ভাববার কোন কারণই থাকে না যে, জগতে কোথাও এমন কিছু ঘটেছে যাতে ক'রে তাদের মনের স্থৈর্যের বিন্দুতম ব্যাঘাত ঘটতে পারে। না, জ লা হাভর নিজের মনের সুগভীর স্তরে অবগাহন ক'রে দেখে, সে সাহস তার নেই। তার আশে-পাশে এরা যেভাবে সমস্ত ঘটনাকে গ্রহণ করেছে, তাকেও ঠিক তেমনিভাবে তার পরাজয়কে গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু সে কথা ভাবতে সে শিউরে ওঠে। সোফাটা সে একটু সরিয়ে নিয়ে বসে।

কিন্তু সেই নিস্তব্ধতার ষড়যন্ত্রে তার সমস্ত আত্মমর্যাদাবোধ ক্রমশ আহত, ক্ষতবিক্ষত হয়ে উঠতে থাকে। একদা তার নির্ভীক উক্তিতে সকলেই ভীত, সন্ত্রস্ত হয়ে থাকতো। সেই একমাত্র ঠিক সময়ে বেঠিক কথাটি, বেঠিক সময়ে ঠিক কথাটি স্পষ্টভাবে এবং স্পষ্টভাষায় বলতে পারতো এবং বলেও এসেছে। তার স্পষ্টবাদিতার কোন প্রতিবন্ধক যে থাকতে পারে, কোন দিনই তা সে স্বীকার করে নি। অথচ আজ, ওদের এই ইচ্ছাকৃত মৌনতার নিঃশব্দ আক্রমণে তার সেই আত্মপ্রকাশ-ক্ষমতাকে নিজের হাতেই ক্ষুণ্ণ করতে হলো, এই চিন্তায় তার সমস্ত পুরুষত্বে আঘাত লাগে। সেই শোচনীয় ব্যর্থতায় অন্তরের মধ্যে হাহাকার ক'রে ওঠে তার চিরদুর্বিনীত ঝড়ো মন···কিন্তু আহত শিশুর মত তাকে নিঃশব্দে ভুলিয়ে রাখতেই হয় তাকে।

তবুও ক্রমশ অধীর হয়ে ওঠে তার মন। আর বেশীক্ষণ চুপ ক'রে থাকতে না পেরে সে জিজ্ঞেস ক'রে ওঠে: 'মিসেস্ ক্রুক্‌টুকুক্, বাবুবারার আসতে কি খুব দেরি হবে?'

মিসেস্ ক্রুক্‌টুক্ উঠে পড়েন : 'দেখি, তাকে আর-একবার না হয় ডেকে আনি !'

ম্যাকেরা সোডা খোলবার যন্ত্রটি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে মন্তব্য করে : 'বুঝেছ বালক, আমি হলে, এ নিয়ে আর বাবুবারাকে উত্ত্যক্ত করতাম না···বড্ডই থাম-খেয়ালী মেয়ে···বড় বেশী স্বাধীন !'

এ কথার উত্তরে কি বলা প্রয়োজন, তা শু লা হাভর ঠিক ক'রে উঠতে পারে না। শুধু মাথা নীচু ক'রে বসে থাকে, আর মনে মনে নিজেকেই ধিক্কার দেয়, কেন সে আজ এইভাবে এখানে এলো? ম্যাকেরার সেই শূন্যগর্ভ কথার প্রতিধ্বনি তার কানে এসে আঘাত করতে থাকে···যদি সে এই মুহূর্তে ফিরে যেতে পারতো!

দরজার কাছ থেকে ফিরে দাঁড়িয়ে মিসেস্ ক্রুক্‌টুক্ ম্যাকেরার কথার জবাব দেন : 'আর তা ছাড়া, বাবুবারার এখনো বিয়ের বয়সই হয় নি···আমি বলি কি, বাবুবারার সঙ্গে তোমার এই যে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল, এ তোমার পক্ষে একরকম ভালই হলো!'

একবার চোখ তুলে তাঁকে দেখে নিয়ে শু লা হাভর অন্য দিকে দৃষ্টিকে পরিচালিত করে। অবাক হয়ে ভাবে, কি ক'রে এইরকম লজ্জাকর মিথ্যা কথা এত স্বচ্ছন্দে এরা বলতে পারে? মিসেস্ ক্রুক্‌টুকুকে তাঁর মূর্খতার জন্যে তাঁর অন্তঃসারশূন্যতার জন্যে সে ঘৃণাই করতো কিন্তু এই মুহূর্তে তা যেন আরও সুতীব্র হয়ে ওঠে। সব চেয়ে বেশী যাতনা দেয়, যখন সে ভাবে, যে ব্যাপারকে সে তার অন্তরের সুন্দরতম সম্পদ বলে জানে, তাকে এই নারী এত অনায়াসে এত স্বচ্ছন্দে এইরকমভাবে পদ-দলিত করতে পারলো? অথচ যখন সে এখানে আসে, তার মনে কোন কুটিলতা, কোন অসাধু ইচ্ছা পর্যন্ত ছিল না, একান্ত সরল মন নিয়েই সে আসে। হায় ভগবান, তোমার সৃজিত এই বিরাট বিশ্বে কি অন্তরের সহজ স্বচ্ছ প্রকাশের স্থান নেই? কি ক'রে মানুষ এতখানি অবিবেচক হয়? মিসেস্ ক্রুক্‌টুকের সেই অসহ্য ন্যাকামিতে

রাগে তার সর্বশরীর জ্বলতে থাকে। ভাবে, কতখানি পুরু চামড়া দিয়ে বিধাতা এই নারীটিকে সৃষ্টি করেছিলেন? কোন কিছুই সে-চর্মকে ভেদ ক'রে অন্তর স্পর্শ করতে পারে না। কি ক'রে এখান থেকে উঠে চলে যেতে পারে তার একটা অজুহাত মনে মনে খুঁজতে শুরু ক'রে দেয়। এখনও তার জিনিস-পত্র বাঁধতে বাকি আছে, বলবে? চুনীলালকে তার দায়িত্ব বুঝিয়ে দিতে হবে, তাই অপেক্ষা করা চলে না? যাবার জন্যে সে উঠে দাঁড়ায়। কিন্তু তক্ষুনি আবার ভাবে, তারা তো কেউ এখানে আসবার জন্যে তাকে ডাকে নি! বাবুবারার সঙ্গে দেখা না ক'রে সে যদি এখন চলে যায়, তাহলে তার আড়ালে তাকে নিয়ে এক্ষুনি এরা হাসাহাসি শুরু ক'রে দেবে। আহত কীটের মত, যন্ত্রণায় তার অন্তর ছটফট করতে থাকে।

ইতিমধ্যে রুক্ টুকুক্ এসে উপস্থিত হয়। নীরবে তার সঙ্গে করমর্দন ক'রে একটা সোফায় বসে পড়ে।

কিছুক্ষণ পরেই বাবুবারা প্রবেশ করে, তার সঙ্গে ম্যাবেল। দ্য লা হাভর লক্ষ্য করে, তার মুখে, ম্লান ক্লান্ত হাসি, যৌবনের সে দীপ্ত ভঙ্গী যেন ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছে, অয়স্কান্ত নীল চোখের কোলে কোলে গভীর ছায়া এসে পড়েছে, একান্ত শান্ত, বৃন্তচ্যুত শুষ্ক পত্রের মত সোফার মধ্যে এসে বসে পড়ে। দ্য লা হাভরের দিকে চেয়ে ম্লান কণ্ঠে শুধু বলে: 'হ্যালো!'

তার পর তেমনি ম্লান মুখে উদাসীন বসে থাকে, যেন সে এই সভায় সম্পূর্ণ অপরিচিতা।

অশান্ত অন্তরকে সংযত ক'রে নিয়ে দ্য লা হাভর সম্পূর্ণ উদাসীনভাবে তার দিকে চেয়ে দেখে। চেয়ে দেখতে দেখতে তার মনে হয়, বাবুবারা যেন তার রূপলাবণ্যের বাসন্তী ঋতু পার হয়ে রৌদ্রময় গ্রীষ্মে এসে উপনীত হয়েছে। হঠাৎ মনে পড়ে যায়, সকলে হয়ত তার দিকেই চেয়ে আছে, তাই বাবুবারার দিক্ থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে অন্য দিকে চেয়ে থাকে। চেষ্টা করছিল, দৃষ্টি দিয়ে যদি তার অন্তরের ভেতরকার অবস্থা অনুধাবন করা যায়।

নিজের মধ্যে নিজেকে সংবরণ ক'রে নেবার সঙ্গে সঙ্গে, সে বুঝতে পারে অন্তরের কামনাকে অবরুদ্ধ ক'রে সে এতক্ষণ ধরে যে আত্ম-সংযমের বর্ম তৈরি ক'রে চলেছিল, হঠাৎ তা যেন ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল, যেন বারবারার অতীত রূপের বাসন্তী শোভা অতর্কিতে তার এই আত্মরক্ষার আবরণ ছিন্ন ক'রে দিয়ে গেল। মনে পড়লো, বারবারার সামান্য স্পর্শে তার শিরায় উপশিরায় কিভাবে রক্তধারা আগুনের মত উষ্ণ হয়ে উঠতো। অলক্ষ্যে যেন সেই উষ্ণ স্পর্শ আবার এসে লেগেছে মনে, রক্তধারায় আবার জ্বলে উঠেছে আগুনের শিখা। এই বেদনাময় নীরবতাকে ভাঙবার জন্যে সে ঠিক করে, যাহোক একটা কিছু সে বারবারাকে জিজ্ঞাসা করবে, বারবারার সঙ্গে যেমন ক'রেই হোক তাকে আলাপ শুরু করতে হবে। বারবারার দেহ ও মনের সব কিছুই তার কাছে জানা। তার প্রতিটি অঙ্গ প্রতিটি দেহ-রেখা, রেখায় রেখায় সুপ্ত সাবলীল গতি, স্বচ্ছন্দ আনন্দ অভিব্যক্তি, তার প্রত্যেকটি কথা উচ্চারণ করবার ভঙ্গী পর্যন্ত তার কাছে অতি পরিচিত। যদিও আজ সেই পরিচিত রূপ মনে হচ্ছে যেন অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে, তবুও তার বিশ্বাস, সে ক্ষণিকের। তার কথার আমন্ত্রণে সে নিশ্চয়ই সাড়া দেবে! বারবারার সেই ম্লান নির্লিপ্ততা, সেই প্রস্তর নীরবতা তীব্র বেদনার মত তার অন্তরে এসে আঘাত করে, বারবারার বিষণ্ণ মূর্তি সে সহ্য করতে পারে না। অসহ্য হয়ে ওঠে এই নীরবতা···বাইরে এসে তার সঙ্গে দুটো কথা বলবার জন্যে সে তাকে আবেদন করবে···

টেবিল থেকে কাগজটা তুলে নিয়ে মিসেস্ ক্রুক্ টুকুক্ প্রশ্ন ক'রে ওঠেন :

'চার্লস, পড়েছ আজকে কাগজে আমাদের জিয়ার কুইন্ মেরী সম্বন্ধে কি একটা খবর বেরিয়েছে ?'

ক্রুক্ টুকুক্ও কঠিন সমস্যায় পড়ে নীরব হয়ে ছিল। যদি তার মেয়ে এই ব্যাপারে সম্পৃক্ত না থাকতো, তাহলে এই অবস্থার কখনই উদ্ভব হতো না। হার্ট আর ব্লু লা হাভরের মধ্যে, একথা ঠিকই যে, সে মনে মনে ডাক্তারকেই

বেশী পছন্দ করে, কিন্তু এখন সমস্ত ব্যাপারটা একটা বিপরীত রূপ গ্রহণ করেছে। অতএব তাদের যথাসম্ভব চেষ্টা ক'রেই মৌন থাকতে হয়। তাছাড়া এই ব্যাপারে এখন ম্যাকেরা থেকে আরম্ভ ক'রে চা-বাগানের প্রায় সমস্ত শ্বেতাঙ্গ সহকর্মীই জড়িয়ে পড়েছে, সুতরাং তার মনের বাসনা যাই হোক্ না কেন, সে স্ত লা হাভরের কাছে আর নিজেকে ধরা দিতে পারে না।

কাষ্ঠ হাসি হেসে বাব্‌বারা জননীকে লক্ষ্য ক'রে বলে ওঠে :

'মা, তোমার এখন ঘুমুবার সময় হয়ে গিয়েছে…'

কষ্ট-চেষ্টিত হাসি দেখতে দেখতে উবে যায়। আবার ঘন কালো ছায়ায় ঢেকে যায় বাব্‌বারার মুখ।

স্ত লা হাভরের সমস্ত মানসিক উদ্যম সহসা উঁচু পর্দা থেকে এত খাদে নেমে যায় যে সে নিজের মনে নিজের ওপর বিরক্ত হয়ে ওঠে। সেই অসম্ভব পরিস্থিতির মধ্যে বাব্‌বারার প্রতি তার সেই নিবিড় ভালবাসা যেন অতি সাধারণ সস্তা জিনিসের মত খেলো হতে লাগলো। একদিন যে তার জন্যে তীব্র অনুরাগ অনুভব করেছে, সে-কথা স্মরণ করতে আজ এই মুহূর্তে সে লজ্জিত হয়ে পড়ে। তার আশে-পাশে যারা রয়েছে, তাদের ব্যবহারে সে আজ এই অবস্থার মধ্যে এসে পড়েছে…তাদের জন্যেই সে আজ নিজের ব্যবহারে নিজেই কুণ্ঠিত। নিদারুণ ঘৃণায় ভরে ওঠে তার মন। এইভাবে এই নীরবতার ষড়যন্ত্রের সাহায্যে তারা তার মনের সমস্ত সৌন্দর্যবোধকে পর্যন্ত নষ্ট ক'রে ফেলতে চলেছে। এইভাবে এই ভদ্রবেশী অত্যাচারে সমস্ত জিনিসের অন্তর্নিহিত মর্যাদা তারা অপহরণ ক'রে নেয়। স্ত লা হাভর আর নিজেকে ধরে রাখতে পারে না। পরাজয়ের ব্যর্থ আক্রোশে এবং পুঞ্জীভূত গ্লানির অব্যক্ত বেদনায় সহসা সে ক্ষিপ্তের মত আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় এবং যথাসম্ভব সহজ হবার চেষ্টা ক'রে বলে ওঠে :

'তাহলে এখন আমাকে বিদায় নিতে হচ্ছে, কারণ বিস্তর কাজ এখনও বাকি পড়ে রয়েছে, যাবার আগে সেগুলোকে শেষ ক'রে ফেলতে হবে…'

গলার ভেতরটা তার শুকিয়ে আসে। কথা বলতে গিয়ে তাই কথাগু[illegible]লো চেষ্টা ক'রেও ঠিক রাখতে পারে না। কেউ উত্তর দেবার আগেই সে বাবুবারার কাছে এগিয়ে গিয়ে বলে ওঠে :

'বাবুবারা, দরজা পর্যন্ত আমাকে একটু এগিয়ে দেবে, এসো!'

তার এই আকস্মিক আচরণে বাবুবারা বিস্মিত হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে দেখে। দ্য লা হাভরের এই সামান্য উক্তির মধ্যে যে আবেদন এবং সেই সঙ্গে যে বিদ্রোহের সুর ছিল, বাবুবারার বুঝতে তা বিলম্ব হয় না। তাকে অস্বীকার করবার মত শক্তি তার ছিল না। তবুও অসহায়ের মতন সম্মতির জন্যে প্রত্যেকের মুখের দিকে চেয়ে দেখে। সে জানতো সে-সম্মতি সে পাবে না উপস্থিত ব্যক্তিদের কাছ থেকে। সমস্ত চোখ-মুখ রুদ্ধ আবেগে রক্তিম হয়ে ওঠে। অসম্ভব ক্লান্তির ভঙ্গীতে কোনরকমে আসন থেকে নিজেকে টেনে তোলে, আত্ম-চেতনার নির্মম আঘাতে তার দৃষ্টি যেন ঝাপসা হয়ে যায়।

দরজার দিকে কয়েক পা অগ্রসর হয়ে, দ্য লা হাভর ভেতরের অস্বস্তিকে ঢাকবার প্রাণান্ত চেষ্টায় হঠাৎ অস্বাভাবিক জোরে বলে ওঠে :

'বিদায়, মিসেস্ ক্রুক্‌টুকৃক্... বিদায় মিসেস্ ম্যাকেরা...'

তার পর ক্রুক্‌টুকুকের দিকে চেয়ে বলে :

'কাল সকালে আপনার সঙ্গে অফিসেই দেখা করবো...বিদায়—'

টলতে টলতে দরজার বাইরে গিয়ে পড়ে।

বাবুবারা অনুসরণ করে। অসহ্য যন্ত্রণায় তার পায়ে যেন কাঁটা ফুটতে থাকে, কারণ সে জানে, তার প্রত্যেকটি পা-ফেলার দিকে তারা সবাই চোখ মেলে চেয়ে আছে। কখন এ পালা শেষ হবে? কেন তার আপন-জনের সামনে তাকে এইভাবে টেনে এনে, এই নিদারুণ অপমান আর লজ্জার বোঝা তার ঘাড়ে দ্য লা হাভর চাপিয়ে দিল? সে তো তাকে চিঠি লিখে জানিয়ে দিয়েছিল, তার সঙ্গে যেন আর কোনদিন সে দেখা না করে, তবুও কেন সে

[illegible]। তার নারীত্বের সমস্ত অভিমান ভেতরে ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। এ
লোকটির কাছে সে নিজেকে আত্মসমর্পণ করেছিল, তাই কি সে আজ এসে
তার ওপর তার মালিকানী অধিকার সাব্যস্ত করতে? তাই কি এতক্ষণ চু
ক'রে বসেছিল, এই আশা ক'রে যে তার কাছে বাবুবারা ক্ষমা চাইবে
সে-আশায় ব্যর্থ হয়ে, তাই কি প্রকাশ্যভাবে তার ওপর তার অধিকারকে
জাহির করবার জন্যে তাকে অনুসরণ করতে আদেশ করলো?

এই চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে তার ভেতরের নারীত্ব ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। হু লা হাভ
যে তাকে এতখানি ছোট ক'রে দেখছে, তার সম্ভাবনায় ক্ষিপ্ত হয়ে হঠা
দ্রুত পদক্ষেপে সে বাইরে বেরিয়ে পড়ে। সেই মুহূর্তে তার মনে হয়, জগতে
সমস্ত নারীর মধ্যে একমাত্র তাকেই এই নিষ্ঠুর লাঞ্ছনা ভোগ করতে
হলো।

ঘরের ভেতর থেকে মিসেস্ ক্রফ্‌ট্কুকের আওয়াজ শোনা গেল:

'বাবুবারা, বাবুবারা, ওরে, বাইরে ঠাণ্ডা লাগবে, শালটা জড়িয়ে নিয়ে
গেলি না?'

বাবুবারা সে কথা যেন শুনতেই পেলো না।

বারাণ্ডার নীচে হু লা হাভর তার জন্যে অপেক্ষা ক'রে দাঁড়িয়েছিল।

বাবুবারাকে নামতে দেখে অবাক হয়ে সে ভাবে, তার শিরার রক্তকে
দিতো দুলিয়ে যে লীলা-ভঙ্গিমা, তার সব কাজের মধ্যে মনকে যা রতো
ভুলিয়ে, কোথায় গেল আজ সে-তনুদেহের দিব্য আবেদন?

দুই হাত প্রসারিত ক'রে, হু লা হাভর ডেকে ওঠে:

'বাবুবারা, আমার বাবুবারা!'

কঠিন মুখ ক'রে, নিজের মধ্যে সমস্ত শক্তিকে সংহত ক'রে নিয়ে ক্রুদ্ধকণ্ঠে
বাবুবারা শুধু বলে: 'না!'

'বেশ, তবে তাই হোক্! বিদায়!' যাবার জন্যে সে পিছন ফিরে দাঁড়ায়।

বাবুবারা জবাব দেয়: 'বিদায়!'

কিন্তু চলে যায় না, সেইখানেই দাঁড়িয়ে থাকে। দ্য লা হাভরও যাবার জন্তে পা তোলে না।

পেছন থেকে মিসেস্ কক্‌ইবুকের আওয়াজ আবার শোনা যায়:

'খুকী, ও খুকী, ওরে ঠাণ্ডা লাগবে···শালটা নিয়ে যা!'

দ্য লা হাভর কাছে এগিয়ে গিয়ে শেষ চুম্বনের আশায় তাকে আলিঙ্গন করবার জন্তে দু'হাত বাড়ায়।

বার্‌বারা চীৎকার ক'রে ওঠে: 'না না!'

দ্য লা হাভর স্তব্ধ হয়ে যায়।

বার্‌বারা বলে ওঠে: 'এ সব কি? কি চাই আর তোমার?'

'আমি···আমি···তোমার কাছ থেকে শেষ বিদায় নিতে চাই···'

বার্‌বারার ক্ষীণকটি বেষ্টন করবার আশায় দ্য লা হাভর ডান হাত প্রসারিত করে।

হাত দিয়ে দ্য লা হাভরের প্রসারিত হাত ঠেলে ফেলে দিয়ে, বার্‌বারা মুখ ঘুরিয়ে বলে: 'না'!'

নিজের ভেতর থেকে শক্তি-সংগ্রহের শেষ চেষ্টা ক'রে দ্য লা হাভর অন্তরের সংগোপন চরম কথাকে প্রকাশ ক'রে ফেলে: 'বার্‌বারা, ডারলিং আমার, তুমি কি আমার সঙ্গে চলে আসতে পার না?'

বার্‌বারা উত্তর দেয়: 'তোমার জীবন স্বতন্ত্র···কেমন ক'রে তাঁর জন্তে আমার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সকলকে ত্যাগ করতে পারি?'

'কিন্তু একদিন তুমিই তো চেয়েছিলে, তুমিই···'

'আমি তোমার মতন ক'রে বেঁচে থাকতে পারি না···সারাক্ষণ শুধু একটা ভাবের উন্মাদনায়···'

ম্লান কণ্ঠে দ্য লা হাভর বলে: 'কিন্তু এই ক'মাস তো তুমি অনায়াসে আমার মতন ক'রেই বেঁচেছিলে!'

'আমার মধ্যে যেটুকু সে-শক্তি ছিল, তা শেষ হয়ে গিয়েছে···তোমার

মধ্যে যে সব আশ্চর্য জিনিস দেখেছিলাম, তার জন্তে যে আমি মুগ্ধ হই নি, তা নয়···তবে, আজ আর কোন শক্তি নেই আমার···চেয়ে দেখলেই দেখতে পাবে, আমি ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছি···অসুস্থ···'

ড লা হাভরের মনে হয়, বার্‌বারা যেন বহুদূরে চলে গিয়েছে···যেন যোজনান্ত দূর থেকে তার কণ্ঠস্বর আসছে। যে অপূর্ব কমনীয়তা একদিন তাকে উন্মাদ করেছিল, তার চিহ্নমাত্র যেন তার দেহে নেই···প্রস্তর-কঠিন, সুদূর, সে-দেহ শুধু মাত্র তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। হায়, কোথায় সে তন্থ-দেহের মায়া-আবেদন!

ড লা হাভর চোখ তুলে দেখে, বারাণ্ডার ওপরে দরজার সামনে মিসেস্ ক্রফ্‌ট্‌কুকের ছায়া যেন নড়ে উঠলো···আর কোন কথা না বলে পেছন ফিরে হাঁটতে আরম্ভ ক'রে দিল। বাংলোর বাইরে রাস্তায় যখন এসে পড়লো, তখন দুই গণ্ড বেয়ে উষ্ণ অশ্রুধারা আপনা থেকে গড়িয়ে পড়ছে···ভেতর থেকে একটা তিক্ত বাষ্পে যেন শ্বাস রোধ হয়ে আসছে।

কোন অপরাধ করি নি তো আমি! তবে···তবে···'

অন্তর থেকে শিশুর মতন ডুকরে কেঁদে ওঠে।

এগিয়ে যেতে যেতে সহসা অনুভব করে, বিচিত্র এক বিরাট শূন্যতা যেন তাকে গ্রাস ক'রে ফেলেছে, শূন্যতার মধ্যে সমস্ত বেদনা আর অনুশোচনার স্মৃতি হেমন্তের প্রথম বায়ু বিতাড়িত শুষ্ক পত্রের মত নিঃশব্দে ঝরে পড়ছে।

॥ বাইশ ॥

গজুর জীবন আবার প্রতিদিনের প্রাণহীন বাঁধা নিয়মের অভ্যস্ত পথে চলতে শুরু করে। এই হাঙ্গামার মধ্যে সে বা তার সংসারের কারুরই বিশেষ কোন আঘাত সইতে হয় নি। তবে নারাণ, গোরখপুরী কুলি আর ভুটিয়ার

সঙ্গে সঙ্গে হাঙ্গামার পাণ্ডা হিসেবে তার নামও বড় সাহেবের কাছে গিয়ে পৌছোয়। বিচার ক'রে ম্যানেজার সাহেব তাদের অপরাধের দরুন প্রত্যেকের পঞ্চাশ টাকা ক'রে জরিমানা ধার্য করে। একসঙ্গে না দিতে পারলে, দফায় দফায় মাইনে থেকে তা কাটা যাবে। এ ছাড়া, তাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হয় নি। অর্থাৎ ক্রীতদাস হিসাবে তাদের পূর্ণ স্বাধীনতা, আগেকার মতনই তারা ভোগ করতে পারে। সাহেবদের সামনে মাটিতে লুটিয়ে সে যেভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করেছে, তাতে মনিবদের মনে আর কোনও সন্দেহ ছিল না যে, তার মধ্যে বিদ্রোহের বাষ্প ঠাণ্ডা হয়েই গিয়েছে। জরিমানা মকুবের জন্যে একবার কাতরভাবে প্রার্থনা জানিয়েছিল কিন্তু তাতে কোন ফলোদয় না হওয়ায় সে জরিমানা দিতে স্বীকৃতও হয়েছে এবং কোন রকম প্রতিবাদের কোন ভঙ্গী না দেখিয়েই সে অন্য আর যা কিছু সবই মেনে নিয়েছে।

কিন্তু তার নিজের কাছে সে এত স্বচ্ছন্দে মুক্তিলাভ করতে পারে নি। যখনি একলা বসে থাকিতো, আপনার মনে বিড়বিড় ক'রে কি সব বকতো, কখনো বা চাপা-গলায় নিজেকেই নিজে ধিক্কার দিয়ে উঠতো···কত ছড়া, কত শ্লোক আওড়ে চলতো। দেখে শুনে লীলার মনে ভয় হতো, বুঝি তার বাবা পাগল হয়ে যাচ্ছে। বুদ্ধু তো ধরেই নিয়েছিল, তার বাবার ঘাড়ে বোধ হয় কোন ভূত এসে চেপে বসেছে। সেদিনকার তার সঙ্গীদের সেই শোচনীয় পরাজয় এবং সেই সঙ্গে তার সুনিশ্চিত অন্ধকারময় ভবিতব্যতা তার সমস্ত চেতনাকে এমনভাবে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেছিল যে, চোখ চাইলেই সে দেখতে পেতো, পাহাড়ের ওপার থেকে সঙ্গীন হাতে বিজয়ী গোরার দল তার দিকে এগিয়ে আসছে, সূর্যের আলোয় তাদের হাতের বেয়নেট ঝকঝক করছে, মুখ-চোখ যেন রক্ত-মাখা, ইস্পাতের মত নীল চোখে তারা স্থির চেয়ে আছে, পাথরের চোখে পলক পড়ে না, ধুলোর রঙের মত তাদের পোষাকের রঙ, দেখে মনে হয় যেন ধুলোর কবর থেকে সদ্য উঠে আসছে, তারই পূর্ব-কৃত

সমস্ত অপরাধের শাস্তি দেবার জন্তে। ভয়ে চোখ বন্ধ ক'রে থাকতো কিন্তু তবুও যেন সে সে-দৃশ্য তেমনি দেখতে পেতো। অবশেষে অসহায় ভয়ে চীৎকার ক'রে উঠতো, কে তোমরা? কেন অমন ক'রে আমার চোখের দিকে চেয়ে আছ? কে, কে তোমরা? কি করেছি আমি? আমাকে ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও আমাকে·· দেখছো না আমার বুক ভেঙে গিয়েছে··· বুক চুইয়ে চোখে জল পড়ছে? আমার স্ত্রী নেই···কে দেখবে আমার ছেলেমেয়েকে? তারা যে একেবারে কচি···

এমনিধারা আপনার মনে বকে চলে ভয়ে···কখনো আবার বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ উঠে দাঁড়ায়, পায়চারি করে। কি মনে ক'রে সামনের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে পিছু হটতে আরম্ভ করে, যেন পর্বতের আড়াল থেকে সৈন্তরা তাকে আক্রমণ করতে এগিয়ে আসছে। মাথা নীচু ক'রে মাটিতে হাঁটু রেখে বসে পড়ে, ভয়ে চোখ তুলে চাইতে পারে না, মনে হয় যেন চোখ তুলে চাইলেই তাদের ক্ষুরধার দৃষ্টি এক্ষুনি তাকে বিদ্ধ ক'রে মারবে। অন্তিম প্রার্থনার মত হাতের অঙ্গুলি দিয়ে অদৃশ্য মালা জপ ক'রে চলে, আর কাতরভাবে চীৎকার ক'রে ওঠে, ভগবান! ভগবান! রক্ষা কর! জালিমদের হাত থেকে বাঁচাও! আমার স্ত্রী নেই, আমার ছেলেরা দুধের বাচ্চা···দেখতে পাচ্ছো না, বুক চুইয়ে আমার চোখের জল পড়ছে।

কখনো কখনো নিশ্চল নিশ্চুপ বসে নীরবে নিজের ভাগ্যের কথা চিন্তা করে·· স্তব্ধ-গতি মহাকাল যেন পাতলা হাওয়ায় ঝুলতে থাকে···আশাভ্রু মন থেকে কে সব কুসংস্কারের চিহ্ন পর্যন্ত ধুয়ে মুছে দিয়ে যায়···মনে হয়, দীপ্ত সূর্যের মতন যেন তার আলোক-রেখায় পরিব্যাপ্ত হয়ে গিয়েছে এই নিত্য-চলমান বিশ্ব। যে-সব ভাবনাকে সে সারা জীবন ধরে লালন-পালন ক'রে এসেছে, ধ্যানের মধ্যে তাদের যেন স্পষ্ট দেখতে পায়। অন্তরের অন্তস্থল থেকে কে ঘোষণা ক'রে ওঠে, চিরকাল আমি বলে এসেছি আর আজও আবার বলছি, যদিও তারা এই পৃথিবীর মাটিকে বেচছে, কিনছে,

আত্মসাৎ করছে, তবুও একথা ঠিকই যে ভগবান কোন দিনই চান নি যে তাই হোক, তার কারণ কেউ থাকবে সুখে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত নিয়ে, আর কেউ থাকবে চির-দুঃখে, সর্বস্ব হারিয়ে, এ কখনই তাঁর ইচ্ছা নয়। যাতে দুনিয়ার সব মানুষই পেট-ভরে খেতে-পরতে পায়, সেইরকম ক'রেই তিনি অপর্যাপ্ত মাটি দিয়ে এই পৃথিবী গড়ে তুলেছেন। তবুও বেশীর ভাগ লোক খিদে নিয়েই এই পৃথিবী থেকে চলে যায়, বেশীর ভাগ লোকই খিদের জ্বালায় সারা জীবন জ্বলে মরে, যেন এই পৃথিবীটা তৈরি হয়েছিল সব মানুষের নয়, দু'একজনের খিদে মেটাবার জন্যে!

ধ্যানের নিভৃতলোকে অদৃশ্য শব্দ-রূপ ধ'রে যেন জেগে ওঠে দৈববাণী, যা হয়ত একদিন অনাগত ভবিষ্যতে মহাকাল সার্থক ক'রে তুলবে, কিন্তু হায়, তার সমস্ত কল্পনার বিরাট পরিধির মধ্যে নিজের ব্যক্তিগত সুখের কোন আশাই সে দেখতে পায় না। আশার মধ্যে শুধু চোখে পড়ে, ক্ষুদ্র পার্বত্য নদীর ধারে সামনের উপত্যকা-ভূমিতে তার নিজের জমিতে ধানের শীষের শিশুচারা মাটি ফুঁড়ে মাথা তুলে উঠেছে।

গন্জু একদৃষ্টিতে সামনের চলমান পার্বত্য নদীর দিকে চেয়ে থাকে···সেই নিত্য-চলমান জলের ধারা আর সেই সদ্যজাত শিশু-শস্যের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে গন্জুর মনে হয়, যেন পৃথিবীতে মৃত্যু বলে কিছু নেই, অমরত্বের এক অলৌকিক বিভায় আচ্ছন্ন হয়ে যায় তার মন।

দিনের পর দিন সেই নদীর ধারে ব'সে নিম্নগামী স্রোতধারার সঙ্গে ভাসিয়ে দেয় তার মনকে। কখনও পাহাড়ের গা থেকে বড় বড় পাথরের টুকরো ভেঙে, কখনও ছোট ছোট নুড়ির ওপর দিয়ে খেলা করতে করতে এগিয়ে চলেছে নদী, বিপুল গর্জনে নির্ঝরিণীরূপে কোথাও ঝাঁপিয়ে পড়ছে নীচে; নীচে উপত্যকায় এসে আবার শান্ত মূর্তিতে নিজেকে দিচ্ছে বিস্তার ক'রে। তরল স্নিগ্ধতায় ধুইয়ে দিয়ে চলেছে ধরণীর তপ্ত গাত্র। সুন্দরী স্নানার্থিনীর চরণ-সেবায় বিগলিত হয়ে, জল-ক্রীড়ায় মত্ত দুরন্ত শিশুদের আনন্দ বর্ধন

ক'রে ক্লান্ত নরের শ্রান্ত অন্তরকে স্নিগ্ধ ক'রে, তীরাশ্রিত তৃণ-শস্যের আহার যুগিয়ে বয়ে চলেছে অনন্ত করুণার ধারা। গজুর অশিক্ষিত মনে এক অপরূপ অনুভূতি জেগে ওঠে, নদী যেন শুধু জলের ধারা নয়। এ যেন এক অপূর্ব সৃজনী-শক্তি, লীলাভরে যা বহন ক'রে চলেছে নিখিলের শ্রান্তির ভার নিজের তরল বক্ষে। এই আপাত-শান্ত শক্তি-ধারার মধ্যে ধ্বংসের মহাসম্ভাবনার যে রূপ প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে, মাঝে মাঝে গজুর মনে চকিতে তার ইঙ্গিত উদ্ভাসিত হয়ে উঠতো। এক একদিন তার মনে হতো, হয়ত একদা এক নিশীথে রুদ্রমূর্তি ধরে দরিদ্রের সারা জীবনের আশ্রয় ভেঙে ভাসিয়ে নিয়ে চলে যাবে, তার ভাঙন-সঙ্গীতের গর্জনে ভরে উঠবে আকাশ-বাতাস। কিন্তু এই আতঙ্কের সম্ভাবনা তার মনে কোন রেখাপাত করতো না, তার কারণ, জীবনের বন্ধুর পথে এত বিপর্যয় সে ভোগ ক'রে এসেছে, নিশিদিন দুশ্চিন্তার দুরূহ বেদনা তিল তিল ক'রে তার দেহের প্রতি কণিকাকে এমনভাবে অসাড় ক'রে দিয়ে গিয়েছে যে, তার মধ্যে এই নতুনতর আশঙ্কার কোন তীব্রতাই সে আর অনুভব করতে পারতো না। বরঞ্চ তার মনে হতো, যদি একদিন সত্য সত্যই বন্যায় ভেসে যায় তার সব, ভালই হয়···চরম ভাগ্য-বিপর্যয়ের আশঙ্কায় প্রতিদিন অপেক্ষা ক'রে থাকার যে স্নায়বিক অশান্তি, তার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

কয়েক সপ্তাহ পরে একদিন অকস্মাৎ এলো সেই চরম ভাগ্য-বিপর্যয়, ঝড়ের মূর্তি ধ'রে।

আসামের মাঝ-গ্রীষ্মের উত্তাপ সেবার চূড়ান্তভাবে দেখা দিয়েছিল। অসহ্য গরমের দহন গজু সারা রাত্রি ছটফট ক'রে কাটিয়েছে। নিরন্ধ্র মেঘের নিশ্চলতার নীচে সারা রাত ধরে পৃথিবী অন্ধকারে একা যেন অপেক্ষা করেছিল। এক ঝাঁচলা বাতাসের জন্যে পিঞ্জরাবদ্ধ প্রাণীগুলি সারা রাত ধরে আর্তনাদ করেছে ; শ্বাসরুদ্ধ অন্তিম মুহূর্তে মানুষ যে অবর্ণনীয় ব্যাকুলতায় জ্ঞানহীন হয়ে পড়ে, কুলি-লাইনের পিঞ্জরে সেই সব মানুষ তেমনি বিমূঢ়ভাবে

সারা রাত কাটিয়েছে। ভোরের দিকে, যে-সব টুকরো টুকরো মেঘ তখনও ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়েছিল, তারা একে একে সব এক জায়গায় এসে মিশে গেল, যেন পৃথিবী-ধ্বংসের শেষ-সংগ্রামের জন্তে আকাশচারী অদৃশ্ত বাহিনীর দল সংহত হয়ে দাঁড়ালো। দিবস-নিশার সন্ধ্য-লগ্নের আলো-আঁধারীতে ভেঙে গেল কুয়াশা; হঠাৎ তার মধ্য থেকে জেগে উঠলো একফালি বাতাস; অর্ধ-জাগরিত, অর্ধ-তন্দ্রাচ্ছন্ন শ্বাস-রুদ্ধ ধরণী সেইটুকু বাতাসের স্পর্শে সচকিত হয়ে নাসারন্ধ্র বিস্তার ক'রে সমস্ত বাতাসটুকু নিঃশেষে টেনে নেবার জন্তে ব্যগ্র হয়ে ওঠে···

তামসী রাত্রির অতল অন্ধকারের গহ্বর থেকে, জীবনের আশার বার্তা নিয়ে অবশেষে আসে প্রভাত। ধরণীর প্রান্ত থেকে আকাশের দিক্-রেখা পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত হয়েছিল যে ম্লানিমা, ঈষৎ-প্রস্ফুটিত রক্ত-গোলাপের রঙের আমেজে যেন ক্রমশ তা নিশ্চিহ্ন হয়ে আসে।

ক্রমশ গাছপালা, লতাগুল্ম ঘন-সবুজের স্নিগ্ধ আভায় পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। সামনে সুমধুর দিবসের সম্ভাবনায় একটা চাপা আনন্দের মিহি-সুরে বনের মধ্যে গেয়ে ওঠে অরণ্য-বিহগের দল।

কিন্তু সে-সুন্দর দিনের জন্তে বেশীক্ষণ আর অপেক্ষা ক'রে থাকতে হয় না। ভয়ঙ্কর মূর্তিতে অচিরেই দেখা দেয় সুন্দর।

দেবরাজ ইন্দ্রের অগ্র-বাহিনীর দল বজ্র-আরাবে বিদ্যুৎ-আঘাতে ধরণীর অন্তর কাঁপিয়ে অগ্রসর হয়ে আসে···মেঘ-হস্তীর সংহ্বনে, জলদ-অশ্বের হ্রেষা-রবে মুখরিত হয়ে ওঠে আকাশের রণাঙ্গন।

দেখতে দেখতে আকাশ থেকে সেই মেঘ-চমূর দল ভেঙে পড়ে পৃথিবীর বুকে। আকাশ-অঙ্গনে অশ্ব-ক্ষুরের আঘাতে জেগে ওঠে বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গ··· সে-বিদ্যুৎ আলোকে চমকে ওঠে হিমালয়ের দূর গিরি-শিখর··· তীব্র গতি বর্শার মত জলধারা ছিন্নভিন্ন ক'রে দেয় বায়ু-আবরণ।

আর্তনাদ ক'রে ওঠে ধরণী। তার উদগত অশ্রু ধারায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে

পার্বত্য নদী-নির্ঝরিণী…ধারার বেগে উৎপাটন ক'রে নিয়ে যায়, সদ্যজাত কৃষকের আশা, তরুণ ধানের চারা। সেই প্রথম প্রভাতের ম্লান আলোকে যে-যার ঘরে জেগে উঠে কুলিরা স্তব্ধ ম্লান দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে অবিচ্ছেদ জলধারার দিকে। যার ক্ষেত গেল ভেসে আর ভেসে যাবার মত ক্ষেত যার নেই, দু'জনেই সমান স্তব্ধভাবে বসে থাকে হর্ষ-বেদনার অতীত শূন্য মনে।

গঙ্গু চোখের সামনে দেখে, তার সারা বছরের আশা ধারা-জলে ভেসে চলে গেল। কিন্তু বিচলিত হয় না। অবিচলিত এক অপূর্ব স্তব্ধতায় বিধাতার এই উদ্দাম লীলাকে মনে মনে সে স্বীকার ক'রে নেয়। এই চরম দুঃখের মধ্যে, তার এই সর্ব-শেষ ক্ষতির মধ্যে দৈবের অভিশাপ যেন নিঃশেষিত হয়ে গেল। যে অনাগত মহা-দুর্দৈবের আশঙ্কায় তার অন্তর প্রতিমুহূর্তে কাঁপতো, আজ এই ক্ষতির মূল্যে সে তার হাত থেকে যেন নিষ্কৃতি পেয়ে গেল…তাই ভার-মুক্ত ভয়-মুক্ত অন্তর স্বচ্ছ স্বাভাবিক বোধ হয়।

মাথার ওপরে ছাদে বৃষ্টি-পড়ার যে শব্দ উঠছিল, ক্রমশ ধীরে তা ক্ষীণ হয়ে আসে…ধীরে থেমে আসে ঝড়ের মাতন। প্রভাতের বৃষ্টি-ধোয়া আলোয় ধীরে শান্ত হয়ে আসে গঙ্গুর মনে সব ভয়, ভাবনা আর ভালবাসার দ্বন্দ্ব।

॥ তেইশ ॥

আসামের গভর্নর বাহাদুর মহামান্য স্যার জিওফ্রে বয়েডের শিকারের আয়োজনে আজ ব্যস্ত চার্লস ক্রুক্‌ট্‌কুক্। সমস্ত চা-বাগান এলাকাটা, বিশেষ ক'রে উপদ্রুত অঞ্চল, যেটাকে সরকারী পরিভাষায় 'মিউটিনীর ক্ষেত্র' বলে ঘোষণা করা হয়েছে, একবার সাধারণভাবে পর্যবেক্ষণ ক'রে যাবেন মহামান্য গভর্নর বাহাদুর, এইরকম বাসনা তিনি প্রকাশ করেছেন।

গভর্নরের এই আগমন উপলক্ষ্যে চার্লস ক্রক্‌টক্কুকের মনে একটা তীব্র আনন্দের সঞ্চার হয়েছে, কারণ মহামান্য অতিথিকে সংবর্ধনা করবার এই যে সুযোগ সে পেলো, তাতে ক'রে ইঙ্গ-ভারতীয় সমাজে তার মর্যাদা রীতিমত কয়েক ধাপ ওপরে উঠে যাবে। তা ছাড়া মহামান্য গভর্নর বাহাদুরের মত সেও বিশ্বাস করতো যে, এই জাতীয় রাজ্য-পরিক্রমার ফলে বৃটিশ সুশাসনের মঙ্গলময় যে দু'টি রূপ আছে, তা প্রজা সাধারণের সামনে প্রকট হয়ে ওঠে। একটি হলো, কঠোর আইন ও শৃঙ্খলার রূপ, অপরটি হলো অভিভাবকত্বের স্নেহের রূপ, মহামান্য ভারত-সম্রাটের প্রজা-সাধারণের জন্যে, সম্রাটের পিতৃ-অন্তরের দরদ।

মহামান্য গভর্নর বাহাদুর স্বয়ং ক্রক্‌টক্কুককে লিখেছেন, এই মত হলো পরলোকগত লর্ড কার্জনের। তিনি ভালরকমই জানতেন যে, পূর্ব জগতের লোকেরা স্বভাবতই এই জাতীয় রাজকীয় ঐশ্বর্য ও আড়ম্বরের সমারোহকে তীব্রভাবে চায়। তারা চায় তাদের সম্রাট হবে বিরাট, বিশাল, অত্যাশ্চর্য কিছু, তাদের সম্রাজ্ঞী হবে সুন্দরী এবং সর্ব-অলঙ্কার-সমন্বিতা।

কিন্তু মহামান্য গভর্নর বাহাদুর নিজের চেহারা সম্পর্কে ভুলেই গিয়েছিলেন যে, দৈর্ঘ্যে বড় জোর পাঁচ ফিট চার ইঞ্চি। দীর্ঘকাল ধরে আই. সি. এস্‌-এ চাকরি করার ফলে তাঁর মাথার চুল শাদা এবং পাতলা হয়ে এসেছে এবং যতই কেন উঁচু-কলার-ওয়ালা জামা আর পাঁস্‌নে চশমা ব্যবহার করুন না কেন, তাঁর বন্ধুরাই বলতেন, তাঁকে দেখলে পাতিয়ালার মহারাজা বা মুঘল-বাদশাহ্‌ আকবর বলে সন্দেহ করবার কিছুই ছিল না, বরঞ্চ মনে হতো চলনসই কোন ইন্‌সিয়রেন্স কোম্পানীর এজেন্ট। এবং তাঁর পত্নী মহামান্যা লেডী লুসী বয়েড দীর্ঘকাল এই গ্রীষ্ম মণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত দেশে বাস করার ফলে এমনধারা শুকিয়ে চুপসে গিয়েছিলেন যে তাঁকে দেখে সেবার রানী অথবা নূরজাহান মনে করবার মত মনের ভুল কারুরই হবার কোন সম্ভাবনা ছিল না।

কিন্তু একটা বিষয়ে মহামান্য গভর্নর বাহাদুরের বিন্দুমাত্র কমতি ছিল না ; মিথ্যা আশায় লোককে উৎসাহিত ক'রে তোলার ক্ষমতা ভারত গভর্নমেন্টের মতনই তাঁর চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। এবং যোগ্য সহধর্মিণীর মত মহামান্যা লেডী লুসী বয়েডও নিখুঁতভাবে অভিনয় করতে জানতেন। নেটিভ জনতাকে বিমুগ্ধ করবার পক্ষে, আর যা কিছুর প্রয়োজন, তার জন্যে তাঁদের চামড়ার শ্বেত-বর্ণই যথেষ্ট ছিল।

সে-বিষয়ে চার্লস্ ক্রফ্‌টুকেরও কোন বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। কারণ, এ-ক্ষেত্রে শিকারগুলোর আগেই তিনি স্বয়ং বিমুগ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। এই নিয়ে জীবনে সবশুদ্ধ তিনবার, প্রথমবার যখন লর্ড কার্জন আসেন, দ্বিতীয়বার যখন স্যার জর্জ ম্যাক্‌ফারসন আসেন, আর স্যার জিওফ্রে বয়েডের শুভাগমন নিয়ে এই তিনবার, তিনি তাঁর সর্বশক্তি প্রয়োগ করেন, অতিথির সন্তুষ্টির জন্যে।

অতিথি-সেবার প্রথম ব্যবস্থাস্বরূপ, তিনি শিকারের আয়োজনের জন্যে তাঁর স্টেট এবং আশে-পাশের অন্য সব চা-বাগানের স্টেট থেকে পেশাদার জংলী শিকারীদের ডেকে পাঠিয়েছেন। এমনি সাধারণ শিকারের জন্যে বিশেষ কিছু আয়োজন করবার দরকার হয় না। হাতে ডবল্ ব্যারেল গান্‌টা তুলে নিয়ে জঙ্গলের ধারে গিয়ে দাঁড়ালেই হলো! কিন্তু বুনো হাতী বা বাঘ শিকার করা অত সহজ ব্যাপার নয়। তার জন্যে বহুদিন ধরে বহু রকমের বিচিত্র সব আয়োজন করতে হয়, অনেক সময় কয়েক সপ্তাহ, এমন কি কয়েক মাসও লেগে যায়। এবং এক-আধ জন নয়, তার ব্যবস্থা করতে অন্তত শ'খানেক লোক আর গোটাকয়েক পোষা হাতীর দরকার হয়।

শিকারীদের চার্লস্ ঢালাও হুকুম দিয়ে দিয়েছে, যত কুলির দরকার হয়, চা-বাগান থেকে নিতে পারে···খেদা যেন নিখুঁতভাবে তৈরি করা হয়, আর খাদের বেড়া যেন রীতিমত মজবুত হয়।

যদিও কুলিদের কাছে সে-কাজ খুব আরামপ্রদ ছিল না, তবুও প্রতিদিনের

একঘেয়ে পাতা-কাটা আর পাতা-তোলার হাত থেকে ক্ষণিক রেহাই পেয়ে তারা নতুন উৎসাহে কাজে লেগে যায়। এই দলে নারাণ আর গফুরও ভাক পড়েছে। নারাণকে পেলে কুলিরা খুশীই হয় কারণ সে যেখানে থাকে সেখানটা আলাপে রসে মশগুল ক'রে রাখবার একটা স্বাভাবিক ক্ষমতা বিধাতা তাকে দিয়েছিলেন। গফুও সেই জন্যে মনে মনে নারাণের সঙ্গকে কামনা করতো। বহুদিন একসঙ্গে পাশাপাশি দিনের-আলোয় কেটে গিয়েছে ; জীবনধারণ করতে হলেই দাসত্ব করতে হবে, এই সহজ সত্যকে স্বীকার ক'রে নিয়ে তারা দু'জনেই আবার কাজে লেগে গিয়েছে। এক মনিব না পছন্দ হলে আর-এক মনিবের কাছে কাজ করতে হবে···সুতরাং কাজ করাটাই হলো আসল জিনিস। তাছাড়া, এই নতুন কাজের মধ্যে একটা মজা আছে, শিকারটা দেখা যায় এবং সকলের চেয়ে দামী জিনিস হচ্ছে, স্বয়ং লাটসাহেবকে কাছাকাছি চাক্ষুস দেখা যাবে।

কিন্তু দু'এক দিন যেতে না যেতে গভীর জঙ্গলের আলো-বাতাসহীন সেই বদ্ধ আবহাওয়ায় মন বিষিয়ে উঠতে থাকে···যতই বনের ভেতর এগিয়ে চলে, ততই দুর্দান্ত ভ্যাপ্‌সা গরমে এক ফোঁটা হাওয়ার জন্য দম্ আটকে আসবার মতন হয়, চারিদিকে এত ঘন বন যে জোর ক'রে হাত-পা নাড়া একরকম অসম্ভব ব্যাপার। গাছের ডালে জড়িয়ে কাপড় ছিঁড়ে যায়, পায়ের তলায় অদৃশ্য সব কাঁটা আর শুকনো শিকড় ছুরির মতন আঘাত করে। ঘামে শরীরের সমস্ত রক্ত যেন জল হয়ে বেরিয়ে যায়। তার ওপর, সর্দারের চোখ রাঙানি আর কড়া তাগিদ, জলদি, আরও জলদি···লাট সাহেবের আসবার দিন এসে গেল বলে !

খেদা আর শিকারের লাইন্ যখন তৈরি হয়ে গেল, শিকারীরা পাঁচ মাইল দূরে একপাল বুনো হাতীর সন্ধান পেলো। কুলিদের তখন 'বিটারের' কাজে লাগানো হলো। চারিদিক্ থেকে সেই বুনো হাতীর দলকে ঘিরে খেদিয়ে তারা খেদার দিকে নিয়ে চললো। সন্ধ্যার ঠিক পরেই বুনো হাতীর দলকে

কায়দায় ফেলে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় বলে, রাত-দিন কুলিদের সজাগ হয়ে থাকতে হয়। এইভাবে এক সপ্তাহ ধরে অবিরাম পরিশ্রম করার ফলে হাতীদের খেদার কাছে তারা তাড়িয়ে নিয়ে আসতে পারলো। এই এক সপ্তাহ ধরে কুলিদের ঘরের মেয়েরা দিনে একবার ক'রে জঙ্গলের ভেতরে এসে তাদের খাবার দিয়ে যেতো। অবশেষে এক সপ্তাহ পরে একদিন এলো, শিকারের আসল লগ্ন। নদীর পাড়ে একটা উঁচু জায়গা দেখে খেদা তৈরি করা হয়েছিল; পাড়ে সমস্ত আটঘাট তার জন্যে আগে থাকতেই বেঁধে রাখা হয়েছিল। একবার কোনরকমে নদীর জলে হাতীর দলকে ফেলতে পারলে, তৈরী বেড়ার পথ ছাড়া তাদের নিষ্ক্রমণের আর কোন দ্বিতীয় পথ ছিল না। তার জন্যে দু'দল পোষা হাতী দু'মোড় আগলে দাঁড়িয়েছিল। পেছন থেকে কুলির দল, বাজনা বাজিয়ে শিঙার আওয়াজ ক'রে, মশাল জ্বেলে তাদের তাড়িয়ে নিয়ে আসে। দূরে শ্বেতাঙ্গ শিকারীর দল বন্দুক আর রাইফেল তুলে তৈরী হয়ে থাকে।

নদীর উত্তর দিকে, একটা পরিষ্কার জায়গা মহামান্য অতিথিদের জন্যে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা হয়েছিল। সেখান থেকে সোজা আধ-মাইলের মধ্যে সমস্ত ব্যাপারটা অবাধে দেখা যায়। যথাকালে সশস্ত্র প্রহরী বেষ্টিত হয়ে গভর্নর বাহাদুর এবং লেডী লুসী বয়েড সেখানে উপস্থিত হলেন। আশে-পাশের সমস্ত চা-বাগানের শ্বেতাঙ্গ প্রভুরা স্ব স্ব সহধর্মিণীর সঙ্গে মহামান্য অতিথিদের সংবর্ধনার জন্য আগে থাকতেই উপস্থিত ছিলেন।

গভর্নর বাহাদুরের পাশে দাঁড়িয়ে চার্লস ক্রক্‌টুকুক্ সাড়ম্বরে শিকারের বিভিন্ন অঙ্গের কথা মহামান্য অতিথিদের বুঝিয়ে বলে। মিসেস্ ক্রক্‌টুকুক্‌ও সে আলোচনায় যোগদান করেন। সেবার লর্ড কার্জন এবং লেডী কার্জন যখন এসেছিলেন, তাঁরা কি খুশীই না হয়েছিলেন, মিসেস্ ক্রক্‌টুকুক্ আনন্দ-গদ্গদ কণ্ঠে জানান।

হিজ্ এক্সেলেন্সীও যে কম সন্তুষ্ট হয়েছেন, তা নয়। তিনি বললেন :

'এইসব দেখে শুনে আমার হিন্দুদের বিয়ের কথা মনে পড়ছে!'

হার এক্সেলেন্সী শুধু মাঝে মাঝে আনন্দে বলে উঠছিলেন: 'উঃ, কি লাভ্‌লী! লাভ্‌লী!'

একমাত্র শুধু টুইটি কোন মন্তব্যই প্রকাশ করতে পারছিল না, কারণ, চোখের সামনে সে তখন দেখছিল, বেড়ার মধ্যে কতকগুলো কুলি যে অনিশ্চিত বিপদের মধ্যে পড়ে গিয়েছে, তার ফলে যে-কোন মুহূর্তে তারা বুনো হাতীর পায়ের তলায় পড়ে ভবলীলার যন্ত্রণা থেকে মুক্ত হতে পারে!

সহসা কুলিদের চীৎকারে, শিঙার আওয়াজে, ঢাকের গর্জনে সমস্ত অরণ্য সচকিত হয়ে উঠলো। ভীত সন্ত্রস্ত বুনো হাতীর দল আত্মরক্ষার উদ্দাম চেষ্টায় জলে ঝাঁপিয়ে পড়লো। হাতের মশালের আগুনে কুলিরা আসে-পাশের জঙ্গলে আগুন ধরিয়ে দিল। পালাবার পথ খুঁজে বার করবার ব্যর্থ প্রাণান্ত চেষ্টায়, সেই আগুন আর সেই ভয়াবহ শব্দে বিভ্রান্ত হয়ে অরণ্যচারীর দল বাধ্য হয়েই মানুষের তৈরী সেই ফাঁদের মধ্যে একে একে ঢুকে পড়লো। এতক্ষণ আনন্দে যে-সব দর্শকরা কল-মুখর হয়েছিলেন, সহসা শরীরের ভেতর অদৃশ্য কম্পন-তরঙ্গে তাঁদের বাক্‌-রোধ হয়ে এলো। লেডী লুসী বরেন্ত আর 'লাভ্‌লী' বলতে পারলেন না…সংজ্ঞাহীন পড়ে গেলেন, মিসেস্ ক্রুক্‌শ্যাঙ্ক তাড়াতাড়ি স্মেলিং সল্টের শিশির জন্যে হাত বাড়ালেন। তৎক্ষণাৎ বিউগ্‌ল্ বেজে উঠলো, শিকার শেষ হয়েছে, বুনোর দল বন্দী হয়েছে। যখন হিজ্‌ এক্সেলেন্সীর কাছে সংবাদ এসে পৌছল যে, হাতীর দল এখন সম্পূর্ণভাবে আয়ত্তাধীন হয়েছে, তখন তিনি দলের মধ্যে যারা অপেক্ষাকৃত সাহসী বলে পরিচিত, তাদের সঙ্গে পদব্রজে হেঁটে গিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে বেড়ার ফটক বন্ধ ক'রে দেবার জন্যে অগ্রসর হলেন। ফটকের কাছে এসে দরজাটা টেনে ফেলে দিলেন। হিজ্‌ এক্সেলেন্সীর হাতী শিকার পর্ব শেষ হয়ে গেল।

পরের দিন, পাঁচটি পোষা হাতীর হাওদা ক'রে হিজ্‌ এক্সেলেন্সী চললেন বাঘ শিকার করতে।

নদীর ধারে যেখানে হাতী শিকারের খেদা তৈরি হয়েছিল, তারই কাছে পাহাড়ের নীচে খানিকটা জায়গা পরিষ্কার করা হলো। তার আগের রাত্রিতে জঙ্গলের একধারে যেখানে বাঘ আসার সম্ভাবনা আছে বলে শিকারীরা অনুমান করেছিল, সেখানে একটা ষাঁড় বেঁধে রেখে আসা হয়েছিল। সকালে দেখা গেল ষাঁড়টা আর বেঁচে নেই···তার রক্তাক্ত মৃতদেহ ঘন ঘাসের মধ্য দিয়ে টেনে নদীর ধার বরাবর কে এনে ফেলেছে।

হাওদার ওপর চড়ে হিজ্‌ এক্‌সেলেন্সী দলবল নিয়ে সেই জায়গাটাকে গোল হয়ে ঘিরে অগ্রসর হতে লাগলেন। একটা পোষা হাতীকে ছেড়ে দেওয়া হলো, আশে-পাশে ঘন ঘাসের বনে লুকায়িত অরণ্য-রাজকে প্রলুব্ধ করবার জন্যে।

কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ ঘন শর-বনের ভেতর থেকে একটা বাঘ বিদ্যুৎ-বেগে লাফিয়ে পড়ে প্রথমেই হাতীটার শুঁড়ের ওপর একটা থাবা বসিয়ে দিল, তার পর সামনে যে-কুলিটাকে পেলো, লাফিয়ে তার মুখের ওপর থেকে এক থাবা মাংস তুলে নিলো।

নিরাপদ দূরত্বে মহিলাদের দর্শন-সুখের জন্যে একটা আস্তানা তৈরি করা হয়েছিল। একটু আগেই শোনা গিয়েছিল সেখান থেকে তাঁরা চীৎকার ক'রে উঠছেন :

'একটা খরগোস! একটা খরগোস!'

লেডী হার্ট হিজ্‌ এক্‌সেলেন্সীকে বন্দুক ছোঁড়বার জন্যে অনুপ্রেরণা দিতেই তিনি সশব্দে বন্দুক ছুঁড়লেন, দুর্ভাগ্যবশত গুলিটা লক্ষ্যচ্যুত হয়ে বাঘের বদলে অপরাধী পোষা হাতীটার পশ্চাদ্দেশে গিয়ে আঘাত করলো···তৎক্ষণাৎ বেচারা লুটিয়ে মাটিতে পড়ে গেল।

সেই হাতীর ওপরে যে পেশাদার শিকারী বসেছিল, স্থানচ্যুত হয়ে সে দেখলো, ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্রের সামনাসামনি সে পড়ে গিয়েছে। আর কোন চিন্তা না ক'রে, আত্মরক্ষার জন্যে বাঘকে লক্ষ্য ক'রে গুলি ছুঁড়লো। অব্যর্থ সন্ধানে আহত অরণ্যরাজ চীৎকার ক'রে পড়ে গেল।

তৎক্ষণাৎ মাথা থেকে টুপি খুলে, সুউচ্চ কণ্ঠে রেগী হার্ট বাহবা দিয়ে উঠলো :

'হুর্‌রে ! হুর্‌রে ! হুর্‌রে ! থ্রি চিয়ার্‌স ফর হিজ্‌ এক্‌সেলেন্সী দি গভর্নর···'

রেগী হার্টের ওপর গলা চড়িয়ে ক্রক্‌টুবুক চীৎকার ক'রে উঠলো :

'হিজ্‌ এক্‌সেলেন্সী বাঘ মেরেছেন ! হিজ্‌ এক্‌সেলেন্সী বাঘ মেরেছেন !'

কুলিরা তখন ছুটে এসে ভূ-পতিত বাঘের ওপর লাঠির পর লাঠির আঘাত ক'রে চলে, যাতে ক'রে বিন্দুমাত্র প্রাণের স্পন্দন তার মধ্যে আর না থাকে।

হিজ্‌ এক্‌সেলেন্সী হাওদা থেকে নেমে সদলবলে মৃত ব্যাঘ্রকে পরিদর্শন করবার জন্যে পদব্রজে অগ্রসর হলেন।

রেগী হার্ট স্বাভাবিক কুৎসিত ভাষায় গালাগালি দিয়ে কুলিদের সরে যাবার জন্যে আদেশ করে।

হিজ্‌ এক্‌সেলেন্সী মৃত অরণ্য-রাজের কাছে এসে তার চিত্র-বিচিত্র দেহের ওপর এক পা তুলে দিয়ে দাঁড়ালেন। এই জাতীয় ঘটনায় এইরকম ভঙ্গীতেই পূর্বে বহুবার তিনি দাঁড়িয়েছেন। হিজ্‌ এক্‌সেলেন্সীর প্রাইভেট সেক্রেটারী তাড়াতাড়ি ক্যামেরা নিয়ে এসে দলের অন্য সব শ্বেতাঙ্গ অনুচরদের লাইন ক'রে তাঁর পেছনে দাঁড় করিয়ে ফটো তুলে নিলেন। তাঁর ভারত-বাসের গত কুড়ি বৎসরের মধ্যে এই জাতীয় বহু জয়-নিদর্শনের মধ্যে আর-একটি বাড়লো মাত্র।

কুলিরা বিমুগ্ধ বিস্ময় ও শ্রদ্ধায় মূক হয়ে দূরে দাঁড়িয়ে শুধু দেখে···

তাদের মধ্যে শুধু একজন সে-সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়···বাঘের প্রচণ্ড আক্রমণ যাকে নিজের মাংস দিয়ে রোধ করতে হয়েছিল।

॥ চব্বিশ ॥

যে-সব কুলি এই শিকারের আয়োজনে যোগদান করেছিল, তারা প্রত্যেকে এক টাকা ক'রে বকশিশ পেলো, তাছাড়া ক্রুক্‌টুকুক্‌ তাদের প্রত্যেককে যে ক'দিন তারা চা-বাগানের কাজ থেকে ছুটিতে ছিল, সেই ক'দিন রোজ-পিছু চার আনা ক'রে উদার-হস্তে দান করলো। এ ছাড়া, 'মিউটিনী'র দরুন যে সব কুলিকে 'বদমাস্‌' বলে 'দাগী' করা হয়েছিল, তাদের মাফ ক'রে দেওয়া হলো এবং তাদের দেয় 'ফাইনের' অঙ্ক কমিয়ে অর্ধেক ক'রে দেওয়া হলো। সাহেব আর কুলিদের মধ্যে প্রীতির বন্ধনকে অটুট রাখবার জন্যে স্যার জিওক্রে বয়েড় তাঁর শেষ রাজকীয় দান স্বরূপ এই ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে যান।

এই বদান্যতার দরুন গঙ্গু যে মনে মনে রীতিমত কৃতজ্ঞ হয়েছিল, তা নয়; কারণ, তার প্রয়োজনের তুলনায় এই দান খুবই সামান্য ছিল। 'বদমাস' হওয়ার দরুন এখনও তার অনেক 'ফাইন' বাকি আছে, তাছাড়া অন্য ঋণের পরিমাণও কিছু কম নয়। স্ত্রীর সৎকারের দরুন, যে ফসলের মুখ সে দেখতে পাবে না, কেননা বন্যার জলে তা ভেসে গিয়েছে, তার বীজ কেনবার দরুন, মুদীর দোকানে চাল-ডালের দরুন, এবং টাকায় এক পয়সা হিসাবে সাহুকারের খাতায় অবোধ্য ব্রাহ্মী অক্ষরে যে ঋণের অঙ্ক বেড়েই চলেছিল, তার দরুন তার ঋণের অঙ্ক বেড়েই চলেছিল! তাই এই হঠাৎ-পাওয়া ভাগ্যের দানে কৃতজ্ঞ বা খুশী হওয়ার কোন সম্ভাবনাই তার মনে জাগে নি। অবিরাম অবিচ্ছেদ দুঃখের মধ্যে বাস করতে করতে দিন আর রাত, রাত আর দিন, সেই এক ঘেঁায়াটে ম্লান ভাগ্যাকাশের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে, শুধু যে নিদারুণতম দুর্ভাগ্য সম্বন্ধে মানুষ অচেতন হয়ে পড়ে, তা-নয়, তার মধ্যে হঠাৎ কোন সৌভাগ্যের উদয় হলেও, সে তেমনি অচেতনভাবেই তাকে গ্রহণ করে। যতক্ষণ না পর্যন্ত বুকের ধুকধুকুনি চিরকালের মত থেমে যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত

কালের গতির পরিবর্তনে কোন সাড়া দেবার প্রবৃত্তি তার আর থাকে না। মহাকালের গতির একপাশে সে পড়ে থাকে বিচ্ছিন্ন, নিস্পৃহ, মৃত। তখন তার মনে হয়, সোনা নয়, বাড়ী নয়, কিছু নয়, শুধু দু'বেলা কোনরকমে দু'মুঠো উদরপূর্তি।

নিষ্করুণ ভাগ্যের নির্মম আঘাতে মানুষের অন্য যে সব প্রবৃত্তিই বিনষ্ট হয়ে যাক না কেন তবু শেষ পর্যন্ত বেঁচে থাকে তার জিহ্বার স্বাদ ক্ষুধার তাড়না; মৃত্যুর শেষ দিন পর্যন্ত দগ্ধ উদরের আহ্বানের সাড়া মানুষকে দিয়ে যেতেই হয়। সমাজের সমস্ত সভ্যতার অনুশাসন সত্ত্বেও ক্ষুধার্ত খাদ্যসামগ্রী দেখলে ক্ষুধিত রসনায় তেমনি জল ঝরে পড়ে। কেউ বাধা দিতে পারে না প্রকৃতির এই আদিম অমোঘ নিয়মে।

এর আগে যখন গ্রামে বাস করতো, তখনও যেমন, এখনও ঠিক তেমনি চোখ-বাঁধা বলদের মতন ঘানির চারদিকে ঘুরে চলেছে, চোখ-বাঁধা বলদের মতনই নিজস্ব এক অনুভূতির ধারায় সব জিনিসকে উপলব্ধি ক'রে। উপলব্ধি করে, তার মনিব-আর তার মধ্যে কোথায় পার্থক্য, উপলব্ধি করে তার যৌবনের উদ্ধত বিদ্রোহ, যেদিন আঘাতের বদলে আঘাত করতে বাধতো না, সেদিনকার সব আশা-আকাঙ্ক্ষা, ভয়-ভাবনা, ঘৃণা-ভালবাসা আজও ঠিক তেমনি উপলব্ধি করতে পারে, তবে আজ নির্বাণ ধর্মের আশ্রয়ে সে নিজেকে নিস্পৃহ ক'রে দেখতে শিখেছে। শিখেছে, ভাল আর মন্দ, পাওয়া আর না পাওয়া সবই এক পূর্ব-নির্দিষ্ট অমোঘ ভবিতব্যতার হিসাব-করা ন্যায্য বিধান, যেবিধান অস্বীকার করবার ক্ষমতা কোন মানুষেরই নেই, কারণ যিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বররূপে এই বিশ্ব-জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের কর্তা, এ বিধান সেই সর্বশক্তিমান সর্বজ্ঞ ভগবানেরই দান।

তার মাঝে মধ্যে হঠাৎ এই মানসিক স্থৈর্য উৎকেন্দ্রিক কেন্দ্র-চ্যুত হয়ে পড়ে যখন সর্দারদের হাত বা পা বা লাঠির সঙ্গে তার দেহের সংযোগ ঘটে যায়। ইদানীং এই সংযোগ সংখ্যায় একটু বেশী হতে থাকে। বিদ্রোহ দমন করার

পর থেকে এবং বিশেষ ক'রে গভর্নরের আগমন উপলক্ষে সর্দারেরা ফুলে-ফেঁপে উঠেছে এবং তাদের উৎপাত আগের থেকে বহুগুণ বেড়ে গিয়েছে।

কেন যে তারা এতখানি বেড়ে উঠেছে তা বুঝতে গজুকে কষ্ট করতে হয় না। তারা প্রত্যেকে পাঁচ টাকা ক'রে বকশিশ পেয়েছে সুতরাং তারা যে নিজেদের উচ্চস্তরের জীব বলে মনে করবে, তাতে আর সন্দেহ কি? গজু বেশ ভালরকমই জানে যখনই পকেট ভর্তি থাকে তখনি পৃথিবীর রঙ বদলে যায়। মনে হয় তখন যেন সব ঠিক সোজা পথে চলেছে। নিজের কাছে তখন নিজেকে রীতিমত বড় মনে হয় এবং লোকেও তাই মনে করে। তখন সে, জগতের সে-দলটা সংখ্যায় কম, যারা সর্বদাই নিজের যা আছে তাই রক্ষা করবার জন্যে, যাদের নেই সেই অসংখ্যের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হয়ে থাকে, সেই দলেরই একজন হয়ে যায়। তখন সে দেবতাদের দলে,—তার বিপক্ষ দলে যারা তারাই হ'লো শয়তান, তাদের নাক দিয়ে সর্বদাই শিক্নি ঝরে পড়ছে, তাদের মুখের দু'কশ দিয়ে লালা গড়াচ্ছে, তাদের দেহ ভেঙে দুমড়ে তুবড়ে গিয়েছে, গায়ে কাপড় বলতে শুধু ময়লা ছেঁড়া-ন্যাকড়া। তখন তাদের দেখলেই সে বিপন্ন হয়ে পড়ে, পাছে চোখোচোখি হয়ে যায়, তাই তাড়াতাড়ি পেছন ফিরে পাশ কাটিয়ে গা ঢাকা দেয়, কারণ সে মনে মনে জানে হয়ত এই নোংরা লোকগুলো এখুনি তাদের প্রাপ্য চেয়ে বসবে, যা অস্বীকার করতে সে পারে না অথচ দিতেও চায় না।

একদিন গজুরও অবস্থা ভাল ছিল। সেদিন তার নিজের পাঁচ একর জমি ছিল। কিন্তু যখন ভাগ্য তার সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে তাকে পথের ভিখিরী ক'রে দিল, তখনই কি তার সেই সৌভাগ্যের গর্ব দূর হয়েছিল? সে-গর্ব তার ভেঙে গুঁড়িয়ে যেতে, তার পর আরও বহুদিন লেগেছে।

আজ সে তা বোঝে। বোঝে বলেই সে ক্ষমা করতে পারে।

কিন্তু মাঝে মাঝে সর্দারদের কাছ থেকে এই যে ধাক্কা খেতো, সেগুলো এমন আকস্মিকভাবে এসে লাগতো যে তার এই নিরাপদ নিস্পৃহতার অভ্যস্ত

ধাক্কা এলোমেলো হয়ে যেতো। সেদিন এইরকম একটা নতুন ধাক্কা হঠাৎ এসে পড়লো। কাইনের দরুন অফিসে তার মাইনের অর্ধেক কেটে নিয়েছিল। বাকি যে অর্ধেক ছিল তার ওপর মহাজন বন্ধকী স্বত্ব নিয়ে তার দরজায় হাজির হলো।

এতদিন ধরে সাহুকার মহাশয় তার মক্কেলদের সঙ্গে যে-অতি-পরিচিত ভঙ্গীতে কথা বলতেন, বহু-প্রয়োগের ফলে তা একঘেয়ে হয়ে গিয়েছে মনে ক'রে তিনি নিজের ওপর সংস্কার সাধন করেন। কখনও অত্যধিক জোরে উচ্চারণ করেন, কখনও আবার কানে কানে কথা বলার মতন নীচু গলায়, এক নতুন বাচন-ভঙ্গীর আবিষ্কার করেন। সেই নতুন ভঙ্গীতে গঙ্গুকে তিনি অভিনন্দন জানিয়ে নিবেদন করলেন: 'আমি বুঝেছি, তোর কাছ থেকে এক পয়সাও আর ফিরে পাবার আশা-ভরসা নেই। তোদের কাছে এইভাবে আমার পাঁচ হাজার টাকা আটক পড়ে আছে···সুদের মুখে ঝাড়ু, কোনদিন আসলই ফিরে পাব কিনা ভগবানই জানেন! বন্ধকী যে সব রাবিস্ রুপোর মাল পেয়েছি, তার আমার দরকার নেই। দিনকাল যা পড়েছে, তা আর বলে কাজ নেই। তাই এখন মাথায় হাত দিয়ে বসেছি, কি হবে আমার, কি ক'রে এতগুলো টাকা আবার ঘরে ফিরে আসবে?'

এত নরম কথায় সাহুকার আগে আর কখনো কুলিদের সঙ্গে আলাপ করে নি। সাহেবদের সঙ্গে সে ওঠা-বসা করে, সাহেবদের ঝুড়ি ঝুড়ি ফল উপহার পাঠায়, কিন্তু সে কোনদিন কুলি-লাইনে সশরীরে আসে না। তাছাড়া, তার মনে একটা ভয়ও ছিল, কুলি-লাইনে তাকে একলা পেয়ে হয়ত কোন কুলি মরিয়া হয়ে তাকে খুন ক'রেই ফেলতে পারে।

শেঠজীর এই মধুর বচনে গঙ্গু ভরসা পেয়ে একান্ত দীনতার সঙ্গে নিজের দৈন্যের কথা উপস্থিত করে। কিন্তু ফল হয় উল্টো।

গঙ্গুর দীনতায় শেঠজীর মনের আশঙ্কা দূর হয়ে যায়। তাই স্বমূর্তিতে আস্ফালন ক'রে ওঠে:

'তা বেটা, তোর বউ মরে গিয়েছে তা আমি কি করবো? সাহেব তোকে ফাইন করেছে, তাতে আমার কি এলো গেল? ভাল চাস্ তো হারামজাদা, শুয়োরের বাচ্চা, আমার টাকা দিয়ে দে। নইলে সাহেবকে বলে অফিস থেকেই নিয়ে নেবো!'

সাহুকার অফিস থেকে তার মাইনে আদায় না ক'রে তার কাছে চাইতে এসেছে, গজু জানে, সেটা তার উদারতা নয়, তার কারণ হলো, প্রত্যেক মাসে অফিসে গিয়ে টাকা আনতে হলে, বাবু শশীভূষণকে তার প্রাপ্য কমিশন দিতে হবে। তাই সে, খুব সম্ভব এক বস্তা চাল ঘুষ দিয়ে, বাবু শশীভূষণের কাছ থেকে হুকুমটা বার ক'রে নিয়েছে···তার ওপর এইবার আর কিছু খরচ করতে সে নারাজ।

গজু যখন বুঝলো তার কোন আবেদন-নিবেদনেই সাহুকারের পাষাণ-হৃদয় গলবে না, তখন বাধ্য হয়েই সে জানায় :

'আচ্ছা শেঠজী!'

মনে মনে নিজেকে সান্ত্বনা দেয়, তার মাইনেটা চলে গেলেও, লীলা আর বুদ্ধুর রোজগারের পয়সাটা তো থাকবে! সে এখন বুড়ো হয়েছে, বহুদিন তাদের জন্ত সে মাথার ঘাম পায়ে ফেলেছে, এখন না হয়, তাদের রোজগারেই বাকি দিন ক'টা কেটে যাবে!

কিন্তু মন কিছুতেই শান্তনা মানে না। দিনের পর দিন ভারাক্রান্ত অন্তরে আপনার মনে শুধু জপ ক'রে চলে, এ দুনিয়ায় টাকাই সব! এ দুনিয়ায় টাকাই সব! যেন ঐ কথাটির মধ্যে তার জীবনের সব বেদনার অভিজ্ঞতা পুঞ্জীভূত হয়ে আছে।

একদিন বিকেল বেলা ঘরের বাইরে একটা গাছতলায় বসে নারাণের সঙ্গে তামাক খেতে খেতে সে এমনিই হঠাৎ বলে উঠলো :

'এ দুনিয়ায় টাকাই সব! এ দুনিয়ায় টাকাই সব!'

যেন তার অতিরিক্ত অন্ত কিছু বক্তব্য আর তার জানা নেই। অন্ধকারে

আলোর জন্যে লোক যেমন হাতড়ে বেড়ায়, তেমনিধারা বার বার সে শুধু ঐ এক কথা বলে চলে।

নারাণ তার স্বাভাবিক ব্যঙ্গের ভঙ্গীতে তাকে সমর্থন ক'রেই বলে :

'যা বলেছ দাদা, টাকাই সব! এই দুনিয়া কিসের ওপর ভর ক'রে আছে? জান? সোনা! সোনা! সোনাই হলো আত্মা, সোনাই হলো জীবন, সোনাই হলো মন। রাজা-রাজড়াই বল আর বাজারের লোক-ভোলানো মেয়েমানুষই বল, সোনায় সব সমান! সোনার যে জৌলুস, তা নেই তোমার তলোয়ারে! তলোয়ার কি করে দাদা, সোনাতেই বিচার-বুদ্ধি, জয়-পরাজয়···তাই এই মজাদার দুনিয়ায় সোনা আর বিচার-বুদ্ধি একই জিনিসের এ-পিঠ আর ও-পিঠ, যার দিকে সোনা হেসে চায়, যতই কেন সে বেয়াড়া হোক না, লোকের চোখে তাকেই অপরূপ দেখায়···সোনার কৃপায় গাধাও মানুষ হয়, বাঁদরও সেলাম পায়। তাই যা বলেছ দাদা, এ দুনিয়ায় টাকাই সব···সব সুখের গোড়া হলো ঐ টাকা। ভাল যদি বাসতে হয়, শুধু ঐ সোনাকেই, আর কিছুকে নয়···তবে হাঁ, ওর মধ্যে ছেলেপুলেদের কথাটা শুধু বাদ। একবার যদি সোনার জলে ডুব দিয়েছ, তাহলে দুনিয়ার আর কিছু থাকবে না বাকি···তাই খুব হুঁশিয়ার ভাই, অন্তত একটুখানি ভালবাসা, তার গায়ে যেন সোনালী রঙের ছোপ না লাগে।'

নিজের এই তিক্ত ব্যঙ্গে নিজেই অট্টহাস্য ক'রে ওঠে।

গজু ঘাড় তুলে মাথার ওপর আকাশের দিকে চেয়ে দেখে। বিরাট, বিশাল স্থির···

আপনা থেকে তার মাথা নত হয়ে যায়···তার স্থির বদ্ধ-দৃষ্টি দেখলে মনে হয়, যে সে কিসের জন্যে অপেক্ষা ক'রে আছে, কি যে তা সে নিজেই জানে না!

॥ পঁচিশ ॥

গ্রীষ্ম-দিনের শেষ অপরাহ্নে অফিস থেকে বেরিয়ে পড়ে রেগী হার্স্ট ভাবে, গণ্ডগোলের পর থেকে চা-বাগানের স্ব-সম্প্রদায়ের লোকের সঙ্গে তার সম্বন্ধ যেন ক্রমশই শিথিল হয়ে আসছে। তারা সবাই যেন উদাসীন ভব্যতায় তাকে স্বতন্ত্র ক'রে রেখেছে···রেগী বুঝতে পারে মৌখিক সৌজন্যের আড়ালে তারা সবাই তাকে গোয়ালে দুষ্টু গরু বলেই মনে করে। এটা যে হয়েছে, তার মূলে আছে টুইটি আর হিচকক্। ম্যানেজারের চাকরি থেকে বরখাস্ত হওয়ার ব্যাপারটা এই দু'জনই বরদাস্ত করতে পারে নি। ক্রফ্‌টকুককে সন্তুষ্ট করবার জন্যে ইদানীং সে বাঁধা-ধরা কাজের ওপরেও এটা-সেটা করতে প্রাণপণ চেষ্টা করছে কিন্তু তাতে বিশেষ কোন ফলোদয় হয় নি। অবশ্য এই নীরব ভর্ৎসনার সঙ্গে তার নৈতিক জীবনের কোন সম্পর্ক নেই, এটা সে ভালরকমই জানে। কারণ সবাই তারা এক পথের যাত্রী···তাদের মধ্যে এমন কে সচ্চরিত্র আছে যে নৈতিক কারণে তার দিকে আঙুল উঁচু করতে পারে! কে এমন আছে, যে কুলি স্ত্রীলোকের সঙ্গ করে নি? সে যা করেছে বা করে, হিচকক্ এবং র‍্যাল্‌ফও ঠিক তাই করেছে, তবে তারা ভণ্ড বদমায়েস, তারা যা করে তা লুকিয়ে গোপনে করে, এই যা তফাত। বুড়ো ম্যাক আর ক্রফ্‌টকুক, তাদের যৌবনে, বিয়ের আগে ঠিক তারই মতন কুলি-কামিন দর নিয়ে ঘর করেছে।

আবার ভাবে, হয়ত এখন 'হোমে' ফিরে যাওয়াই তার পক্ষে সবচেয়ে সুবুদ্ধির কাজ হবে। সেখানে বিয়ে-থা ক'রে রীতিমত সম্ভ্রান্ত হয়ে আবার ফিরে আসবে। এইভাবে তার মর্যাদাও ফিরে আসতে পারে।

কিন্তু সে ব্যবস্থা নির্ভর করে টাকার ওপর। বর্তমানে সে বছরে চারশো পঞ্চাশ পাউণ্ড মাত্র মাইনে পায়। বিয়ে করলে ছ'শো পাউণ্ড না হলে কি ক'রে স্ত্রীর ভরণ-পোষণ সম্ভব হতে পারে?

অবশ্য যদি সিভিল সার্ভিস, বা পুলিস অথবা সৈন্য বিভাগে চাকরি করতো,

তা হলে স্ত্রীর দরুন, ঘোড়ার দরুন এবং প্রবাসের দরুন অতিরিক্ত একটা টাকা পেতো। গ্লাসগো টি কোম্পানী, যেখানে সে চাকরি করে, একটা অপদার্থ বেনের দোকান বললেই হয়। এখানে ম্যাক্ বা জক্ টুকুকের মত শেয়ার-হোল্ডার না হতে পারলে, মান-মর্যাদার কোন সম্ভাবনা নেই।

আমার জন্মদাতা যদি এই কোম্পানীর খানকয়েক শেয়ার আমাকে কিনে দিতো...তা পাজী বুনো শুয়োর কিছুতেই দেবে না। বিশেষ ক'রে ঐ হারামজাদী আমার বিমাতা যতদিন বেঁচে আছে, ততদিন তো তার কোন সম্ভাবনাই নেই।

রেনীর মনে পড়ে ছেলেবেলায় তার বিমাতা তাকে কি নির্যাতনই না করেছে। ছুটির দিনও আইভি হাউসে, তার নিজের বাড়ীতে, তাকে আসতে দিতো না, পাছে বাপের সঙ্গে বেশী মাখামাখি হয়ে যায়। তখন সম্পূর্ণ একা তার দিন কেটে গিয়েছে। মাঝে মাঝে তার নিজের গর্ভধারিণীর কাছে গিয়ে থাকতো, তিনি লণ্ডনে ছবি এঁকে জীবিকা অর্জন করতেন আর তার বাবার কাছ থেকে হপ্তায় ত্রিশ শিলিং ক'রে পেতেন। কিন্তু মার ওখানে গিয়ে যে ক'টা দিন থাকতো, সে ক'টা দিনও যে বিশেষ আনন্দে কাটতো তা নয়। তার কারণ, তার মার করুণাকাঙ্ক্ষীদের সংখ্যাও কম ছিল না এবং প্রায়ই তিনি লোক-বদল করতেন। বিশেষ ক'রে তাঁর একটা অসাধারণ ক্ষমতা ছিল, যত সব পাজী বদমায়েস কম্যুনিস্টদের আকর্ষণ করার। রাত্র-দিন তারা যুদ্ধ আর ফ্যাসিজম্. এই নিয়েই বচসা করতো। তখন তার নিজের দিক্ থেকে, নারী-সঙ্গের পিপাসা নিদারুণ হয়ে উঠতো, অথচ সে-সম্বন্ধে কাউকে কিছু বলতেও পারতো না। টনব্রিজের লোকেরা প্রত্যেকটি স্কুলের ছাত্রকে চিনতো। তাই বাইরের শহরের ছেলেগুলো মাঠে মেয়েদের যে-ভাবে নিঃশঙ্কচিত্তে চুম্বন করতো, তাদের সে সুযোগ জুটতো না। অবশ্য তারই মধ্যে একদিন সে চেম্স্ফোর্ডের জঙ্গলের ভেতরে অলিভ বলে একটি মেয়েকে নিয়ে গিয়েছিল। তবে একটা মহা-অসুবিধা ছিল, যে-মহিলাটির

ওপর তাদের খোরাপোশাক ভার ছিল, যে কোন কারণেই হোক, সেটিকে সে চুচক্ষে দেখতে পারতো না। সামান্য ত্রুটি হলেই হেড-মাষ্টারকে জানিয়ে দিতো। তার পর ক্যাম্বার্লীতে যখন এলো সেখানকার আইন-কানুন এত কড়া যে, তার মধ্যে ফাঁক খুঁজে পাওয়াই কষ্টদায়ক ছিল।

তাই যেদিন ইংলণ্ড ছেড়ে বেরিয়ে এলো, সেদিন সে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। কিন্তু মাদ্রাজে তার রেজিমেন্টে যোগদান করবার জন্যে যেদিন সে ভারতের মাটিতে পা দেয়, সেইদিন থেকে ভারতবর্ষকে সে ঘৃণা করতে শেখে। সেদিন ট্যাক্সী ক'রে ফোর্ট সেন্ট জর্জে আসবার আগে, মিনিট কয়েক একটা দেশী হোটেলের সামনে তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। সে অবাক হয়ে দেখলো, একদল অর্ধ-নগ্ন কালো-চামড়াওয়ালা লোক, পরনে ধুতি, মাথায় চুল ঝুঁটি ক'রে পেছনে বাঁধা, কপালে কি সব চিহ্ন আঁকা, হোটেলে বসে খাচ্ছে, সে কি বীভৎস দৃশ্য! পাঁচটা আঙুলে ময়লা ঝোলের মত কি সব চটকে মেখে, গোগ্রাসে মুখের ভেতর পুরে পুরে দিচ্ছে আর সে কি অদ্ভুত একরকম আওয়াজ করতে করতে খাচ্ছে! সে-দৃশ্য দেখে তার গা বমি বমি ক'রে ওঠে। সেই অবস্থা থেকে সুস্থ হতে না হতে দেখে, একটা নোংরা, হাড়-গোড়-ভাঙা লোক হাতে একটা ময়লা কাগজ নিয়ে তার সামনে এসে দাঁড়ালো। দুর্বোধ্য হাতের অক্ষরে সেই কাগজে লোকটার সম্বন্ধে নানা প্রশংসা লেখা ছিল। দাঁত বার ক'রে লোকটা তার ভৃত্য হবার জন্যে আবেদন জানালো। রাগে তার সহ্যের সীমা অতিক্রান্ত হয়ে যাবার মতন হয়েছিল। হারামজাদা লোকগুলোর কি এতটুকু ধৈর্য নেই? কেন অসভ্যের মত রাস্তায় চেঁচামেচি ক'রে নিজের দুঃখের কথা অনর্গল বলে মানুষকে পাগল ক'রে তোলে? পরে সে দেখেছে, এরা সবাই সমান, এই পূর্ব জগতের লোকগুলো। অবশ্য ভারতবর্ষে নামবার আগে পোর্ট সঈদে সে এর পূর্বাভাস পেয়েছিল। রাস্তায় নেমেছ কি দোকানীরা কুকুরের মত তোমার পেছনে লেগে বকতে বকতে একরকম তোমাকে টেনে নিয়ে যাবে তাদের দোকানে, তার পর সেখানে অকারণ চড়া

পসার প্রত্যেকটি জিনিসের দাম নিয়ে তোমার সঙ্গে ঝগড়া করবে, এবং সিগারেট থেকে আরম্ভ ক'রে নোংরা মেয়েমানুষের ছবি পর্যন্ত প্রত্যেকটি জিনিসে তোমাকে রীতিমত ঠকাবে। সব চেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার, অনেক সময় এইসব অসভ্য লোক তাদের নোংরা হাত গায়ে ঠেকাতে পর্যন্ত দ্বিধা করতো না…ধিক্কারে ডেসীর সর্বশরীর আপনা থেকে সঙ্কুচিত হয়ে আসতো। ভারতবর্ষে এসে, তার যেটুকু অভিজ্ঞতা হয়েছে, তাতে সে দেখেছে, একটি মাত্র বুলি তাকে সব চেয়ে বেশী সহায়তা করেছে, সেটি হলো, 'গো টু হেল্'।

তার আজও মনে পড়ে, ভারত-প্রবাসের সেই প্রথম দিনটা তার কি রকম একা-একা কাটাতে হয়েছিল। সেদিন অফিসারদের মেসে জেনারেল অফিসর-কমাণ্ডিংকে তারা ভোজ দিয়ে সংবর্ধনা করছিল; তাতেই মেসের সকলে মেতে ছিল, তার উপস্থিতি কেউ লক্ষ্য পর্যন্ত করে নি। ভোজের আনুষ্ঠানিক রীতি অনুযায়ী মহামহিমান্বিত ভারত-সম্রাটের নামে 'টোষ্ট' উৎসর্গীকৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, সেই গলদঘর্ম বদ্ধ-আবহাওয়া থেকে সে ছুটে সমুদ্রের ধারে চলে যায়।

কিন্তু ভারত মহাসাগরের তৈলাক্ত নোনা-জলের হাওয়ায় তৃপ্তি না পাওয়ায়, বাধ্য হয়েই তাকে আবার মেসের বৈঠকখানা ঘরে ফিরে যেতে হয়। ঘরে ঢোকবার মুখে শুনতে পায় তার বিভাগের কর্নেল নতুন সাব-অলটার্নদের সম্বন্ধে বক্রোক্তি করছেন :

'বাছাধনেরা দেখছি বড্ড বেশী তৈরী…'

সঙ্গে সঙ্গে তার মনের ভেতরে অদ্ভুত একটা ধারণা মাথা তুলে ওঠে, এই কর্নেলের হাতে বহু দুর্ভোগ তাকে ভুগতে হবে!

তার দু'মাসের মধ্যেই উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের নওসেরাতে একজন ভারতীয় অফিসারের সঙ্গে গণ্ডগোলের ব্যাপারে, এই কর্নেলই তাকে অবাধ্যতার অপরাধে সেনাবিভাগ থেকে বিতাড়িত ক'রে দেয়।

কর্নেল যদি জানতো, এই যাচ্ছেতাই গরম দেশ কিভাবে তাকে তার

নার্ভকে উত্তেজিত ক'রে রেখেছে, যদি জানতো এই দেশের হামাগুড়ি-দেওয়া ব্যাধিগ্রস্ত কালো আধখানা-মানুষের দল কিভাবে তাকে ক্ষিপ্ত ক'রে তোলে, রেণীর বিশ্বাস, তাহলে কখনই কর্নেল এইভাবে তার সামরিক জীবন মাঝ-পথেই শেষ ক'রে দিতো না। তার পর যদিও দীর্ঘকাল ভারতবর্ষে তাকে বাস করতে হয়েছে, ভারতীয় সিপাহীদের সাহস ও আনুগত্য দেখে মুগ্ধও হয়েছে, তবুও 'নেটিভ'দের সম্বন্ধে তার সেই প্রাথমিক ধারণার বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম হয় নি। চা-বাগানের শ্বেতাঙ্গ অফিসর মাত্রেরই নেটিভদের সম্পর্কে মানসিক ধারণা একই রকম।

তাদের বিশ্বাস, ভারতবর্ষের এই অগণিত নিরাবয়ব জনতা, শ্বেতাঙ্গদের সাহস, শক্তি এবং বীর্য দেখে বিমুগ্ধ হয়ে তাদের স্বীকার ক'রে নিয়েছে, শ্বেতাঙ্গরা এসে তাদের মধ্যে সুবিচার এবং সু-ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছে, তা না হলে তারা নিজেদের মধ্যে কাটাকাটি ক'রে এতদিনে পৃথিবী থেকে নিঃশেষ হয়ে যেতো। শ্বেতাঙ্গরা এসে তাদের হাতে টাকা দিয়েছে বলেই তারা জীবনের বিলাসের নানা উপকরণ কিনতে পাচ্ছে; মালা, চুড়ি, বালা, পাতলা সৌখীন ক্যালিকো কাপড়, তামাক, সিগারেট। শ্বেতাঙ্গরা এসেই তাদের একটু একটু ক'রে সভ্য ক'রে তুলেছে। যদি তাদের কড়া শাসনে বেঁধে না রাখা হতো, তাহলে একমাত্র সংখ্যার আধিক্যেই তারা শ্বেতাঙ্গদের ঠেলে ভারত মহাসাগরের জলে ফেলে দিতো। অবশ্য তাদের শিখিয়ে পড়িয়ে মানুষ ক'রে তুলতে হবে, কেন না তারা এখনও হাজার বছর পিছিয়ে পড়ে রয়েছে। তাদের ওপর শাসন বজায় রাখতে হলে, তাদের মনে যাতে ভগবৎ-ভীতি থাকে, তা দেখতে হবে। যখন বাঁদরামো করবে তখন রীতিমত কড়া বেতের ব্যবস্থা করতে হবে এবং যখন ভদ্রভাবে চলবে ফিরবে তখন অবশ্য দিল-দরিয়া হতে হবে। এই হলো ভারতবাসী সম্বন্ধে প্রত্যেক ইংরেজের বিশ্বাস, দু'একজন বিশ্বাসঘাতক দলদ্রোহী বাদে।

আফজলকে রেণী তার খাস বেয়ারা হিসেবে রেখেছিল। বহু সর্দারের

কাছে আফিজলের নানান কেরামতির কথা সে শুনেছে। সেই জন্যে আফজল সম্বন্ধে তার কোন দুর্ভাবনা ছিল না। তা ছাড়া, জীবনটা হলো নিছক একটা খেলা···সে খেলায় মেতে সে আনন্দ পেতে চায়। সেই আনন্দটুকুর জন্যে সে যে কোন জিনিস বিলিয়ে দিতে পারে। যতক্ষণ তার হাতে পোলোর ছড়ি আছে, যতক্ষণ আছে বুনো শূকর শিকার করার আনন্দ ততক্ষণ দুনিয়ার আর কিছুতেই কিছু যায় আসে না। এক চক্কর পোলো, বিছানায় স্ত্রীলোক, হাতে মদের পেয়ালা···দুনিয়া যাক্ রসাতলে!

কিন্তু কিসের জন্যে এত ভারাক্রান্ত ক'রে তুলছে মনকে? ইদানীং দিনগুলো যেন ভারী হয়ে উঠেছে। গা থেকে ঝেঁড়ে ফেলে দিতে হবে এই ভারী বোঝা···পাগলা ঘোড়ার মত ছুটে চলুক আবার জীবন।

ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে পড়ে।

দ্রুত পদ-চালনা ক'রে হাঁটতে আরম্ভ করে। মাঝে মাঝে ঘাড় তুলে চারদিকে চেয়ে দেখে। হঠাৎ তার চোখে পড়ে যায়, অস্ত সূর্যের চূর্ণ আলোয় ঘন-লতা-গুল্ম-বেষ্টিত আঁকা-বাঁকা পথের ওপারে, আকাশ-বাসরে পথ-ভ্রষ্ট একক তারার মত তখনও পর্যন্ত একটি মেয়ে একা চা-পাতা তুলে চলেছে···

নিঃশেষিত দিবসের পথভ্রান্ত আলোর বিপুল বর্ণ-সৌরভে যেন তরল হয়ে গিয়েছে সামনের প্রান্তরের কাঠিন্য···তার স্নিগ্ধ উত্তাপের স্পর্শ এসে লাগে মনে। বুকের ভেতর দ্রুত লয়ে চলে রক্ত-ধারা। সহসা আতপ্ত আবেগে আচ্ছন্ন হয়ে আসে মস্তিষ্ক···

যে-রাস্তা দিয়ে রেগী চলেছিল, তার পাশে ছোট্ট একটা নালা। এক লাফে সেই নালা পেরিয়ে রেগী মেয়েটির দিকে এগিয়ে চলে। মেয়েটি তখনও পিছন ফিরে আপনার মনে চা-পাতা তুলছিল।

উন্মাদ কামনার জ্বলৎ-অগ্নিশিখায় রেগীর সারা দেহ আবিষ্ট হয়ে ওঠে। ক্ষণিকের জন্যে তার মনে আতঙ্ক জাগে, যদি এই অবস্থায় তাকে কেউ দেখে ফেলে! কিন্তু সামনেই মেয়েটির তরুণ নিতম্বের পরিপুষ্ট রেখা তার রক্তে আগুন

ওঠে কিন্তু বাইরে তাকে কোনমতেই রূপ দিতে পারে না। মৃত্যু-ভয়-ভীত জীবনের অন্তিম প্রহরের মত স্থির স্থাণু হয়ে থাকে।

রেগী হাস্ট আমন্ত্রণ করে : 'আমার বাংলোতে আয়...নাকচাবি দেবো... বালা দেবো...'

লীলা চীৎকার ক'রে ওঠে : 'না...না...দূর হয়ে যা! এখুনি চীৎকার ক'রে বাবাকে ডাকবো। আমি ভয় করি না...সাহেবই হ' আর যেই হ'... দূর হয়ে যা এখান থেকে...কাজ সেরে সন্ধ্যের আগে আমি বাড়ী ফিরবো, নইলে বাবা রাগ করবে!'

কথা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে বুক ফেটে কান্না বেরিয়ে পড়ে। রুদ্ধশ্বাসে ক্রন্দন-সিক্ত দৃষ্টিতে মাথার ওপরে আকাশের দিকে চেয়ে দেখে, পাহাড়ের গায়ে ঘেঁষে পড়ে আছে স্থির, শুভ্র...

তাকে ধরবার জন্যে কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে রেগী বলে ওঠে :

'চলে আয়...ঝামেলা করবি না!'

'হায় গো! হায়!' লীলা চীৎকার ক'রে ওঠে। তার বুকের স্পন্দন যেন হঠাৎ থেমে যায়। পাগলের মত সে ছুটতে আরম্ভ করে। কিন্তু তার দেহ এগিয়ে গেলেও, পা যেন পিছু পড়ে থাকে।

সেই পলায়নমানা ভীতা হরিণীর দিকে চেয়ে রেগী বিভ্রান্তভাবে হেসে ওঠে। সমস্ত বাতাস যেন তার যৌবনের গন্ধে ভরপুর হয়ে যায়। পেছন ফিরে রেগী বাংলোর পথ ধরে। সেই গ্রীষ্ম দিনের উত্তাপের সঙ্গে মিশে যায় তার মনের দুরন্ত কামনা, যেমন ক'রেই হোক লীলাকে পেতে হবে। ঘামে নেয়ে ওঠে সারা দেহ। দেহ টলতে থাকে কামনার মধু আবেশে। পেছনে ফিরে দেখে, তখনও ত্রস্তা হরিণীর মত ছুটে চলেছে লীলা। নিয়োগীর স্ত্রী-ঘটিত ব্যাপারের পর থেকে তার মনে যে কামনা রুদ্ধ হয়েছিল, আজ তা পূর্ণ বেগে আবার উদগত হয়ে ওঠে। লীলার অবাধ্যতায় মনে মনে সে যে ক্রুদ্ধ হয় নি তা নয়। কিন্তু সে-ক্রোধ সে এতক্ষণ ধরে সংযত ক'রে রেখেছিল।

শিকার হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা পূর্ণমাত্রায় ফুটে ওঠে। নিরেট লোহার মত মনকে শক্ত ক'রে তোলে। ঝর্ণার ওপর দিয়ে সাঁকোটা পেরিয়ে কুলি-লাইনে তাড়াতাড়ি যাবার যে-পথটা ছিল, সেই পথ ধরে দ্রুত অগ্রসর হয়।

সমস্ত উপত্যকাকে আচ্ছন্ন ক'রে গোধূলির ম্লান ছায়া নেমে আসছিল। সেই সর্বব্যাপী অন্ধকারের কেন্দ্র-বিন্দু স্বরূপ কুলি-লাইনে একটি সন্ধ্যা দীপ জ্বলে উঠেছে তখন। চারিদিক্ নিস্তব্ধ। সে-নিস্তব্ধতার মধ্যে রেশমী শুধু শুনতে পায়, তারই পায়ের ভারী আওয়াজ···যেন এমনি আওয়াজ চলেছে অনাদি-কাল ধরে। স্পষ্ট অনুভব করে, প্রত্যেকটি নিঃশ্বাসের ওঠা-নামা। অন্ধকারে সে-চলেছে, তার নিজের প্রেতমূর্তির মত, অন্ধকারের রাজার সঙ্গে দেখা করতে। তার চোখের সামনে অন্ধকার পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে তারই কামনার মশাল··সে-মশালের আলোয় দগ্ধ দৃষ্টি তার সামনে আশে-পাশের আর যা কিছু সবই নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। সারা জীবনের অভ্যাসের বলি-অঙ্কিত পথে, অন্ধ ভাগ্যের ওপর নির্ভর ক'রে সে চলেছে···বিবেকহীন, কামনা-অন্ধ···

অন্তরের পুঞ্জীভূত উন্মাদ আবেশের ওপর পথের নির্দেশ ছেড়ে দিয়ে সে এগিয়ে চলেছে। চোখের সামনে সেই রক্ত-সন্ধ্যায় তার মনে হয়, সামনের কুলি-লাইনের টিনের ঘরগুলোর ছায়া যেন স্পষ্ট মূর্তি ধরে তার দিকে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসছে। যে ঢালু রাস্তার শেষে গঙ্গুর ঘর, রেশমী দেখে কখন সে তার ওপর এসে দাঁড়িয়েছে ; কয়েক মুহূর্তের জন্যে সে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে, আপনা থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস ওঠে। ভেতরের আলগা স্নায়ুগুলোকে নীরবে শক্ত ক'রে গ্রন্থি দিয়ে নেয়। চোরের মতন চারিদিক্ চেয়ে দেখে, কেউ দেখছে কি না!

দূরে একজন কুলি-কামিন ছেলেমেয়েদের ধমকাচ্ছিল···কাছে কোথাও কুলি-লাইনের ভেতরে কে একজন কাঠ কাটছিল···গঙ্গুর দরজা পর্যন্ত রাস্তাটুকু একেবারে জনবিরল··নিস্তব্ধ।

রেণী কয়েক পা অগ্রসর হয়।

হঠাৎ একটা লোক মাথায় জলের কলসী নিয়ে সামনে দিয়ে চলে গেল। রেণী সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে।

মাথার ভেতর সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড যেন ঘুরতে থাকে। পাথরের ওপর তার নিজের বুটের শব্দ সূঁচের মত বুকে এসে বেঁধে। সমস্ত রক্ত যেন ছুটে মাথার দিকে উঠছে। সেখানে এসে অনিশ্চয়তার হিম-স্পর্শে যেন জমে বরফ হয়ে যাচ্ছে।

ক্রমশ গজুর ঘরের দরজার সামনে এসে পড়ে। কয়েক মাস আগে তার মনে পড়ে, ঠিক এখানেই দরজার পাশে লীলাকে সে প্রথম দেখেছিল। গজু যদি তার বাপ হয়, তাহলে গজুও এখানে থাকে···হাঙ্গামার সময় সে-ও যে একজন পাণ্ডা ছিল।

রাস্তার দিক্ থেকে কেউ আসছে কি না একবার চেয়ে দেখে। কেউ কোথাও নেই। শুধু বাতাসে আসছে ক্রমান্বয় কাশির আওয়াজ, আর সেই সঙ্গে হুঁকোর শব্দ।

সন্তর্পণে পা-টিপে দরজার দিকে এগিয়ে আসে, আর একবার চারিদিকে চেয়ে দেখে নেয়, তার পর মৃদু করাঘাত করে।

'এই লেড়কী···বাহার আও···একঠো বাত্ তো শুনো···'

রেণী দরজার বাইরে থেকে হেঁকে ওঠে।

কিন্তু ভেতর থেকে কোন সাড়াই আসে না। তবে কারা যেন কানাকানি করছে, রেণী বুঝতে পারে।

দরজায় কান পেতে শুনতে চেষ্টা করে কিন্তু স্পষ্ট কোন আওয়াজ কানে এসে পৌঁছোয় না। দরজা থেকে গজ দুয়েক দূরে সরে পেছনে ফিরে দাঁড়িয়ে ভাবে।

হঠাৎ পিছন ঘুরে চাইতে দেখে, দরজায় বুদ্ধু দাঁড়িয়ে। মোটরবাইকে যাবার সময় বহুবার সে লক্ষ্য করেছে, এই ছেলেটা দূর থেকে তাকে সেলাম করতো।

কে রেশী বলে :

টুম্‌রা বহেন্‌কো বোলাও···একঠো রুপেয়া মিলেগা !'

া টাকা বুড়ুর কাছে এতবড় একটা ঐশ্বর্য যে সে তা আশাও করতে

। তাছাড়া সাহেবের ক্রুদ্ধ মুখ দেখে ভয়ে সে কেঁদে ওঠে। চীৎকার করতে নারাণের ঘরের দিকে দৌড়ে যায় : 'বাবা! বাবা!'

াৎ সেই আর্ত চীৎকারের শব্দে রেশী বিচলিত হয়ে ওঠে।

ড়ু তারস্বরে ডাকে : 'বাবা! বাবা!'

শী আর মাথা ঠিক রাখতে পারে না। তার আশঙ্কা হয়, এখুনি ক্ থেকে কুলিরা ছুটে এসে তাকে অন্ধকারে চোরের মতন সেই ায় ঘুরতে দেখতে পাবে।

শায় সর্ব-শরীর ভরে যায়। হঠাৎ পকেট থেকে রিভলভার বার ক'রে ারে ছুঁড়তে আরম্ভ করে, একবার, দু'বার····

লির আওয়াজে বুড়ুর মাথার ওপর বাতাস যেন কাগজের মত সশব্দে যায়। রেশী দাঁড়িয়ে শোনে. বুড়ু তখনও চীৎকার করছে :

বাবা! বাবা!'

টে পালিয়ে যাবে, এমন সময় সামনে দু'গজের মধ্যে দেখে গঙ্গু দাঁড়িয়ে।

াগে উন্মাদ হয়ে রেশী চীৎকার ক'রে ওঠে : 'জাহান্নমে যাও!'

ঙ্গে সঙ্গে হাতের রিভলভার শব্দ ক'রে ওঠে, একবার, দু'বার, তিনবার।

আর্তনাদ ক'রে গঙ্গু পড়ে যায়।

রশী ছুটতে আরম্ভ করে।

নে হয়, তার পেছনে যেন মৃত্যু নিজে তাকে তাড়া ক'রে আসছে।

সাতজন য়ুরোপীয় জুরি এবং মাত্র দু'জন ভারতীয় জুরির সামনে মিঃ জাস্টিস্ মাওবারলের এজলাসে, ম্যাকফারসন্ চা-বাগানের এসিস্টেন্ট ম্যানেজার রোজল্যান্ড চার্লস উইলিয়াম হার্স্টের বিচার আজ তিন দিন ধরে চলেছে তার বিরুদ্ধে নরহত্যা এবং নরহত্যা করবার চেষ্টার অভিযোগ উপস্থিত করা হয়েছে। আজ জুরিরা তাঁদের রায় দেবেন।

আদালতের পক্ষ থেকে পেশকার জুরির ভদ্র-মহোদয়গণকে জিজ্ঞেস করে:

'আপনারা ন্যায়ত, ধর্মত, আসামীকে ম্যাকফারসন চা-বাগানের কুলি গঙ্গু সিংকে হত্যা করার অপরাধে অভিযুক্ত মনে করেন কি না?'

জুরির প্রধান ব্যক্তি দাঁড়িয়ে উঠে উত্তর দেন:

'ভোটের সংখ্যাধিক্যে আমাদের রায় হলো, আসামী নিরপরাধ!'

পুনরায় পেশকার জুরিকে জিজ্ঞেস করে:

'আপনারা আসামীকে হত্যার চেষ্টা করার অপরাধে অপরাধী বিবেচনা করেন কি না?'

জুরির প্রধান ব্যক্তি পুনরায় উঠে দাঁড়িয়ে জবাব দেন:

'ভোটের সংখ্যাধিক্যে আমরা আসামীকে নিরপরাধ মনে করি।'

মহামহিমান্বিত বিচারপতি তখন আসামীকে আহ্বান ক'রে বলেন:

'আদালতের বন্দী আসামী,

নিরপেক্ষ জুরি বিচার ক'রে তোমাকে হত্যা বা হত্যার চেষ্টার অপরাধ থেকে মুক্তি দিয়েছেন···

জুরির বিধানের সঙ্গে আমি এক মত···

তুমি মুক্ত।'